রোগটা যখন 'টি. বি.'—

এই লেখকের অন্য বই ঃ

THE ROMANCE OF TUBERCULOSIS

(দি রোমান্স্ অব্ টিউবারকিউলোসিস্)

ভূমিকা লিখেছেন ঃ

সুবিখ্যাত যক্ষ্মাবিশেষজ্ঞ এবং যক্ষ্মারোগে প্রসিদ্ধ অস্ত্রচিকিৎসক

ডাঃ ডব্লিউ. জি. জোন্স্, বি. এস্-সি : এম্. ডি.

সার্জেন-সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট্ ঃ স্যার উইলিয়াম ওয়ান্‌লেস্ টি. বি. স্যানাটোরিয়াম

মিরাজ, বম্বে।

(প্রকাশক ঃ থ্যাকার স্‌পিংক অ্যান্‌ড্ কোঃ (১৯৩৫) লিঃ,

এস্‌প্লানেড ঈস্‌ট্, কলিকাতা।)

পরিষ্কার, ঝরঝরে, জোরাল ইংরাজীতে সাহিত্যের মত সুন্দর করে সম্পূর্ণ নতুন ধরনে লেখা এই বইখানা ভারতবর্ষের ও বিলাতের বহু উচ্চ-শ্রেণীর পত্রিকায়, এবং নানা বিশেষজ্ঞ ও চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে অকৃপণ প্রশংসা লাভ করেছে। ইংরাজী জানা প্রত্যেক ব্যক্তিরই বইখানা পড়া উচিত।

চমৎকার ছাপা, কাগজ এবং বাঁধাই—

দাম—আড়াই টাকা।

রোগটা যখন টি. বি.

অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা লিখেছেন :

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, বি. এ., এম. ডি.,
এম. আর. সি. পি., এফ. আর. সি. এস।
চেয়ারম্যান, বেঙ্গল টিউবারকিউলোসিস অ্যাসোসিয়েশান।

প্রকাশক :
বেঙ্গল টিউবারকিউলোসিস্ অ্যাসোসিয়েশান
৮, লায়ন্‌স্ রেনজ, কলিকাতা।

প্রথম প্রকাশ :
— ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১

দাম :
— এক টাকা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় বি. এ. কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড্-এ
(৩২ নং আপার সার্কুলার রোড্, কলিকাতা) মুদ্রিত।

যক্ষ্মাব্যাধির সহিত আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সমস্যাগুলি এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে এই ব্যাধির নিবারণকল্পে কার্য্যাবলী এবং এই ব্যাধি সম্বন্ধে নানাদিক হইতে আলোচনার প্রসারের প্রয়োজন আজ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকারের সংস্কার-মুক্ত তরুণ মনে এই ব্যাধি সংক্রান্ত আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিচিত্র ভাবধারা অতিশয় স্বচ্ছরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। একদিকে বৈজ্ঞানিকের মনোবৃত্তি এবং অপরদিকে সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গী ও লিপিকৌশল লইয়া অমিয়জীবন এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে তাহা একটি সুস্পষ্ট আন্তরিকতার ছাপে সর্ব্বত্র সমুজ্জ্বল, এবং এই কারণেই ইংরাজী ও বাংলায় তাঁহার রচিত যক্ষ্মাবিষয়ক বহু প্রবন্ধ জনসাধারণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। বঙ্গীয় যক্ষ্মানিবারণী সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত অমিয়জীবনের এই সুন্দর পুস্তকখানি যে এই দেশের যক্ষ্মারোগী ও জনসাধারণের বহু প্রকার জড়তা ও অজ্ঞতা অপনয়ন করিয়া তাহাদিগকে বিশেষ ভাবে উপকৃত ও সচেষ্ট হইতে সাহায্য করিবে ইহা সুনিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায়। ভাবে, ভাষায় এবং রচনাপদ্ধতিতে গতানুগতিকতা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এই পুস্তকখানি সর্ব্বশ্রেণীর লোকের নিকট সুখপাঠ্য এবং আদরণীয় হইবে বলিয়াই আমি মনে করি।

বিধানচন্দ্র রায়

স্বাস্থ্যচর্চার প্রতি অধিকতর মনোযোগী হলে যে আমাদের সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান-সাধনাও অধিকতর সুন্দর এবং কার্যকরী হয়ে ওঠে, একথা অনেক সময় আমরা ভুলে যাই। স্বাস্থ্য-চর্চায় আমাদের বাধা আছে অনেক, অবহেলাও আছে অনেক; কিন্তু স্বাস্থ্যচর্চাকে বাঁদ দিয়ে, স্বাস্থ্য-কথাকে উপহাসের যোগ্য বিবেচনা করে আমরা চলবার পথে যে বারবার বিড়ম্বিত হয়ে উঠব, আমাদের জীবনকে যে সবদিক দিয়ে সার্থক করে তুলতে পারব না, দাসসুলভ অশিক্ষিত মনোবৃত্তির পরিবর্তন করে একথা আমাদের ভেবে দেখবার সময় আজ এসেছে।

যক্ষ্মাব্যাধিসংক্রান্ত আলোচনা স্বাস্থ্যবিষয়ক আলোচনার অন্তর্ভূ্ত হলেও এই ব্যাধি এবং এই ব্যাধিজনিত সমস্যাগুলির এমন একটি নিজস্ব রূপ আছে, যার দরুন নানাদিক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বিষয়টি আলোচিত হবার অপেক্ষা রাখে।

কিন্তু এসব আলোচনা সম্পূর্ণ নিরর্থক, যদি নাকি দেশবাসীর মনের প্রান্তে এর একটা বিশিষ্ট আবেদন না থাকে, এ দ্বারা চোখ মেলে চাইবার শুভবুদ্ধি যদি তাদের জাগরিত না হয়। রবীন্দ্রনাথ উদ্বেগের সঙ্গে আমাদিগকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন মনে করেছেন: "* * আমাদের উন্নতির অন্তরায়, আত্মরক্ষার বাধা, আমাদের বিনষ্টির মূলগত তামসিকতায় আশ্রিত, তাদের সম্বন্ধে দেশের লোকের চেতনা জড়ত্বে আচ্ছন্ন, কেননা তারা আমাদের চিরাভ্যস্ত। সেই সকল অভ্যাসের সাংঘাতিকতা মুগ্ধ মনকে সতর্ক করতে পারে না। বহুকাল ক্রমাগত মমত্বের অন্তরালে তাদের শত্রু স্বভাব উপলব্ধি করতে পারিনে বলেই তাদের নিরবচ্ছিন্ন হিংস্রতা এমন সর্বনাশা। সেই অন্তঃশত্রু শত শত বৎসর আমাদের মর্মস্থলে বাসা বরে

জীবনযাত্রায় আমাদের অকৃতার্থ করে তুলছে, তারা থাকে আমাদের দিন-যাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে, নিমেষে নিমেষে তাদের প্রচ্ছন্ন আক্রমণ। আত্মরক্ষার জন্যে ঝড়ের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা বনস্পতির কাজ, কিন্তু যদি তার শিকড়ে লেগে থাকে উই, তাহলে তার আত্মরক্ষার সমস্যা বাইরে হয় গৌণ, ভিতরে হয়ে ওঠে মুখ্য। আমাদের জাতির ইতিহাসে বিনাশের বীজ কোন্ ঔদাসিন্যের মধ্যে নিহিত হয়ে, দীর্ঘকাল ধরে প্রত্যহ প্রশ্রয় পেয়ে আসচে, সে কথা ভেবে দেখতে হবে। কেন না তার প্রতিকার একমাত্র আমাদের নিজের হাতে। * * * ”

আমরা একথা বুঝতে পেরেছি যে যক্ষ্মা আমাদের শত্রু। কিন্তু যক্ষ্মারও একথা বুঝবার দিন আজকে এসেছে যে আমরাও তার শত্রু। তার হাতে আমাদের যদি নিস্তার না থাকে তবে আমাদের হাতেও তার নিস্তার নাই। সে আমাদের হাতে কোনক্রমেই আর ক্ষমা পাবার যোগ্য নয়। যক্ষ্মার সঙ্গে সংগ্রামে আমাদের যখন উড়বে জয়-পতাকা—আমাদের হাতে পরাস্ত এই ব্যাধি আপন হীনতার লজ্জায় তখন মাটির সঙ্গে মিশে যাবে।

*   *   *   *   *

টি. বি. সম্বন্ধে পুস্তক এবং প্রবন্ধাদি লিখবার ব্যাপারে আমি গোড়া থেকেই কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের চেস্ট্ ডিপার্টমেণ্টের প্রধান চিকিৎসক শ্রদ্ধেয় ডাঃ এ. সি. উকিল (এম. বি ; এম. এস. পি. ই ; এফ. এস্. এম. এফ ; এফ. এন. আই)—এর কাছ থেকে বিশেষ উৎসাহ পেয়ে এসেছি। তাঁর কাছে আমি আরো নানাভাবে ঋণী। বেংগল টি. বি. অ্যাসোসিয়েশান-জার্নালের সম্পাদক ডাঃ আর. সি. অধিকারী (এম. বি ; এম. আর. সি. পি ; টি. ডি. ডি.)-ও আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। বঙ্গীয় টি. বি. অ্যাসোসিয়েশানের সেক্রেটারি লেঃ কর্নেল জে. এল. সেন (এম. সি ; আই. এম. এস—রিঃ), উক্ত সমিতির সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ জে. এন. মিত্র (এম. বি ; ডি. পি. এইচ), 'কলিকাতা

কর্পোরেশানের পাবলিসিটি অফিসার শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী—প্রভৃতির সহানুভূতির মূল্যও আমার কাছে কম হয় নাই।

সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে আমার অসীম শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার পাত্র—সুপরিচিত যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞ ডাঃ এস্. সর্বাধিকারী (বি. এস. সি; এম. বি; এম. ডি) প্রেসে দেবার আগে আমার এই বইখানার পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া সযত্নে দেখে দিয়েছেন ও স্থানে স্থানে সংশোধন বিষয়ে মূল্যবান নির্দেশ দিয়েছেন। সর্বোপরি, বইটির ভূমিকা লিখেছেন ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, যাঁর পরিচয় অনাবশ্যক। এঁদের প্রত্যেকের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

* * * * *

আমার ছোট বইখানার নির্দিষ্ট গণ্ডির ভিতরে যক্ষ্মারোগকে আরো নানাদিক থেকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে দেখাতে এবং বিষয়টি নিয়ে আরো নানাভাবে আলোচনা করতে পারা আমার পক্ষে সম্ভব হল না, কিন্তু এই ব্যাধি এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা এতেই সবার হবে বলে আশা করি। তবে দেশের লোকের মনে যখন আপন 'বিজ্ঞতা' প্রকাশের চেষ্টা প্রবল হয়ে ওঠে জ্ঞানকে এড়িয়ে অজ্ঞানতা-পূর্ণ নির্লজ্জ আত্মতুষ্টির ভিতরে, যখন তারা ভুলে যায় জ্ঞানই জীবন—অজ্ঞানতাই মৃত্যু, তখন দেশে এই বইএর চিন্তাশীল পাঠক বা পাঠিকার সংখ্যা আদৌ কত হবে তা বলা কঠিন। আমার দেশবাসী নরনারীর মনে সমস্ত নিশ্চেষ্টতার অবসান হয়ে সত্যানুসন্ধিৎসা প্রতিষ্ঠিত হোক, এই কামনা করি।

কলিকাতা
ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১

অমিয় জীবন মুখোপাধ্যায়

—রোগটা যখন 'টি. বি.'—

— ১ —

টি. বি.র ইতিহাস—রোগের প্রকৃতি—বক্ষের গঠন ও ক্রিয়া—জীবাণু-সংক্রমণ ও দেহের প্রতিরোধ-শক্তি—কি করে দেহে সংক্রমণ ঘটে—যক্ষ্মাজীবাণুর পরিচয়—সংক্রমণের সূত্র—যক্ষ্মাবিস্তারে সহায়ক অবস্থাদি ('বীজ' এবং 'ক্ষেত্র')—যক্ষ্মায় বংশানুক্রমিকতা........... ....১

— ২ —

যক্ষ্মারোগের গতি এবং লক্ষণ—কেমন করে রোগীরা ভুল পথে চালিত হয়—যোগ্য চিকিৎসক—রোগ-নির্ণয় ও রোগের অবস্থাদি—রোগ সম্পর্কে রোগীর শিক্ষা—রোগের সাধারণ চিকিৎসা (বিশ্রাম, পুষ্টিকর ও সুনিয়ন্ত্রিত আহার, মুক্তবায়ু)—নাড়ি, গাত্রতাপ এবং ওজন......................২৬

— ৩ —

'আল্‌ট্রা-ভায়োলেট' রশ্মি—যক্ষ্মার বিশেষ কয়েকটি উপসর্গ—রোগীর পালনীয় কয়েকটি সাধারণ নিয়ম—থুতু বা অন্যান্য নিস্রাব সম্বন্ধে সতর্কতা—রোগীর পরিচর্যা—রোগীর কক্ষ এবং ব্যবহৃত দ্রব্যাদি শোধন—ক্রম-ব্যায়াম—বিশ্রামের নির্দিষ্ট সময়—স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসা—স্যানাটোরিয়ামের সুবিধা-অসুবিধা—স্যানাটোরিয়ামের আবহাওয়া—স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসার ইতিহাস—মনীষিগণের দান—স্যানাটোরিয়ামে যাওয়ার উদ্যোগ-পর্ব—স্যানাটোরিয়ামের চিকিৎসা-প্রণালী—অস্ত্র-চিকিৎসা—ইনজেক্‌শান—স্যানাটোরিয়ামের বিশিষ্ট জীবন-যাত্রা—রোগীর সাময়িক উন্নতি-অবনতি..... ৬৫

— ৪ —

ব্যাধিগ্রস্ত ফুস্‌ফুসের বিভিন্ন পরিবর্তন—স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসার ফলাফল—রোগীর ভবিষ্যৎ-জীবন এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্কতা—টি. বি.

সত্যিই সারে কিনা—রোগের পুনরাবির্ভাব—রোগীর পক্ষে ধৈর্য, আশা এবং আত্মবিশ্বাস—বাইরের সমাজে যক্ষ্মারোগীর বিড়ম্বনা—রোগীর কাজকর্ম—যক্ষ্মারোগ ও প্রতিভা—পৃথিবীর কতিপয় অমর যক্ষ্মারোগী—যক্ষ্মার চিকিৎসায় বায়ু-পরিবর্তন...১১০

— ৫ —

যক্ষ্মারোগে স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসা ও অন্যান্য চিকিৎসা (তুলনা-মূলক আলোচনা)—অসার ঔষধ এবং ব্যবস্থাদি—যক্ষ্মারোগীর বিবাহ ও বিবাহিত জীবন—যক্ষ্মারোগীর মনস্তত্ত্ব—রোগীর চিকিৎসক ও আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের কর্তব্য...১৫৫

— ৬ —

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের যক্ষ্মানিবাস—অনেক স্যানাটোরিয়াম-হাসপাতালের দোষত্রুটি—বিশ্রাম এবং ব্যায়াম-নিয়ন্ত্রণে স্যানাটোরিয়ামের পদ্ধতি—রোগের বিভিন্ন অবস্থানুযায়ী রোগীর উন্নতি-অবনতি—রোগীর পক্ষে চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের ত্রুটির কারণাদি—ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে যক্ষ্মারোগের প্রসার—মেয়েদের অতিরিক্ত সমস্যা—পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশে যক্ষ্মানিবারণী আন্দোলন এবং কৃতকার্যতা—যক্ষ্মারোগীর আরোগ্যলাভকে সমাপ্ত এবং সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্যে প্রচেষ্টাদি—'আফ্টার-কেয়ার কলোনি'—অন্যান্য দেশের সঙ্গে যক্ষ্মা সম্পর্কে ভারতের অবস্থার তুলনা—ভারতবর্ষের যক্ষ্মা-নিবারণী আন্দোলন—বঙ্গীয় যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতি—গৃহ-চিকিৎসা—ছাত্রসমাজ ও যক্ষ্মাব্যাধি—জনসাধারণের বিভিন্ন অজ্ঞতা—যক্ষ্মা-দমনের বিভিন্ন উপায়—আমাদের নানা সমস্যা—সবদিকে সকলের বিস্তারিত কর্তব্য—উপসংহার...১৮৩

মানুষের জীবনের আরম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত এক গভীর রহস্য রয়েছে ছায়া বিস্তার ক'রে। মানুষের চলার পথে প্রতি পদে পদে বহুরকমের বহুবিস্তৃত সমস্যা, তার প্রতিদিনকার অস্তিত্বের পশ্চাতে বহু সুকঠোর সংগ্রামের বিচিত্র ইতিহাস, নিজেকে নিয়ে তার মুহূর্তের শান্তি নাই, স্বস্তি নাই। আত্মবিকাশ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার আয়োজনের মাঝখানে বহু গ্লানির ভার ওঠে জ'মে, সহস্র বিঘ্নের ঝড়ের ভিতরে ক্ষত-বিক্ষত দেহ-মন নিয়ে তার সাবধানে জ্বালা সার্থকতার প্রদীপখানি বারে বারে আসে নিভে। সমস্ত জীবনখানি তার সাগর তরঙ্গের মতই বিক্ষুব্ধ।

জীবনের যাত্রা পথে মানুষকে যে অসংখ্যপ্রকার সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয়, ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম তার মধ্যে অন্যতম। সহস্র সহস্র ব্যাধির তাড়নায় মানুষের স্বাস্থ্য উঠছে জর্জরিত হয়ে; তার ভিতরকার যে বিশিষ্ট ব্যাধিটি আমার আলোচনার বিষয়, ইংরাজীতে সেটির নাম হচ্ছে—টিউবারকিউলোসিস্ (Tuberculosis). Tuberculosis কথাটাকে সংক্ষিপ্ত ক'রে (যদিও একটু ভুল ভাবে) বলা হয়—টি. বি. (T. B.)। বুকের টি. বি. কে "কন্‌সাম্‌প্‌শান্ (Consumption), থাইসিস্ (Phthisis)—ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে এবং এ নামগুলিও সাধারণের অজ্ঞাত নয়। বুকের ব্যাধি আছে অনেক প্রকারের; কিন্তু এই ব্যাধি যখন বুককে আক্রমণ করে তখন এইটিই হয় দুরন্ততম। টি. বি.-গ্রস্তকে "Tuberculous" বলা হয়; বুকের টি. বি.-গ্রস্তকে "Consumptive"ও বলা হয়। এই ব্যাধিটিকেই "যক্ষ্মা" বা "ক্ষয়" ব্যাধি ব'লে এদেশের লোকে জানে।

রোগটা যখন 'টি. বি'.—

এই ব্যাধির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার কারুরই উপায় নাই—তা সে ধনী হোন, শিক্ষিত হোন, অভিজাত হোন, শিশু-যুবা-বৃদ্ধ হোন, রোগা বা বলবান হোন, পুরুষ বা স্ত্রী হোন, বা যে কোনো জাতি, দেশ, সম্প্রদায় বা ধর্মের হোন। সমাজের কোন স্তরই যক্ষ্মার আক্রমণের হাত এড়াতে পারেনি। কিন্তু এই ব্যাধি সব চেয়ে সাঙ্ঘাতিক ভাবে বিস্তার লাভ করেছে যুবাবয়স্কদের ভিতরে। সহস্র সহস্র যুবকের দীপ্তিময় যৌবন এই ব্যাধির দ্বারা হয়েছে আচ্ছন্ন, তাদের সমস্ত শক্তি, ঐশ্বর্য, বহুমুখী প্রতিভা, সম্ভাবনা —হয়েছে অকরুণ ভাবে লাঞ্ছিত। এই ব্যাধির ধ্বংস-স্পর্শে তাদের অনেকের জীবনের অনন্ত স্বপ্ন গেছে ধূলির মত চূর্ণ হয়ে।

প্রকৃত পক্ষে এই ব্যাধিটি নিতান্ত আধুনিক নয়। আমরা সন্ধান নিলে দেখতে পাব প্রাচীন কালেও এই ব্যাধির অস্তিত্ব ছিল। খৃষ্ট জন্মাবার চার পাঁচশো বছর আগে ছিল ইয়োরোপে গ্রীক চিকিৎসক Hippocrates এর কাল। 'ওদেশে Hippocrates কে বলা হয়ে থাকে Father of Medicine—ঔষধের জন্মদাতা। Hippocrates এর আগে ব্যাধিকে ভাবা হত দেবতার অসন্তোষ বা দৈত্য-দানার "নজর" ব'লে। কিন্তু মানুষের মন থেকে Hippocrates এই ধারণা উৎপাটিত করতে প্রয়াস পান। ওদেশে সর্বপ্রথম Hippocrates-ই অনেকটা যথাযথভাবে যক্ষ্মা-ব্যাধির বিবরণ দিতে সক্ষম হন এবং আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদেরাও বহুকাল পূর্বেকার ওই চিকিৎসকের এই ব্যাধি সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা সমর্থনই ক'রে থাকেন। তবে Hippocrates এই ব্যাধির কারণ সম্বন্ধে অথবা এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হলে ফুসফুসের কি কি অবস্থান্তর ঘটে, সে সব বিশেষ কিছু জানতেন না এবং এর চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁর ধারণাও খুব সুস্পষ্ট এবং যথাযথ ছিলনা। তবে তাঁর সমসাময়িক এবং পরবর্তী অনেকে এই ব্যাধি সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে আলোক-পাত ক'রে এসেছেন। ভারতবর্ষের

—রোগটা যখন 'টি. বি.'

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক চরক এবং সুশ্রুতের আবির্ভাব হয়েছিল Hippocrates-এরও একশো দেড়শো বছর আগে। তাঁরা এই ব্যাধি নিয়ে বিশেষরূপে আলোচনা করেছিলেন। তাঁদের রচিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীতে তাঁরা এই ব্যাধিকে নানাভাবে বিশ্লেষণ ক'রে এই ব্যাধির কারণ, লক্ষণ এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান বিষয়ের অবতারণা ক'রে গেছেন। কতগুলি মিশরদেশীয় "মামী-"কে পরীক্ষা ক'রে তাদের ভিতর এই ব্যাধির চিহ্ন দেখা গিয়েছে। এগুলি হাজার তিনেক বছরের পুরোনো। Neolithic বা New Stone Age যেটাকে বলা হয়ে থাকে—যখন মানুষের ভিতরে প্রচলিত ছিল পালিশ-করা পাথুরে অস্ত্রাদির ব্যবহার—সেই সময়েও মানুষ এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে—এটা তখনকার একখানা কঙ্কাল থেকে প্রমাণিত হয়েছে। এই কঙ্কাল দশ হাজার বছর আগেকার এবং ব্যাধির চিহ্ন মেরুদণ্ডের অস্থিতে পাওয়া গিয়েছিল। সুপ্রাচীন ঋগ্‌বেদ এবং অথর্ব বেদের বহুস্থানে দেখতে পাওয়া যায় যক্ষ্মার উল্লেখ। এবং এই সব গ্রন্থের কোনো কোনো শ্লোকে এই ব্যাধির উল্লেখ এমন ভাবে রয়েছে যে, এই ব্যাধি যে মানব দেহের প্রত্যেকটি স্থান আক্রমণ করতে পারে সেটা তখন অজানা ছিলনা। প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—এমন কি চর্মের কথা পর্যন্ত উল্লেখ ক'রে দেহ থেকে যক্ষ্মাকে বিতাড়িত করবার জন্যে মন্ত্রোচ্চারণ করা হয়েছে। এই ব্যাধির উল্লেখ রয়েছে রামায়ণ এবং মহাভারতেও।

অন্যান্য বহু ব্যাধির তুলনায় এই ব্যাধির গুরুত্ব যে অধিক তার কারণ অনেক। প্রথমতঃ এই ব্যাধি সারতে এত দীর্ঘ সময় নেয় যে, একজন রোগীর মন তিক্ত, বিষাক্ত হয়ে ওঠে—নানাভাবে। দ্বিতীয়তঃ এই ব্যাধির চিকিৎসা বহু ব্যয়সাধ্য; এবং এত দীর্ঘ সময় নেওয়াতে অনেকের পক্ষেই শেষ পর্যন্ত চিকিৎসা চালানো প্রায় সম্পূর্ণ অসম্ভবই হয়ে দাঁড়ায়। তৃতীয়তঃ

রোগটা যখন 'টি. বি.'—

চিকিৎসার গুণে ব্যাধির শান্তি হলেও এবং নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেও সম্পূর্ণ একজন সুস্থ দেহীর মতন জীবনযাপন এই ব্যাধিগ্রস্তের পক্ষে অনেক সময়ে সম্ভব হয় না। সহস্র বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে, নানা পঙ্গুতা নিয়ে, অপরের সাহায্য এবং অনুগ্রহের উপর নির্ভর ক'রে তাকে জীবনের বোঝাটাকে কোনমতে বয়ে চলতে হয়। চতুর্থতঃ যাদের এই ব্যাধি হয়েছে তারা যদি হয় অতিরিক্ত অজ্ঞ, অসতর্ক, বা অপরের শুভাশুভ সম্বন্ধে উদাসীন, তবে তারা হয়ে দাঁড়ায় আরও অসংখ্য লোকের অসুস্থতার কারণ—এই জন্যে, যে, যক্ষ্মা সংক্রামক ব্যাধি।

কিন্তু এই কটি কথা পড়েই কারুর হতাশ হবার প্রয়োজন নাই। সুদৃঢ়, সমবেত প্রচেষ্টা এবং আন্তরিকতা থাকলে এমন ব্যাধির কাছেও মানুষের হার মানবার কথা নয়।

এবারে যক্ষ্মা রোগের কারণ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য দু একটি বিষয় বলব।

আজকে Louis Pasteur-এর নাম কারুর অজানা থাকবার কথা নয়। একশো বছরও পূরো হয়নি, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, চর্মচক্ষুর অগোচর "কীটাণু" বা "জীবাণু"র দলই যে মানুষের বহু ব্যাধির কারণ, এই তথ্য আবিষ্কার ক'রে তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এনে দিলেন এক নতুন যুগ, এবং Bacteriologyর ভিত্তি স্থাপন করলেন। তাঁর আবিষ্কার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে জার্মান-বৈজ্ঞানিক Robert Koch তাঁর গবেষণাগারে ব'সে কিছুদিনের ভিতরেই এই মহা আবিষ্কার করলেন যে, যক্ষ্মা রোগের উৎপত্তি হয় একপ্রকার জীবাণু দ্বারা। নিজে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে বার্লিনের Physiological Societyর সভ্যদের সামনে তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর আবিষ্কার।

তিনি দেখালেন, মানুষ এবং নানারকম জন্তুর দেহ থেকে (যারা এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে) এই জীবাণু গ্রহণ ক'রে অন্য সুস্থ প্রাণীর দেহে

প্রবেশ করিয়ে দিলে তারা এই ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। Robert Koch-এর যুগান্তরকারি আবিষ্কার সমস্ত জগৎ বিস্ময়পূর্ণ প্রশংসার সঙ্গে গ্রহণ করলো। তিনি যক্ষ্মাজীবাণু সম্বন্ধে অনেক তথ্যেরই দিলেন সন্ধান।

যক্ষ্মাজীবাণু যে মানব-দেহের কোন্ স্থান আক্রমণ না করে, সে কথাই বলা কঠিন। গ্ল্যাণ্ড (গ্রন্থি), অস্থি, হৃৎপিণ্ড (কদাচিৎ), ফুস্‌ফুস্, প্লুরা (ফুস্‌ফুস্ এবং পঞ্জর-বেষ্টক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী), কান, নাক, টন্‌সিল (গলদেশের গ্রন্থি বিশেষ—আলজিবের উভয় পার্শ্বে থাকে) (কদাচিৎ), ল্যারিংস্ (কণ্ঠনালী), পাকস্থলী (কদাচিৎ), পেরিটোনিয়াম (উদর বেষ্টন ঝিল্লী), কিড্‌নী (মূত্রস্থান), ব্ল্যাডার (মূত্রাধার), অন্ত্র, অণ্ডকোষ, মস্তিষ্ক, চর্ম, জননেন্দ্রিয় ইত্যাদি—সমস্ত কিছুই আক্রান্ত হতে পারে এর দ্বারা। তবে ফুস্‌ফুস্‌ই আক্রান্ত হয় বেশির ভাগ। অন্যান্য স্থানের রোগযুক্ত লোক যত আছে, তাদের চাইতে ফুস্‌ফুসের এই রোগযুক্ত লোকের সংখ্যা অনেক অধিক, এবং "যক্ষ্মা" বললেই সাধারণতঃ লোকে বুকের কথাই আগে বুঝে থাকে। আমার বইতে আমি শুধু বুকের যক্ষ্মার বিষয়ই বলব।

অসুখের কথা জানবার আগে "বুক" সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা থাকবার দরকার। শরীর-কাণ্ডের উপরের অংশই হচ্ছে বক্ষস্থল। যে শাস্ত্রে শরীর গঠনের বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাতে এই অংশকে বলা হয়েছে "Thorax"; সাধারণের ভাষায় একেই Chest বলে। একজন সুস্থ ব্যক্তির বুক হওয়া উচিত প্রশস্ত এবং উন্নত এবং কোমরের দিকে ক্রমান্বয়ে হয়ে আসবে সরু। এখান থেকে সুরু হল তলপেট—শরীর-কাণ্ডের নিম্নাংশ। দুটি বাহু সংযুক্ত রয়েছে ব'লে কাঁধের দিকটাই সব চেয়ে চওড়া এবং এইটেই বুকের সব চেয়ে উপরের অংশ। বুকের কোন অংশ যদি এই অনুযায়ী না হয় এবং তার প্রসারণ উপযুক্তরূপ না হয় তবে তা অসুস্থ অবস্থাই সূচিত করে। শূন্য এবং অবনমিত বক্ষ জন্মগত দোষ হতে পারে,

কিন্তু অনেক সময় এটা যক্ষ্মার মত রোগেরও ইঙ্গিত ক'রে থাকে—বিশেষতঃ কণ্ঠাস্থির ধারটা যদি ওরকম হয়। গোলাকৃতি বা পীপের আকৃতি বুকও ক্রনিক্ ব্রঙ্কাইটিস্, হাঁপানি বা এই ধরণের অপর কোন ব্যাধির চিহ্ন স্বরূপ। পায়রার বুকের মত সঙ্কীর্ণ বুক "রিকেট" নামক ব্যাধির ফল। শৈশবে নাকে এবং গলার ভিতর কোন স্থায়ী রকমের বিঘ্নোৎপাদনকারী অবস্থা থাকলে বুকের এই ধরণের বিকলতা ঘটে থাকে।

মাংসপেশীর নীচেয় হচ্ছে বুকের পাঁজ্রা—যা দিয়েই বুকের খাঁচা হয়েছে গঠিত এবং যা নাকি হার্ট, ফুস্ফুস্ এবং এর তলাকার অন্যান্য কতগুলি যন্ত্রকে রক্ষা ক'রে থাকে। পাঁজ্রাগুলো হচ্ছে সরু, বাঁকানো হাড়ের টুক্রো এবং বুকের প্রত্যেক দিকে থাকে বারো খানা ক'রে। বুকের সামনের দিকটায় পাঁজ্রাগুলো একটা চ্যাপ্টা হাড়ের সঙ্গে থাকে সংযুক্ত—কতগুলি ছোট ছোট নরম হাড়ের টুক্রোর ভিতর দিয়ে—যে গুলোকে বলা হয়ে থাকে "Costal Cartilages" আর ঐ চ্যাপ্টা হাড়খানাকে বলা হয়ে থাকে "Sternum" অথবা "Breast Bone"। এগারো নম্বর এবং বারো নম্বর পাঁজরা দুখান কিছুর সঙ্গে সংযুক্ত নয়, এবং এদের অগ্রভাগ বুকের তলায় দুপাশে অনুভব করা যেতে পারে। পিছনে এই সব পাঁজরাগুলো মেরুদণ্ডের সঙ্গে আলগা ভাবে সংযুক্ত। এইরকম ঢিলে ভাবে যুক্ত থাকবার দরুন যখন ফুস্ফুস্ শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বায়ুপূর্ণ অবস্থায় প্রসারিত এবং সঙ্কুচিত হতে থাকে তখন এগুলোও সহজ ভাবে ওঠানামা করতে পারে। পাঁজরা, Sternum, মেরুদণ্ড ইত্যাদি দ্বারা তৈরি বুকের খাঁচাটির ভিতরে বক্ষগহ্বর একেবারে আবৃত ক'রে থাকে হার্ট, ফুস্ফুস্, রক্ত-নালিকা, অন্ন-নালিকা ইত্যাদি। কিন্তু ফুস্ফুস্ই হচ্ছে এদের ভিতরে সর্ববৃহদাকৃতি এবং অন্যান্য যন্ত্রগুলোকে প্রায় ঢেকে থাকে। তার ফলে, যদি পাঁজরাগুলোকে কাটা যায় তাহলে প্রথমেই নজরে পড়বে

ফুস্‌ফুস্‌ এবং তাদের আড়ালে আংশিকভাবে নজরে পড়বে হৃৎপিণ্ড বা হার্টকে। তাহলে বোঝা গেল যে ফুস্‌ফুস্‌ থাকে ঠিক পাঁজরার নীচেই— অর্থাৎ প্রথমে পাঁজরা তারপরেই ফুস্‌ফুস্‌। কিন্তু "প্লুরা" ব'লে একটা পাতলা, পরিষ্কার পর্দা তার এক অংশ দিয়ে আবরণের মত লেগে থাকে পাঁজরাগুলোর নীচেকার গা দিয়ে এবং অন্য অংশ দিয়ে একেবারে লেগে থাকে ফুস্‌ফুসের গায়ে। এই পর্দাটা অনেকটা চকচকে, পালিশ করা পাতলা কাগজের মত, কিন্তু শুক্‌নো নয়। শরীরের একরকম তরল স্রাব দ্বারা সব সময়ই প্লুরা থাকে সিক্ত, তার ফলে পাঁজরা এবং ফুস্‌ফুস্‌ যখন শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে আন্দোলিত হতে থাকে তখন বহিঃপ্লুরার এবং অন্তস্থ প্লুরার সংস্পর্শ হয় মসৃণভাবে এবং অনুভূতির অগোচরে। সুস্থ অবস্থায় প্লুরার এই দুটি অংশের মাঝখানে জায়গা সামান্যই থেকে থাকে, কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় যে তরল নিস্রাব প্লুরাকে সিক্ত রাখে তা অতিরিক্ত পরিমাণে হতে থাকে এবং জমতে থাকে দুই প্লুরার ভিতরে। এমন কি কখনো কখনো এই রস পূঁজে পর্যন্ত পরিণত হয়। এই অবস্থাগুলোর নাম হচ্ছে "প্লুরিসি" এবং "এম্‌পাইমা"। এই অবস্থায় ফুস্‌ফুস্‌ স্বভাবতই খানিকটা সঙ্কুচিত হয়ে পাঁজরার দিক থেকে সরে আসে।

ফুস্‌ফুস্‌ সংখ্যায় হচ্ছে দুটি—বুকের এক একদিকে এক একটি ক'রে। প্রত্যেক ফুস্‌ফুস্‌ বুকের উপরের অংশ থেকে একেবারে "Diaphragm" পর্যন্ত—তলার দিকে বিস্তৃত থাকে। "Diaphragm" অবস্থান করে একটি দেওয়ালের মতো—Thorax এবং Abdomen (পেট) এর মাঝে। ডান দিকের ফুস্‌ফুস্‌টি তিন ভাগে বিভক্ত—উপরের ভাগ, মধ্যের ভাগ এবং নীচের ভাগ; আর বাঁ দিকের ফুস্‌ফুস্‌ দুই ভাগে বিভক্ত— উপরের ভাগ এবং নীচের ভাগ। এই ভাগগুলোর এক একটিকে বলা হয় ফুস্‌ফুসের এক একটি "Lobe"। একেবারে উপরের Lobe-এর

চুড়াটাকে বলা হয়ে থাকে "Apex", এবং এই Apex অধিকার ক'রে থাকে কণ্ঠাস্থির অর্থাৎ collar bone-এর (যার নাম হল "Clavicle")— ইঞ্চিখানেক উপর পর্যন্ত—বুকের উপর অংশে একেবারে ঘাড়ের গোড়া পর্যন্ত। মাঝের এবং নীচের Lobeগুলি বুক এবং পীঠের বাকি অংশ থাকে জুড়ে। ফুস্‌ফুস্‌ নরম জিনিষ, এবং ভিতরে বায়ু বহন করবার দরুন স্পঞ্জের মতন দেখতে। শ্বাস-প্রশ্বাস চলবার সময়ে বাতাস ঢুকবার এবং বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে ফুস্‌ফুস্‌ প্রসারিত এবং আকুঞ্চিত হয়ে থাকে।

ফুস্‌ফুস্‌, হার্ট, শোণিত-নালী ইত্যাদি ছাড়া অন্ননালী এবং শ্বাস নালীর খানিকটা অংশ বক্ষ-গহ্বরের অভ্যন্তরে থাকে। শ্বাস-নালী অথবা "Trachea" বুকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এসে দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এখন একে বলা হয় "Bronchus". "Bronchus" আবার ফুস্‌ফুসের ভিতর গিয়ে কতগুলি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। সেগুলি আবার ক্রমে শাখা প্রশাখা বিস্তার করতে করতে আরও অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হতে থাকে। অবশেষে এমন হয় যে একটা গাছের পাতার ভিতরে শিরাগুলো যেমন দেখা যায়—ওই গুলিও ওরকম হ'য়ে যায়—স্থূল থেকে ক্রমাগত সূক্ষ্মভাবে বিভক্ত হতে হতে।

বহু সুস্থ ব্যক্তিই জেনে একটু আশ্চর্য বোধ করবেন যে হয়ত তাঁদের অনেকের দেহেই তাঁদের জীবনের কোন না কোন সময়ে কোন না কোন ভাবে যক্ষ্মা-জীবাণু প্রবেশ লাভ ক'রেছে। যতদিন পর্যন্ত এই জীবাণুগুলি একটি স্থানে বন্দী অবস্থায় থাকে এবং ক্রমবর্দ্ধমান অসুখের সৃষ্টি না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই অবস্থাটাকে "infection" (সংক্রমণ) এর অবস্থা বলা হয়। "টিউবারকিউলিন্‌ টেস্ট্‌" দ্বারা infection ধরা যায়।

(Tuberculin Test কি রকম ক'রে করা হয়, তা একটু বলছি। "টিউবারকুলিন" হচ্ছে ক্ষয় রোগেরই জীবাণু দ্বারা কতগুলি বিশেষ

প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে তৈরি করা এক রকম নির্দোষ কাথ। এই কাথ শরীরে প্রবেশ করিয়ে তার প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ দ্বারা শরীরে যক্ষ্মা-জীবাণু প্রবিষ্ট হয়েছে কিনা তা বুঝতে পারা যায়। টিউবারকুলিন দ্বারা একাধিক উপায়ে পরীক্ষা হতে পারে। "Mantoux Test" ব'লে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যেটা চামড়ার প্রথম স্তরের নীচেই করা হয়, সেটাতে প্রথমে বেছে নেওয়া হয় বাহু অথবা শরীরের অপর কোন লোম শূন্য মসৃণ স্থান। নির্দিষ্ট পরিমাণ একটু টিউবারকুলিন্ প্রথমে ইঞ্জেকশান করা হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর যদি ইঞ্জেক্শনের জায়গাটা লাল হয়ে ওঠে এবং স্ফীতও হয়ে ওঠে তা হলে তাকে বলা হয়ে থাকে "Positive reaction"—এবং শরীরে জীবাণু-প্রবেশ ঘটেছে এটা তারই ইঙ্গিত করে। কিন্তু যদি লাল দাগ বিশেষ কিছু না হয়, সঙ্গে ফোলার ভাবও কিছু না থাকে, তাহলে তাকে বলা হয়ে থাকে "Negative reaction", এবং তার মানে এই যে শরীরে যক্ষ্মা জীবাণু এখনো ঢোকে নাই। যক্ষ্মা জীবাণু শরীরে ঢুকেছে বা না ঢুকেছে এটা "টিউবারকুলিন" পরীক্ষা দ্বারা বোঝা গেলেও, শরীরের ঠিক কোনখানে তাদের অবস্থিতি, তা বোঝা যায় না।)

দেহে টিউবারকুলোসিস্ ব্যাধিটি পরিস্ফুট হয়ে তখনই ওঠে যখন নাকি কোন না কোন সময়ে বাইরে কতগুলি বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায় অথবা আক্রান্ত স্থানে কতগুলি অস্বাভাবিক পরিবর্তনের চিহ্ন ধরা পড়ে। প্রকৃতপক্ষে "Infection"-টাও একটা স্বাভাবিক বা সুস্থ অবস্থা নয় এবং এটাকেও অসুস্থ অবস্থা বলেই ধরা যেতে পারে। কিন্তু মাত্র "Infection" যখন ঘটে, তখন সেটা অতি সামান্য জায়গার ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং দেহী কিছুমাত্র অসুস্থতাও কখনো বোধ করে না। এই "Infection"-ই ক্রমে পরিণত হতে পারে সত্যিকারের "disease"এ।

রোগটা যখন 'টি. বি.'—

যদিও মানব সমাজের বহু জনেই যক্ষ্মা-জীবাণুর দ্বারা সংক্রামিত হয়েছে, তাহলেও সবাই-ই যে একেবারে রীতিমত "রোগী"তে পরিণত হয়েছে তা নয়। সংক্রমণটা অসুখের অবস্থাতে পরিণত হয় তখনই—যে অবস্থায় নাকি জীবাণুগুলির পক্ষে মানুষের দেহ একটি অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে।

মানুষের শরীরে একেবারে সর্বপ্রথম যে সংক্রমণ ঘটে থাকে তাকে বলা হয় "Primary infection" বা প্রাথমিক সংক্রমণ, এবং তার পরে যে সংক্রমণ হয়ে থাকে তাকে বলা হয় "Super infection" বা "Re-infection" অর্থাৎ পুনঃ-সংক্রমণ। একেবারে প্রথম সংক্রমণটা সব সময়েই ঘটে বাইরে থেকে, কিন্তু পুনঃ-সংক্রমণটা ঘটতে পারে বাহির বা ভিতর—দু দিক থেকেই। প্রাথমিক সংক্রমণের ফলে শরীরের কোনো স্থানে অবস্থান্তর ঘটতে পারে। কিন্তু অনেক সময়ে বলা হয়েছে যে এই ঈষৎ অস্বাভাবিক অবস্থা ভয়ের কোন কারণ নয়—যদি নাকি এটা বাড়বার সুযোগ না পায় এবং যক্ষ্মা-জীবাণুগুলি বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ ক'রে নিজেদিগকে সংখ্যায় বাড়াতে এবং ক্রমে বিস্তার লাভ করতে না পারে। আমি বলেছি যে পুনঃ-সংক্রমণ "বাহির" বা "ভিতর"—দু দিক থেকেই ঘটতে পারে। "ভিতর" বলতে আমি শরীরের এই প্রাথমিক অস্বাভাবিক অবস্থার কথাই বুঝিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে ঠিক "প্রাথমিক" সংক্রমণ অনেক সময়েই ব্যাধির কারণ হয় না, বিশেষ ক'রে জীবাণুর সংখ্যা যদি খুব কম হয় তবে ফুসফুসে কোন ক্ষত আদৌ না হতে পারে। কিন্তু পুনঃ-সংক্রমণই হচ্ছে বিপজ্জনক। "পুনঃ-সংক্রমণ" যত বারে বারে ঘটবে এবং যক্ষ্মা-জীবাণুর মাত্রা যত বেশি হবে, ততই মানুষটির ব্যাধি দ্বারা চিৎপটাং হবার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বাইরের কোন সূত্র থেকে infection বা re-infectionকে বলা হয় "Exogenous infection" (বা re-infection) এবং যক্ষ্মা-জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন শরীরেরই ভিতরকার

আগেকার কোনো ক্ষত থেকে যে নতুন সংক্রমণ হয় তাকে বলা হয় "Endogenous infection" (বা re-infection)। অধুনা endogenous infection সম্বন্ধে গবেষণা নানা মূল্যবান তথ্যের উদ্‌ঘাটন করেছে।

আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে বয়স্কদের চাইতে শিশুদের দেহে এই রোগপ্রবণতা অনেক বেশি এবং মানুষের বয়স ক্রমে বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এই রোগ সম্বন্ধে তাদের অবস্থা অনেকটা নিরাপদ হয়। কিন্তু অনেক যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞ এটা মানতে রাজি নন। তাঁরা বলেন, শিশুদের এবং বয়স্কদের ভিতর যক্ষ্মা-রোগের আক্রমণ সম্বন্ধে এই যে একটা তফাৎ করা এর পিছনে কোনো যুক্তিই খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁরা বলেন যে শিশুদের যে এই রোগ-প্রতিরোধ শক্তি বয়স্কদের চাইতে কম এ বিষয়ে কোনই সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই। প্রকৃতপক্ষে এইটেই দেখা যায় যে শিশুদের চাইতে বয়স্কদের ভিতরেই এই ব্যাধির আধিক্য এবং আধিপত্য অনেক বেশি। এবং যে ধরণের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই ব্যাধি-সৃষ্টি করবার পক্ষে অনুকূল সেগুলোকে ধরে নিয়েও বিবেচনা করলে দেখা যায় যে বয়স্কদের ভিতর প্রতিরোধ-শক্তি বেশি এটা প্রমাণ করা শক্ত। এই রোগ-প্রতিরোধ-শক্তির ভিতর এমন সব ব্যাপার আছে যে দেখা গিয়েছে কোনো ক্ষেত্রে শিশুই অধিক প্রতিরোধ-শক্তি সম্পন্ন, আবার কোনো ক্ষেত্রে বা বয়স্কেরাই অধিক প্রতিরোধ-শক্তিসম্পন্ন। এই বিষয়ে দাঁড়িপাল্লা যে ঠিক কোন্ জায়গায় ওঠা নামা করে তা বোঝা কঠিন। প্রতিরোধ-শক্তি খুব সম্ভবতঃ অনেক ক্ষেত্রেই একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং এ সম্বন্ধে কোন সাধারণ মত টেনে আনতে গেলে ভুলই করা হবে। এই সব বিশেষজ্ঞগণ এই কথা বলছেন যে প্রতিরোধ-শক্তি বা এই রোগ সম্বন্ধে নিরাপত্তাটাকে ওভাবে ধরে না নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে—ক্ষেত্র বিশেষেই ওগুলির করতে হবে

বিচার এবং স্বরূপ নির্ধারণ। যক্ষ্মা রোগ শিশু এবং বয়স্ক উভয়কেই সমান ভাবে অভিভূত করে এটা স্বীকার করলে বৃহত্তর বিজ্ঞান-নীতিরই অনুসরণ করা হবে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অধিকতর সুফল পাওয়া যাবে। সব চাইতে যুক্তিযুক্ত কাজ হচ্ছে—সে কোনো বয়সেরই হোক না কেন, প্রত্যেককে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করা। এই সব বিশেষজ্ঞগণ এই মত প্রকাশ করছেন যে, বয়স্কগণ একটা মন্ত্রপূত নিরাপদ গণ্ডির মধ্যে বাস করে এবং বয়োবৃদ্ধির অবস্থাটা একটা সুবিধাজনক অবস্থা, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে থাকাটা একটা ক্ষতিরই কারণ হতে পারে এবং এই মত গ্রহণ ক'রে সেই অনুযায়ী কাজ করাটা মন্দের দিকেই চালিত করবে। তা ছাড়া এই মত যে যথেষ্ট ভ্রমাত্মক সে সম্বন্ধে প্রচুর প্রমাণ আছে।

বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, শরীরাবস্থিত অল্প পরিমাণ যক্ষ্মা বিষ ঐ রোগ থেকে শরীরকে কিছুটা নিরাপদ রাখতে সাহায্য করে। এই রোগের বিষ একটুখানি শরীরে থাকলে তা খানিকটা এই রোগ-প্রতিষেধকের কাজই ক'রে থাকে এবং যে দেহে জীবাণু-সংক্রমণ একেবারেই হয় নাই সেই দেহ অপেক্ষা যে দেহ সংক্রামিত হয়েছে সেই দেহ এই রোগকে বেশি সফলতার সঙ্গে বাধা দিতে পারে। তবে বিষয়টি নিয়ে বিশেষজ্ঞগণের ভিতর বহু রকম মতামত বর্তমান এবং বিষয়টিকে উপলক্ষ্য ক'রে এমন সব জটিল আলোচনা চলতে পারে যার বিস্তৃত উল্লেখ এখানে সম্ভবপর নয়। শরীরে অল্প পরিমাণ যক্ষ্মাজীবাণু থাকাটাকে আবার একপক্ষে বিপজ্জনকও বলা হয়েছে এই জন্যে যে সুবিধা পেলে এরাই আবার শরীরের গুরুতর ক্ষতি আরম্ভ করতে পারে। প্রথম সংক্রমণের অবস্থার পক্ষে পুনঃ-সংক্রমণকে বাধা দেবার শক্তি অত্যন্তই সীমাবদ্ধ ব'লে দেখা গিয়েছে।

কৃত্রিম উপায়ে শরীরকে যক্ষ্মার হাত থেকে খানিকটা নিরাপদ করবার জন্যে "B C G" (Bacillus Calmette Guerin—আবিষ্কর্তারই

নামানুসারে)—নামে একটি টিকা দেবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এ টিকাও কতটা ফলপ্রদ এ সম্বন্ধে এখনো কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বিশেষজ্ঞেরা পারেন নি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভাল। অনেক সময়ে অনেকে সাধারণ স্বাস্থ্য এবং দেহের রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতার একটা খিচুড়ী ক'রে ফেলেন। এবং এই ভেবে আশ্চর্য বোধ করেন যে একজন পালোয়ানের মতন লোকেরও কি ক'রে টি. বি. হয়। সাধারণ-স্বাস্থ্য-ভালো-থাকাটা রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতার উপর খানিকটা প্রভাব অবশ্যই বিস্তার করে বটে, কিন্তু দেহকে এই রোগ থেকে রক্ষা করবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা "সাধারণ-ভালো-স্বাস্থ্যে"র নাই। আর, এই প্রতিরোধ-শক্তিও মানুষের দেহের সব স্থানে সমান নয়। অন্য সব স্থানে এটি খুব বেশি থাকলেও একজন লোকের ফুস্‌ফুসে হয়ত সেটি অত্যন্ত কম থাকতে পারে। আবার পরীক্ষা দ্বারা এ-ও প্রমাণিত হয়েছে—একজন ব্যক্তির ফুস্‌ফুসও হয়ত সর্বত্র সমান প্রতিরোধ-শক্তিসম্পন্ন নয়। এক স্থানে শক্তিটি হয়ত বেশি, অপর অংশে খুব কম। তবে নানারকম ব্যাধি বা অপর নানা কারণে যাদের সাধারণ স্বাস্থ্য দুর্বল, প্রতিরোধ-শক্তিও তাদের দরিদ্র হওয়া স্বাভাবিক এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা তাদের অবশ্যই করতে হবে।

সাধারণতঃ প্রথমে যক্ষ্মাজীবাণু শরীরে প্রবেশলাভ করে নাকের ভিতর দিয়ে অথবা মুখের ভিতর দিয়ে। (গায়ের চামড়ার কোন স্থানে ক্ষত থাকলে, বা কোথাও কেটে গেলে সেখান দিয়েও যক্ষ্মাজীবাণু শরীরে প্রবেশ লাভ করতে পারে—রক্তের সঙ্গে মিশে।) তার পরে ক্রমে ক্রমে চলতে চলতে রক্তস্রোত এবং রসবাহী গ্রন্থিগুলোর ভিতর দিয়ে পথ ক'রে ক'রে অবশেষে স্থান নেয় এসে ফুস্‌ফুসে। কিন্তু তাদের এই চলার পথটা নিতান্ত সহজ নয়। প্রত্যেক জায়গাতেই এরা বাধা পেতে পেতে আসে। গলার

পশ্চাদ্দেশে একরকম চট্‌চটে শ্লেষ্মা উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "গ্ল্যাণ্ডের" অবস্থান। তারপরে জিভের পিছনে দুদিকে দুটো টন্‌সিল্‌। ক্রমান্বয়ে ঘাড়ের ভিতর এবং ফুস্‌ফুস্‌ অভিগামী পথে আরো গভীরতর স্থানেও রয়েছে গ্ল্যাণ্ডরূপী প্রহরীর দল। এরা সকলেই জীবাণুগুলিকে দিতে থাকে বাধা। এতগুলি বাধা অতিক্রম ক'রে তবে এদের পক্ষে ফুস্‌ফুসে আগমন অথবা ক্রমান্বয়ে দেহের অপরাপর স্থানে নীত হওয়া সম্ভব হয়। অনেক জীবাণুকেই এই সব গ্ল্যাণ্ডের দল—(যারা নাকি "ছাকনী"র মত কাজ করে)—হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়; কিন্তু নিজেরা যখন হয়ে পড়ে দুর্বল বা ব্যাধিগ্রস্ত তখন আর পেরে ওঠেনা ওদের সঙ্গে।

মানুষের দেহে প্রহরীরূপে আছে যে শ্বেতকণিকার দল, তারা এই জীবাণুর বিরুদ্ধে ঘোষণা করে বিপুল সংগ্রাম। মানুষের পরম বন্ধু চিরজাগ্রত সেনানী—এই যে শ্বেতকণিকার দল, এরা আপ্রাণ চেষ্টায় সুরু করে যক্ষ্মা-জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করতে। এই সংগ্রামে কখনো জয়ী হয় এপক্ষ, কখনো ওপক্ষ। শ্বেত-কণিকাগুলিকে যদি যক্ষ্মাজীবাণুর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়, তবে ক্রমে ঘটে গেল সমস্ত মানুষটিরই পরাজয়; আনন্দের সঙ্গে ধ্বংসলীলা চালানোর পক্ষে যক্ষ্মাজীবাণুর রইল না কোন বাধা। তবে একটা কথা। অনেক সময়ে সর্বপ্রথম সংক্রমণের সময়ে শরীরের সিপাইরা তাড়াতাড়ি সাড়া দিতে চায়না, কোন কোন ক্ষেত্রে সাড়া দিতে বড়ই দেরি করে। কিন্তু প্রথম সংক্রমণ ঘটে যাবার পরে গড়ে ওঠে যেন একটি নতুন সামরিক শক্তি এবং সিপাইরা হয়ে ওঠে চট্‌পটে। ফলে পরবর্তী কালে যদি নতুন প্রবেশকারী জীবাণুর দল অতিরিক্ত শক্তিশালী না হয় তবে শরীরের ক্ষতি করবার আগেই এই সিপাইরা ওদের পারে কাবু ক'রে দিতে। যক্ষ্মা-জীবাণুর প্রথম দেহ-প্রবেশ থেকে সুরু ক'রে কেমন ক'রে তাঁরা আপনাদের সংখ্যা বিস্তার করে, কোথা দিয়ে কি ভাবে চ'লে, কোথায়

কোথায় কি ভাবে আশ্রয় লাভ ক'রে, ফুস্‌ফুসের কি কি পরিবর্তন তারা পর পর সাধন ক'রে চলে, তাদের সঙ্গে শ্বেতকণিকার যুদ্ধপ্রণালী, তাদের অবরোধ প্রক্রিয়া, অথবা তাদের ধ্বংস সাধন ইত্যাদি বিষয়গুলি এত বিচিত্র এবং বিস্ময়কর যে তা বলবার নয়।

বাইরের কোন সূত্র থেকে যে infection ঘটে থাকে, তাকে "exogenous infection" বলা হয় তা আমি বলেছি। এবারে এই exogenous infection সাধারণতঃ কোন্ কোন্ উপায়ে সুস্থ দেহে ঘ'টে একজন লোককে টি. বি.-গ্রস্ত ক'রে তোলে, আমি তার আলোচনা করব।

বলেছি, এক রকম জীবাণুই মানুষের দেহে এই রোগোৎপত্তির কারণ। এই জীবাণুকে "Tubercle bacillus" নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই জীবাণু অতি সূক্ষ্ম দণ্ডের আকৃতি বিশিষ্ট এবং এর দেহ মোমজাতীয় এক রকম জিনিষের বর্মদ্বারা আবৃত। নিজেদের চলবার শক্তি এদের নাই, অন্য বাহন আশ্রয় করে হ'তে থাকে এরা অগ্রসর। যে আবরণের আড়ালে এর দেহখানি থাকে তা অতি দুর্ভেদ্য—রাসায়নিক দ্রব্যাদি দ্বারাই হোক বা অন্য প্রকারেই হোক—এদের ধ্বংস সাধন সহজ ব্যাপার নয়। আর এই জীবাণু এত ক্ষুদ্রাকৃতি যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচেয় তিন-চারশো গুণ বাড়িয়ে তবে একে চোখে দেখা সম্ভব হয়। একটি পিনের ছিদ্র-পথ হাজার জীবাণু অনায়াসে পাশাপাশি এক সঙ্গে অতিক্রম ক'রে যেতে পারে। এক ইঞ্চি পরিমিত স্থানের মাত্র একটি স্তরে যদি যক্ষ্মা-জীবাণু পাশাপাশি ক'রে সাজানো যায় তবে পঞ্চাশ ষাট কোটিরও উপর যক্ষ্মাজীবাণুর দরকার হবে। এই জীবাণু উপযুক্ত আশ্রয় পেলে নিজেদের বিভক্ত করতে করতে অতি দ্রুত গতিতে সংখ্যায় বেড়ে চলে। পণ্ডিতেরা বলেছেন যে, সব যক্ষ্মাজীবাণু এক ধরণের নয়। প্রধানতঃ গরুর দেহে যে জাতীয় জীবাণু পাওয়া যায়

এবং মানুষের দেহে অপর যে জাতীয় জীবাণু পাওয়া যায়—এই দুই প্রকারের জীবাণু নিয়েই বেশী আলোচনা হয়েছে। যে শ্রেণীর জীবাণু গাভীর দেহে এই রোগ উৎপন্ন করে তাকে বলা হয়েছে Bovine Type এবং যে শ্রেণীর জীবাণু মানুষের দেহে এই রোগ উৎপন্ন করে তাকে বলা হয়েছে Human Type. কিন্তু যক্ষ্মাজীবাণুর আরেক প্রকার শ্রেণীবিভাগও আছে—এই শ্রেণীর নাম হচ্ছে "অ্যাভিয়ান টাইপ"—(Avian type), এবং কুক্কুটাদি গৃহপালিত পক্ষী, শূকর ইত্যাদির ভিতরে পাওয়া যায় এদের সন্ধান। এই (অ্যাভিয়ান) জাতীয় জীবাণু মানুষের দেহকে আক্রমণ করে না ব'লেই পণ্ডিতেরা বলছেন।

যক্ষ্মাক্রান্ত ব্যক্তির কাসির সঙ্গে যে গয়ের ওঠে, সেই গয়েরের ভিতর লক্ষ লক্ষ যক্ষ্মা জীবাণু থাকতে পারে। একজন অজ্ঞ বা অপরিচ্ছন্ন রোগী যখন কেশে ইতস্ততঃ গয়ের নিক্ষেপ করে, অন্যের সর্বনাশ ঘটবার পথ তখনই সে করে পরিষ্কার। এই গয়ের শুকিয়ে মেশে ধূলির সঙ্গে, হাওয়ায় ওড়ে সে ধূলি ; ধূলি-বাহিত জীবাণু নিশ্বাসের সঙ্গে করে অপরের দেহ-প্রবেশ। অথবা সেই গয়েরের উপরে এসে বসে মাছি, সেই মাছি গিয়ে বসে আবার খাদ্য-দ্রব্যের উপর ; খাদ্যের সঙ্গে জীবাণু গিয়ে আশ্রয় লাভ করে মানুষের দেহে। পরিবারের একটি লোকের যখন হয় এই ব্যাধি, যত্রতত্র সে গয়ের ফেলে—উঠানে, ঘরের মেজেতে—আর শিশুরা ঘরময়, বাড়ীময় করে ছুটোছুটি, খেলাধূলো। হাত দিয়ে তারা কত সময়ে স্পর্শ করে সেই গয়ের, কতভাবে তারা সেই বিষাক্ত গয়েরের সংস্পর্শে আসে। *টিনের সৈন্য* আর সেলুলয়েডের হাতী থেকে সুরু ক'রে কত জিনিষ দেয় তারা মুখে পুরে, সে জিনিষগুলোর গায়ে আগেই হয়ত কতভাবে যক্ষ্মা জীবাণু লেগে থাকবার সুযোগ পেয়েছে। অনেক বাড়ীতে আছেন বুড়ো দিদিমা—অনেককাল ধরেই হয়ত তিনি কেশে আসছেন,

যেখানে সেখানে গয়েরও ফেলে থাকেন—কেউ তা গ্রাহ্যি করে না। কিন্তু কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়, দিদিমার বুকে হয়ত বহুদিনকার একটি যক্ষ্মার স্থায়ী ক্ষত আছে—এবং তিনি হয়ত অবিরতই বাড়ীর শিশুদের সংক্রামিত করে আসছেন। বাড়ীর বুড়ো চাকর আহাম্মদ দাদা বা প্রসন্নকাকা সম্বন্ধেও ওকথা বলা যেতে পারে। জুতোর সঙ্গেও বাড়ীতে যক্ষ্মা জীবাণু প্রবেশ লাভ করবার পায় সুযোগ। তাই বলে বাড়ীর অভ্যন্তরই যক্ষ্মার একমাত্র লীলাক্ষেত্র নয়। পথ-ঘাট, অপিশ, দোকান, স্কুল, কলেজ, যান, প্রমোদ-ভবন, যে কোন লোক-সমাগম, হোটেল, রেস্তোরাঁ—ইত্যাদির সর্বত্রই রয়েছে যক্ষ্মা জীবাণুর মেলা; কোন না কোন স্থানে কোন না কোন সূত্র থেকে সংক্রমণ ঘটলেই হল!

অনেক টি. বি. রোগীর বদ অভ্যাস আছে, অন্যের মুখের উপর তারা কাশে। অতি ভয়ানক এই অভ্যাস—কারণ পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে ক্ষয়রোগী যখন জোরে জোরে কাশে তাদের কাসির সঙ্গে থুতুর কণা বাইরে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই কণাগুলি জীবাণু-পূর্ণ। অনেক সময়ে যক্ষ্মা রোগীর পোষাক-পরিচ্ছদ, তোয়ালে, গামছা, বিছানা-পত্র ব্যবহার করার ফলে (সেগুলিকে উত্তমরূপে সংশোধিত না ক'রে নিয়ে) এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সম্ভব। অনেক রোগী নিজের মুখের কাছে হাত নিয়ে কাশে, কিন্তু সেই হাত আর বেশ ভাল ক'রে ধুয়ে ফেলবার প্রয়োজন বোধ করে না। সেই হাত দিয়ে সে যখন অন্যকে স্পর্শ করে অথবা অন্যের অপর জিনিষ-পত্র, খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করে, তখন সে ডেকে আনে অনেক সময়ে সেই লোকটির বিপদ। চুম্বন দ্বারা অনায়াসে সে এই ব্যাধি সংক্রামিত ক'রে দিতে পারে অপরের দেহে। যে পাত্রে একজন রোগী খেয়েছে, উপযুক্ত ভাবে তা সংশোধিত না ক'রে যদি সেই পাত্রে কেউ ভক্ষণ করে, অথবা তার খাদ্যাবশিষ্ট কেউ ভক্ষণ করে, তবে বিপদের বোঝা ঘাড়ে তুলে সে নেয়।

তারপরে, এক হুঁকোয় তামাক খাওয়া, কলম বা পেন্সিলের ডগা চোষা, অথবা জিব থেকে আঙুলে থুতু নিয়ে বইএর পাতা উল্টান, এ দ্বারাও দেহে জীবাণু-সংক্রমণের সুবিধা হয়। যেখানে যেখানে যক্ষ্মারোগী গয়ের ফেলেছে সেখানকার মাটি নিয়ে খাওয়ার বাসনপত্র মাজার ভিতরেও সংক্রমণের বিপদ বর্তমান। এবারে দুধ। যক্ষ্মাগ্রস্ত গাভীর দুধে প্রচুর পরিমাণে যক্ষ্মাজীবাণু থাকতে পারে। অভিজ্ঞদের মতে এই দুধ বিশুদ্ধ এবং জীবাণু-মুক্ত না ক'রে পান করবার দরুন মানুষ—বিশেষ ক'রে শিশুরা পড়ে এই ব্যাধির কবলে। তবে ভারতবর্ষে সাধারণতঃ দুধ সিদ্ধ করেই লোকে পান করে থাকে, এতে সংক্রমণের ভয় অনেক কমে যায়। কেউ কেউ এমন কথা বলেন যে ভারতবর্ষীয় গাভীদের ভিতর যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ সচরাচর তেমন দেখাও যায় না। তবে ইয়োরোপ বা আমেরিকায় গৃহপালিত পশুর ভিতর যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ এবং দুধের ভিতর দিয়ে সংক্রমণ নিয়ে বিশেষ রকম আলোচনা এবং গবেষণা হয়ে থাকে। শিশুদের শরীরে যক্ষ্মাজীবাণু প্রবেশের জন্যে যক্ষ্মাজীবাণুযুক্ত দুধ প্রচুর পরিমাণে দায়ী, একথা অভিজ্ঞেরা বলছেন।

অনেক দরিদ্র পরিবারেই ছোট একটি ঘরকে পরিবারের কয়েকজনে মিলে অধিকার ক'রে থাকতে হয়। এখন হঠাৎ এর ভিতর কারুর দেহে যদি ক্ষয় ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে দরিদ্রতা নিবন্ধন একলা রোগীকে আলাদা একটি ঘর ছেড়ে দেওয়া পরিবারটির পক্ষে হয়ত একেবারে অসম্ভব হয়। এবং রোগীকে নিয়ে এক সঙ্গে থাকতে গিয়ে সবাই হয়ত এক এক ক'রে শোচনীয় ভাবে আক্রান্ত হ'য়ে পড়ে।

বলেছি, বুকে ছাড়াও অন্য জায়গায় টি. বি. হয়ে থাকে। দেহের অন্য কোথাও টি. বি. হলে টি. বি.র ক্ষত থেকে উৎপন্ন পুঁজ বা স্রাব বিপজ্জনক হয়ে থাকে, কারণ তার ভিতরে যক্ষ্মাজীবাণু পাওয়া যায়। অস্ত্রাদি অথবা

মূত্র যন্ত্রাদি আক্রান্ত হলে রোগীর মল, মূত্র এই জীবাণুর বাহন হয়ে থাকে। যে কোন রকম টি. বি. রোগীর ঘামে জীবাণু থাকে না তাই ব'লে।

"Tubercle Bacillus"-ই যদিও মানুষের দেহে টি. বি. উৎপন্ন করবার মুখ্য কারণ, তা হলেও আরও কতগুলি ব্যাপার আছে যেগুলি এই রোগ উৎপাদনের ব্যাপারে গৌণ ভাবে সাহায্য করে থাকে। ফসল ফলাতে হলে যেমন বীজের দরকার তেমন আবার ক্ষেত্রকেও উপযুক্ত ভাবে তৈরী হতে হয়। অসুখের বেলাতেও এ নিয়ম খাটে। Tubercle Bacillus—এই অতিসূক্ষ্ম উদ্ভিদ্ জাতীয় জীবাণুকে যদি "বীজ" ধরা যায়, তবে কতকগুলি অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিকের ভিতরে মানুষের দেহ তৈরী হয়ে ওঠে উপযুক্ত "ক্ষেত্র"রূপে। দেশবাসীর সাধারণ স্বাস্থ্যের হানি যতই ঘটে চলবে—ততই যে যক্ষ্মাব্যাধির দুরন্ত আস্ফালন বেড়ে চলবে এটা স্বাভাবিক। স্বাস্থ্য হানি কেমন ক'রে ঘটে সে কথা বলতে প্রথমেই আসে খাদ্যের কথা। এমন সহস্র সহস্র হতভাগ্য পরিবার এদেশে আছে—ভালভাবে উদর পূরণ করবার জন্যে দুটি বেলার অন্ন-সংস্থান হয় না। ক্ষুধার জ্বালায় জীর্ণ, জর্জরিত। যারা অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান, যারা দুটি মুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করবার ক্ষমতা রাখে, তাদেরও অনেকে জানেনা খাওয়ার পদ্ধতি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতি সহজ নিয়মগুলিকে লঙ্ঘন করবার ফলে দেহ হয়ে পড়ে পীড়িত। তারপরে অনেক খাদ্যদ্রব্য সব সময়ে বিশুদ্ধভাবে পাওয়াও দুরূহ যে না হয় তা নয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর এবং বিশুদ্ধ খাদ্য সংগ্রহ করবার মত আর্থিক অবস্থা এদেশে মুষ্টিমেয় লোকেরও আছে কিনা সন্দেহ। যা খেয়ে জীবন ধারণ করবার চেষ্টা করতে হবে তা যদি প্রথমে হয় অপর্যাপ্ত, তারপরে অনেক সময়ে অখাদ্য, তা হলে দেহ যে অবিলম্বে ব্যাধির আকর হয়ে উঠবে তাতে বিচিত্র কি! এদেশে এমন পিতামাতার অভাব নাই যারা তাদের শিশুকে এক বিন্দু দুধ দিতেই অক্ষম—যক্ষ্মাজীবাণু-

যুক্ত দুধ খেলে শিশুর শরীরে যক্ষ্মা প্রবিষ্ট হবে এত অনেক দূরেরই কথা!

তারপরে আলো বাতাস। অনেক সময়েই একটি মহানগরীর বুকে মানুষকে যে ভাবে জীবন যাপন করতে হয়—সে চিত্র মনে একটি বিভীষিকারই সৃষ্টি করে। ধূলো, কল-কারখানার ধোঁয়া সারা আকাশকে গ্রাস ক'রে বিরাজ করে রাহুর মত—আকাশের অজস্র, অনন্ত আশীর্বাদ আলো, বাতাস ওঠে বিক্ষুব্ধ, বিষাক্ত হয়ে। এমন অনেক কক্ষে মানুষের বাস করতে হয়—যেখানে তারা প্রবেশ করতে পারে না, তাদের কল্যাণ স্পর্শে সে সব স্থানকে পারে না নির্দোষ, সুন্দর ক'রে তুলতে। একটু আগে যা বলেছি—অসীম দারিদ্র্যের তাড়নায় কত সময় একটি ক্ষুদ্র কক্ষকে অধিকার করতে হয় একটি সমগ্র পরিবারের; পরস্পরের বিষাক্ত, দূষিত প্রশ্বাস পরস্পরকে করতে হয় গ্রহণ।

এর পরে আছে সহস্র দুশ্চিন্তা। অর্থের নিদারুণ অসচ্ছলতা—অথচ প্রয়োজন একান্ত। প্রতিদিনকার অভাবের তাড়না, প্রতিমুহূর্তের সহস্র ব্যর্থতার নিদারুণ হাহাকার, প্রতি পদে পদে মানসিক শান্তির বিপুল বিপর্যয়—এবং তারি সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাধির প্রশস্ত পথের দ্বারোন্মোচন! বস্তুতঃ কোন সুপ্রসিদ্ধ যক্ষ্মাবিশেষজ্ঞ ঠিক কথাই বলেছেন যে, টিউবারকিউলোসিস্ প্রধানতঃ মানুষের বুভুক্ষার প্রকাশ—বিশুদ্ধ বাতাসের, বিশুদ্ধ ও পর্যাপ্ত খাদ্যের, বিশুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের এবং বিশুদ্ধ মনের। এবং এই চারিটির উপর ভিত্তি করেই পীড়িত মানবজাতির জন্যে স্বাস্থ্য-মন্দির নির্মিত হতে পারে—টিউবার-কিউলোসিস্, তথা সমস্ত ব্যাধির আরোগ্য এবং প্রতিষেধকল্পে!

প্রকৃতপক্ষে মানুষের দেহ নানাভাবে এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হবার উপযুক্ত হতে পারে। অনিয়মিত পানাহার, অনিদ্রা, কঠিন পরিশ্রম, বুকের অপগঠন, অতিরিক্ত মদ্যপানাদি দোষ, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় পরিচালনা, পুনঃ পুনঃ

গর্ভধারণ, কুঁজো হয়ে বসা বা শোয়ার কদভ্যাস, এ সবই শরীরের করে অপকার এবং যক্ষ্মাজীবাণুর পক্ষে এনে দেয় সুযোগ ও সুবিধা। দেহে সংক্রমণ ঘটে থাকলে গুরুতর কোন ভয়, গভীর কোন শোক বা দুঃখ অথবা অন্য কোন কঠিন রকমের স্নায়বিক বিপর্যয়ের পরিণতি স্বরূপও এই ব্যাধি করতে পারে একটি মানুষের ভিতরে সহসা আত্মপ্রকাশ।

এক এক রকমের প্রাকৃতিক আবহাওয়ার উপরেও যক্ষ্মাব্যাধির প্রসার অনেক সময় নির্ভর করে ব'লে কেউ কেউ বলেছেন। অতিরিক্ত স্যাঁত্‌সেঁতে ভাব—তার ভিতরে আবার মিশে থাকে প্রচণ্ড গরম—এরকম স্থানের অধিবাসীদের জীবনীশক্তি সাধারণতঃ দুর্বল হওয়া আশ্চর্য নয়। জীবনীশক্তি যেখানে ক্ষীণ, যক্ষ্মার প্রতাপ সেখানে প্রবলতর। জীবিকা নির্বাহের জন্যে মানুষকে অনেক সময় এমন সব কাজ বেছে নিতে হয় যা নাকি তার স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রচুর ক্ষতিকর। এবং সঙ্গে সঙ্গে আছে সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং উপযুক্ত বিশ্রামের অভাব। এগুলি ক্ষয় ব্যাধির পথ করে পরিস্কার। প্লুরিসি, হাম, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া প্রভৃতি ধরণের ব্যাধির আক্রমণের পরে আস্তে আস্তে আরোগ্য লাভ করবার সময়ে কিছুদিন যদি শরীরের বিশেষ যত্ন না নেওয়া যায় এবং যথেষ্ট সতর্ক ভাবে না থাকা যায় তবে অনেক সময় টিউবারকিউলোসিসের মাথা তুলে দাঁড়ান বিচিত্র নয়। কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, অজীর্ণ, আমাশয় ইত্যাদি ধরণের দীর্ঘকালস্থায়ী অসুখে ভুগে ভুগে জীবনীশক্তি দুর্বল হয়ে যাবার পরে যক্ষ্মাক্রান্ত হওয়া অসম্ভব নয়। দেশের গুরুতর অর্থনৈতিক অবনতি, সহস্র অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং দারিদ্র্যপূর্ণ সামাজিক আবহাওয়া, অতি-অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিকের ভিতর বাসস্থান—ইত্যাদির ভিতরে যক্ষ্মা চালিয়ে থাকে আপন আস্ফালন।

তাহলে দেখা গেল যক্ষ্মারোগের উৎপত্তির বিষয় বলতে গিয়ে দেহে জীবাণু প্রবেশের অবস্থা স্বীকার করে নিয়েও আরও কিছু বলবার থাকে।

রোগটা যখন 'টি. বি.'—

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, যক্ষ্মাজীবাণু যদিও প্রথম কারণ,—লোকের নিদারুণ দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, তাদের শোচনীয় স্বাস্থ্যহীনতা, অনাহার, পুষ্টিকর এবং বিশুদ্ধ খাদ্যের অভাব, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কুৎসিত ব্যাধির নিত্য তাড়না আলো-হাওয়া শূন্য এবং জনাকীর্ণ স্থানে বাস, ধূলি-ধোঁয়া দ্বারা দূষিত হাওয়া নিশ্বাসরূপে গ্রহণ, অতিরিক্ত মানসিক অশান্তি, অনিয়মিত স্নানাহার, অতিরিক্ত শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা, অল্প পরিসরে পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ, ভীতি, গভীর দুঃখ অথবা শোক, গুরুতর রকমের স্নায়বিক বিশৃঙ্খলা, কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা, অনুপযুক্ত জীবিকোপায়, নিত্যকার জীবনে আরও বিশেষ কতগুলি স্বাস্থ্যনীতি লঙ্ঘন, শরীরের অবনতিকারী প্রাকৃতিক আবহাওয়া, বিশেষ কতগুলি শারীরিক বিকৃতি—টিউবারকিউলোসিসের এত বেশি প্রসার লাভ করবার মূলে আনুষঙ্গিক কারণ রূপে এগুলিরও নির্দেশ করা হয়েছে।

একটি ধারণা এযাবৎকাল ধরে চলে আসছিল যে, যক্ষ্মা বংশানুক্রমিক ব্যাধি এবং যক্ষ্মাগ্রস্ত পিতামাতার সন্তান সন্ততিও যক্ষ্মাগ্রস্ত হবে। কিন্তু এটা ভুল ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। যক্ষ্মাগ্রস্ত পিতামাতার সাধারণ স্বাস্থ্য খারাপ থাকলে তারা যে সন্তান উৎপাদন করবে তারাও হয়ত সাধারণ ভাবে খারাপ স্বাস্থ্য সম্পন্ন হতে পারে—যদিও যক্ষ্মাগ্রস্ত পিতামাতার সম্পূর্ণ সুস্থ, সবল শিশু অনেকই দেখা গেছে। কিন্তু শিশুর সাধারণ স্বাস্থ্য খারাপ থাকবার মূলে বাপ মায়ের খারাপ স্বাস্থ্য অনেক সময়েই থাকলেও বাপ মায়ের সেই স্বাস্থ্যহীনতা যে কেবল যক্ষ্মা দ্বারাই ঘটে থাকবে তা নাও হতে পারে—হার্টের অসুখ, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, ম্যালেরিয়া—ইত্যাদি যে কোন ব্যাধি দ্বারাই ঘটতে পারে। শিশুর সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যদি পিতামাতা যথেষ্ট সতর্ক হয় এবং তার পরিপুষ্টির দিকে সব রকম নজর দেয়, তবে শিশু সুন্দর স্বাস্থ্যপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং পরিণত হবে সবল বালক বা বালিকায়।

ব্যাপারটা আসলে যা ঘটে তা হচ্ছে এই : পিতা বা মাতার ব্যাধি যদি সক্রিয় অবস্থায় থাকে এবং গয়ের সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন না ক'রে অজ্ঞতার জন্যেই হোক বা দারিদ্র্যের জন্যেই হোক যদি অত্যন্ত অসাবধানতা এবং অমনোযোগের সঙ্গে শিশুর লালন পালন তারা করতে থাকে তবে সেই শিশু অচিরাৎ হয়ে পড়ে আক্রান্ত। যক্ষ্মাক্রান্ত পিতার চেয়ে যক্ষ্মাক্রান্ত মাতার পক্ষেই শিশুকে সংক্রামিত করবার সুবিধা এই জন্যে সাধারণতঃ বেশি যে পিতার চেয়ে মাতাই শিশুর সঙ্গে মেলামেশা বেশি ক'রে থাকে। শিশুকে খাওয়ানর ভার এবং স্তন্যদানের ভার মায়েরই উপর—বোধ হয় বেশি আদরের ভারও। বেশির ভাগ সময়ে মাকেই শিশুকে বুকে নিয়ে শুতে হয়, তাকে ধোয়াতে মোছাতে হয়, তাকে জামা কাপড় পরাতে হয়। রান্নাঘরের সমস্ত ভারও মায়েরই উপর। কাজেই পিতার চেয়ে মাতাই অনেক ক্ষেত্রে অধিকতর বিপদের উৎস-রূপিনী। তবে যক্ষ্মাক্রান্ত পিতা বা মাতার সন্তান বাইরের কোন সূত্র থেকেও যে আক্রান্ত না হতে পারে তার কোন মানে নাই—যদি নাকি তার চলা ফেরা খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে উপযুক্তরূপ সাবধানতা অবলম্বন না করা হয়। এই সব ব্যাপারগুলিকে সাধারণতঃ উপেক্ষা করা হয়ে থাকে এবং ব্যাধিটিকে ভাবা হয় "hereditary" বলে।

যাই হোক, অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়েছে যে যক্ষ্মাক্রান্ত পিতা থেকে বংশানুক্রমিক ভাবে সন্তানের দেহে রোগ প্রবেশের সম্ভাবনা থাকবার সোজাসুজি কোন উপায় নাই; তবে যক্ষ্মাক্রান্ত মাতা থেকে কদাচিৎ সে সম্ভাবনা থাকে বটে। কিন্তু এটা প্রমাণিত হয়েছে যে মায়ের জরায়ুর অভ্যন্তরে থাকাকালীন যদি আদৌ কখনো শিশু আক্রান্ত হয়—তবে তা হয়ে থাকে কেবলমাত্র যখন "Placenta" যক্ষ্মা দ্বারা আক্রান্ত থাকে। "Placenta" হচ্ছে চ্যাপ্টা, গোলাকৃতি, স্পঞ্জের মত আধার জাতীয় যন্ত্র যার কাজ হচ্ছে ভ্রূণের পরিপুষ্টি সাধন এবং যা প্রসবের পরে দেহ থেকে

নির্গত হয়ে যায়। বাংলায় চলিত ভাষায় একে বলা হয়ে থাকে "ফুল"। "Placenta" থেকে যক্ষ্মাজীবাণু নাভিরজ্জুর ভিতর দিয়ে এসে ভ্রূণকে আক্রান্ত করতে পারে। কিন্তু "Placenta"র যক্ষ্মারোগের সম্ভাবনা এতই অল্প যে এ সম্বন্ধে আলোচনা বা গবেষণা কেবল বিশেষজ্ঞদের ভিতরেই নিবদ্ধ থাকবার মত। কল্পনায় যক্ষ্মারোগের বংশানুক্রমিকতাটা ভাবা অসম্ভব বা অসঙ্গত না হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এটা কদাচিৎই ঘটে থাকে এবং নিরাপদে এই কথাই মেনে নেওয়া যায় যে যক্ষ্মা বংশানুক্রমিক নয়। মায়ের গর্ভ থেকে এই ব্যাধি শিশু অর্জন কখনো করে না বল্লেই চলে; যখন করে—তা ভূমিষ্ঠ হবার পরে, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের মাঝখানে, যখন রুগ্ন পিতা বা মাতার অসতর্ক-প্রক্ষিপ্ত যক্ষ্মাজীবাণু ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের সুযোগে অতি সহজেই শিশুর শরীরে প্রবেশ করে। Tuberculosis যে "Hereditary" একথা এখন মিউজিয়ামেই তুলে রাখবার মত; ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এটা মানতে যাওয়া অন্যায় এবং অসুবিধাজনকই সকলের পক্ষে হবে।

প্রাচীন কালে যক্ষ্মাব্যাধির অস্তিত্ব থাকলেও তার ব্যাপকতা বর্তমান কালের মত অধিক ছিল না এবং বর্তমান কালের মত তা খুব সম্ভবতঃ এতবড় সমস্যার সৃষ্টি করেনি। যখন কোন জাতি গ্রামে বাস থেকে সহরে এবং শিল্পকেন্দ্রগুলিতে ক্রমে ক্রমে এসে বাস করবার অবস্থার ভিতর দিয়ে চলতে থাকে তখন তাদের ভিতর যে এই ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এটা সভ্য জগতের সমস্ত অংশেই পরিলক্ষিত হয়েছে। দেশ যখন কৃষিপ্রধানের অবস্থা থেকে শিল্প এবং বাণিজ্য প্রধানের অবস্থায় পরিবর্তিত হতে থাকে, যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর হারও তখন বেড়ে ওঠে। ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় দেড়শো বছর আগে এ ঘটনা ঘটেছে, এবং বর্তমানে ভারতবর্ষে এটা হয়েছে সুরু। বর্তমান যুগে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাতায়াতের হয়ে গিয়েছে প্রচুর সুবিধা—বহু রকমের যান-বাহনের ভিতর দিয়ে। পূর্বকালে এ

—রোগটা যখন 'টি. বি.'

অসুখটা অনেক সময়েই থাকত স্থান বিশেষে সীমাবদ্ধ; কিন্তু আধুনিক সময়ে সহস্র সহস্র লোক অবিরত গ্রাম থেকে আসছে সহরে, সহর থেকে যাচ্ছে গ্রামে। অনেক যক্ষ্মা-মুক্ত পল্লী-স্থান থেকে সহস্র সহস্র লোক প্রতিরোধশক্তিহীন দেহ নিয়ে শিল্প-বাণিজ্য-কেন্দ্র মহানগরীগুলিতে এসে পড়ছে এই ব্যাধির কবলে এবং পুনরায় তারা স্বস্থানে গতায়াত ক'রে সে সব স্থানে ছড়িয়ে দিচ্ছে এই ব্যাধির বিষ। অধুনাতন সময়ে সহরে, গ্রামে, দিকে দিকে সর্বত্র যক্ষ্মাব্যাধির প্রলয় তাণ্ডব স্বরু হবার মূলে যে কারণ-তত্ত্ব রয়েছে তার আলোচনায় বর্তমানে এ প্রসঙ্গ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

—২—

টিউবারকুলোসিস্ ব্যাধিটির কারণ জানবার পরেই আমাদের জানবার দরকার হয়—এই ব্যাধি দ্বারা যে দেহ আক্রান্ত হয়েছে কি কি লক্ষণ তা সূচিত করে এবং কি কি পথে এই অসুখের গতি। কখনো কখনো এই ব্যাধির আবির্ভাব এত ধীর এবং নিঃশব্দ যে প্রথম অবস্থায় অনেক সময় একজন লোকের পক্ষে উপলব্ধি করাই কঠিন হয়ে পড়ে যে, সে এমন নিষ্ঠুর, এমন কুটিল, এমন হিংস্র একটি ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এমন কি এমনও ঘটে থাকে—হয়ত খুব বেশি ক্ষত নিয়েও একজন লোক বছরের পর বছর কাটিয়ে যেতে পারে—সে যে প্রকৃতপক্ষে পীড়িত এটা উপলব্ধি না ক'রে, অথবা ছোটখাট লক্ষণগুলিকে অগ্রাহ্য ক'রে।

তবে যথাযথ ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে এই ব্যাধি কখনো অতি দ্রুত গতিতেও অগ্রসর হয়ে থাকে, কখনো বা অতি ধীর গতিতে। কখনো কখনো কিছুদিন থেমে থাকে এবং আবার বাড়তে থাকে, কখনো বা একই অবস্থায় থেকে যায়, কখনো আবার কমের দিকেও যেতে থাকে। এ সবই নির্ভর করে কি শ্রেণীর এবং কি পরিমাণ যক্ষ্মাজীবাণু শরীরে প্রবেশ করেছে এবং আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা, বয়স, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি কি রকম—এ সবের উপর।

রোগীর "পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা"টা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেমন নাকি এই অসুখ কমাতে প্রকৃতিকে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঠিক তেমনি আগুনে আরও বেশি করে ইন্ধন জোগায়। মানুষের জীবনের মতনই এটা পরিবর্তনশীল। পর্যাপ্ত এবং নিয়মিত আহার, নিয়মিত নিদ্রা এবং বিশ্রাম, অল্প পরিশ্রমের

অল্পক্ষণ ব্যাপী হালকা কাজ—যা নাকি বেশি মানসিক শ্রম বা দুশ্চিন্তার কারণ স্বরূপ না হয়—এগুলো অনেক সময়ে রোগীর বিশেষ কোন ক্ষতি করে নাই এরকম দেখা গেছে এবং কোন রকম নিয়মিত চিকিৎসা ছাড়াই অসুখ নিয়েই তারা অনেক দিন কাটিয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে, এসব রোগীর অনেকগুলি আপনা থেকেই ভালও হয়ে যায় এবং অন্য কোন অসুখে তাদের মৃত্যুর পরে তাদের বুকের সেরে যাওয়া ক্ষত চিহ্ন থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু কঠিন শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম, গুরুতর কোন শোক বা ক্ষতি, অপর কোন বিরুদ্ধ অবস্থার সম্মুখীন হওয়া বা বিশেষ কোন দুর্ঘটনা দ্বারা যক্ষ্মারোগীর চাপা ব্যাধি আগুনের মতনই দপ করে জ্বলে উঠতে পারে এবং রোগের গতি বন্ধ করবার জন্যে বিশেষ কোন চিকিৎসা সুরু করবার অবিলম্বে প্রয়োজন হতে পারে।

রোগীর বয়স, জাতি এবং অন্যান্য অবস্থার ভিতরেও প্রচুর রকমারি আছে। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন যে শিশু, যৌবন-প্রাপ্তা বালিকা, প্রসূতি মাতা, আদিম জাতি, অথবা ক্ষুধা-পীড়িত—এদেরই অন্য সব শ্রেণীর চেয়ে এই রোগপ্রবণতা বেশি থেকে থাকে। আদিম জাতির উল্লেখ করতে গিয়ে অনেক পণ্ডিত এই কথা বলছেন যে সর্বপ্রথম যক্ষ্মাজীবাণুর সম্মুখীন হবার অবস্থায় মানুষের যে কোন জাতিই একে অপরটির মতন উক্তজীবাণু দ্বারা অভিভূত হবার অবস্থায় থাকে। মানুষের ভিতরে যারা "সভ্যতা"র আলোক প্রাপ্ত হয়েছে তাদের দেহ যে এই রোগ থেকে কিছুটা নিরাপদ থাকবার খানিকটা শক্তি অর্জন করেছে বা তাদের দেহে যে এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিছুটা জন্মেছে তার কারণ হচ্ছে এই যে, অনেক বছর ধরে পুরুষানুক্রমে তারা যক্ষ্মাজীবাণুর সম্মুখীন হয়ে এসেছে। প্রথম সংক্রমণের অবস্থাই এক পক্ষে তাদের আংশিক ভাবে নিরাপদ করেছে। কিন্তু পৃথিবীর আদিম অধিবাসী বা যারা আমাদের মতে "অসভ্য"—তাদের দেহ কতকটা

একেবারে নতুন মাটির মত, তাদের শরীরে যক্ষ্মাজীবাণু গিয়ে বাসা বাঁধলে তারা তাদের দ্বারা সহজে অভিভূত হয়ে পড়ে। "সভ্য" মানুষের শরীরে রোগ উৎপন্ন হলেও চট্‌ ক'রে মারাত্মক হয়ে ওঠে না, সারবারও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু "অসভ্য" জাতীয় মনুষ্য একবার আক্রান্ত হলে অতি অল্প সময়ের ভিতর এই ব্যাধি গুরুতর আকার ধারণ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে পণ্ডিতদের মতে রোগকে বাধা দেবার এবং রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করবার শক্তি যে সমাজে রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি, সেই সমাজের লোকেই অর্জন করে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের গানের দু একটি শব্দ একটু বদ্‌লে বলছি: "বক্ষের দরজায় যক্ষ্মার রথ যেই থামলো", প্রায়ই এমন হতে দেখা গেল যে, সামান্য পরিশ্রমের পরেই কেমন যেন বোধ হয় একটা হাঁফ ধরা বা দুর্বলতার ভাব—বুকটার ভিতর কেমন যেন ধড়ফড় করে। নিজেকে কেমন যেন নিস্তেজ লাগে। পড়াশোনা, কাজকর্মে মন লাগতে চায় না, একাগ্রতা বার বার নষ্ট হয়ে যায়, কেমন যেন "কিছু ভাল লাগেনা"। যখন-তখন সারা দেহে আসে একটা ক্লান্তি, একটা অবসাদের ভাব, কেমন একটা শূন্য ভাবনায় ইচ্ছে করে সময় কাটাতে। ভাল ক'রে খেতে ইচ্ছে হয় না, খিদে বোধ হয় না। মাঝে মাঝে পেটের গোলমাল লেগেই থাকে—পেটটা কিছুতেই চায়না ভাল থাকতে। সন্ধ্যা বেলার দিকে চোখ-মুখটা একটু জ্বালা করে, হাত-পায়ের তেলো গুলো একটু জ্বালা করে। রাত্তিরে ভাল ঘুম হতে চায়না, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠবার সময় নিজেকে ভারি অবসন্ন বোধ হয়। কখনো কখনো রাত্তিরে কপালটা অথবা গা-টা একটু ঘামে।

হঠাৎ একদিন একটু সর্দি করে বসে। এক দাগ ইনফ্লুয়েঞ্জা-মিক্‌শ্চার অথবা এক ফোঁটা অ্যাকোনাইট্‌ অথবা তুলসী পাতার রস দিয়ে এক পুরিয়া মকরধ্বজ খেয়ে সে সর্দির কোনই উপকার হতে চায়না। একটু হয়ত

সর্দিটা কমছে, কিন্তু সুরু হয়ে যায় খুশ্‌খুশে কাসি। কখনো কখনো কাসিটা খুশ্‌খুশে ভাবেই চলতে থাকে, কখনো কখনো বা ওঠে জোরে মাথা চাড়া দিয়ে। ফুটপাথের ওপারেই যে বিজ্ঞাপনওয়ালা কব্‌রেজ আপনার নজরে পড়ে, আপনি তাঁর কাছ থেকে আনেন একটা পাঁচন লিখিয়ে; অথবা আপনার যে মামা অথবা পিসেমশাই ডাক্তার—তাঁর ডিস্‌পেন্‌সারি থেকে বিনি পয়সায় নিয়ে আসেন একটা লালচে রঙের থ্রোট্‌পেন্ট্‌ এবং তুলি ক'রে মহা উৎসাহে লাগাতে সুরু করেন গলায়। কিন্তু সে কাসির উপশম আর কিছুতেই হয় না। কাসির সঙ্গে সঙ্গে গয়েরও উঠতে আরম্ভ করে দেয়। প্রথম প্রথম হয়ত গলা টানলে আসতে থাকে ফেনা-যুক্ত, পরিষ্কার, পাতলা থুতু। কিন্তু অসুখ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে থুতু দাঁড়ায় ঘন, হল্‌দে বা ধূসর বা সবুজ আভাযুক্ত গয়েরে, এবং পরিমাণেও বৃদ্ধি পায় খুব। একদিন আপনি কেসে থুতু ফেলেন, হঠাৎ খেয়াল করে দেখতে পান, তাতে পরিষ্কার রক্তের ছিটে অথবা সবটুকুই রক্ত। কখনো কখনো বা বেশ কয়েক ঝলকই উঠে এল।

বস্তুতঃ ঘন ঘন সর্দি লাগা, দীর্ঘকাল স্থায়ী কাসি, মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা—এ সব এই ব্যাধির প্রধান লক্ষণ গুলির অন্যতম। এ ছাড়া অন্য প্রধান লক্ষণ হচ্ছে—জ্বর। ম্যালেরিয়া জ্বরের মত সমস্ত দেহ কাঁপিয়ে কাঁথা-কম্বল মুড়ি দিয়ে সাধারণতঃ এ জ্বর আসে না, আমাদের পিতামহীদের ভাষায় "ঘুশ্‌ঘুশে" জ্বর ব'লে এর প্রকৃতি বর্ণন করতে পারি। সাধারণতঃ বিকেল বা সন্ধ্যার দিকেই জ্বরটা বোধ হয়—থার্মোমিটার লাগালে হয়ত নিরেনব্বই অথবা সাড়ে নিরেনব্বই অথবা একশ'-খানেক ওঠে। আবার তার চেয়ে অনেক সময় বেশিও যে না হয় তা নয়। কখনো কখনো বা সব সময়েই অল্প জ্বর গায়ে লেগেই থাকে। গাল দুটি হয় একটু অ-স্বাভাবিক ভাবে রক্তিম আভাযুক্ত। নাড়ির স্পন্দন দ্রুত হয়ে ওঠে।

রোগটা যখন 'টি. বি.'—

যক্ষ্মাগ্রস্তের পক্ষে এই নাড়ির বেগটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। ঘুশঘুশে জ্বর এই রোগের অত্যন্ত প্রধান লক্ষণ, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে নাড়ির বেগের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে।

এ ছাড়া আরো আছে—অনেক সময়ে গলার স্বর হয়ে যায় ভাঙা ভাঙা, ক্ষেত্র বিশেষে সম্পূর্ণ স্বরভঙ্গ হওয়াও আশ্চর্য নয়। বুকে মাঝে মাঝে বেদনা হতে পারে। বুকের এই বেদনার ঠিক কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। বুকে-পিঠে—বিশেষ ক'রে কাঁধের উপর দিয়ে কখনো একটা অস্বস্তিকর চাপ-চাপ বোধ হয়, কখনো বা নিশ্বাস একটু জোরে টানতে গেলেই কেমন পিন ফোটানর মত বা ছুরি চালানর মত বোধ হয়। তবে বেদনাটির তীক্ষ্নতা এবং তীব্রতা তখনই সাধারণতঃ বেশি থেকে থাকে যখন ব্যাধিটি "প্লুরিসি" যুক্ত হয়। নতুবা অধিকাংশ সময়ে বুকের তেমন কিছু ব্যথা থাকেনা।

কখনো কখনো দেখা গিয়েছে যে যক্ষ্মাটা প্রথমে আদৌ যক্ষ্মার মত দেখা না দিয়ে অন্য ভাবে দেখা দিয়েছে। একটি লোক হঠাৎ হয়ত ব্রঙ্কাইটিস্ বা নিউমোনিয়া বা টাইফয়েড্ বা প্লুরিসি গ্রস্ত হল। চিকিৎসক তাকে সেই অনুযায়ীই চিকিৎসা করতে থাকলেন মনে অন্য কোন সন্দেহের অবকাশ না রেখে। কিন্তু রোগের বিশেষ উপশম না হয়ে কিছুদিন বাদেই যক্ষ্মার লক্ষণ হয়ে উঠতে লাগল সুস্পষ্ট—একে একে। অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের পক্ষে এ অসুখকে ম্যালেরিয়া বা কালাজ্বরের সঙ্গেও খিচুড়ি করে ফেলা অনেক সময়ে সম্ভব।

শিশুদের দেহ যখন এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন তাদের ভিতরেও এই সব লক্ষণই প্রকাশ পায়। তারা উৎসাহহীন এবং অপটু হয়ে যায়। তাদের যে রকম বৃদ্ধি পাওয়া উচিত, সে রকম হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারে শুকিয়ে যায়। ক্ষুধার অত্যন্ত অভাব হয়। বুকের আকার হয় চ্যাপ্টা, গলায় এবং ঘাড়ে জাগে গ্রন্থি-স্ফীতি (enlarged glands.)।

ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় মল-দ্বারে স্ফোটকোৎপত্তি, ভগন্দর, স্ত্রীলোকের পক্ষে ঋতুর গোলযোগ বা সম্পূর্ণ ঋতুবন্ধ হওয়া—ইত্যাদি লক্ষণও প্রকাশ পেতে পারে।

টিউবারকুলোসিস্-এর আরেকটি প্রধান লক্ষণ—ক্রমান্বয়ে দেহের ওজনের হ্রাস। আপনার শরীর কিছুতেই ভাল থাকছেনা, গলাটা একটু খুশ খুশ করে, বিকেলের দিকে বেশ জ্বর-জ্বর লাগে। একদিন হয়ত শিয়ালদা ইস্‌টিসানে আপনার মাসিমাকে দার্জিলিঙ মেইলে তুলে দিতে গিয়ে শুধুই একটু মজা দেখবার জন্যে—just for a fun—মাল ওজন করবার স্কেলের উপর একটু উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে দেখলেন, অনেকদিন আগে একবার যে আপনি আপনার ওজন নিয়েছিলেন, তার চাইতে বেশ অনেকখানি কমে গেছেন। অল্প একটু চিন্তান্বিত হয়ে আবার পনের বিশ দিন অথবা মাস খানেক পরে আবার নিজের ওজনটা নিলেন; আরো কয়েক পাউণ্ড কম!

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের বহু লোকেরই দেহের ওজন অনেক কম—স্বাভাবিক ভাবে যতটা থাকা উচিত তার চাইতে। তবে কারুর কারুর গড়ন হালকা ধরণের এমনিই থেকে থাকে। ওজন কম থাকাটাই যক্ষ্মারোগের পরিচায়ক নয়। যে ওজনটা এক রকম ভাবেই চিরদিন রয়েছে, অকারণে যদি সহসা ক্রমান্বয়ে তার চাইতে কমতে সুরু হয়, তবেই সন্দেহের নজরে তাকে দেখতে হবে।

ওজনের কথায় প্রথমেই আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগে, যে, একজন লোকের দেহের স্বাভাবিক ওজন কত হওয়া উচিত। আমি একটি তালিকা দিলাম—(বাঙ্গালী বয়স্কের পক্ষে) কত বয়সের কত ফিট কত ইঞ্চি লম্বা লোকের কত স্টোন কত পাউণ্ড ওজন এবং (বাঙ্গালী বালক-বালিকার পক্ষে) কত বছর বয়সের বালকবালিকার কত স্টোন কত পাউণ্ড ওজন এবং কতটুকু দৈর্ঘ্য (গড়ে) হওয়া উচিত, এই তালিকা থেকে জানা যাবে।

বাঙ্গালীর দৈহিক মাপ ও ওজন

(কলিকাতা কর্পোরেশন—প্রচার বিভাগের সৌজন্যে)

বয়স	দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি)	ওজন (পাউণ্ড)	বয়স	দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি)	ওজন (পাউণ্ড)
৫ বৎসর	৪১.৬	৪১.১	১১ বৎসর	৫৩.৩	৭০.২
৬ "	৪৩.৮	৪৫.২	১২ "	৫৫.১	৭৬.৯
৭ "	৪৫.৭	৪৯.১	১৩ "	৫৭.২	৮৪.৮
৮ "	৪৭.৮	৫৩.৯	১৪ "	৫৯.৯	৯৪.৯
৯ "	৪৯.৭	৫৯.২	১৫ "	৬২.৩	১০৭.১
১০ "	৫১.৭	৬৫.৩			

বয়স	দৈর্ঘ্য	৪′-১০″	৪′-১১″	৫′-০″	৫′-১″	৫′-২″	৫′-৩″	৫′-৪″	৫′-৫″	৫′-৬″	৫′-৭″	৫′-৮″	৫′-৯″	৫′-১০″	৫′-১১″	৬′-০″
২০ বৎসর	ওজন	১০০	১০৩	১০৬	১০৮	১১১	১১৪	১১৭	১২০	১২৪	১২৮	১৩২	১৩৬	১৪০	১৪৪	১৪৮
২৫ "		১০৫	১০৭	১০৯	১১১	১১৩	১১৬	১১৯	১২২	১২৫	১২৯	১৩৫	১৩৭	১৪২	১৪৭	১৫২
৩০ "		১০৮	১১১	১১৩	১১৬	১১৯	১২২	১২৫	১২৮	১৩১	১৩৫	১৩৯	১৪৪	১৪৮	১৫৩	১৫৮
৩৫ "		১১১	১১৫	১১৬	১১৯	১২২	১২৫	১২৮	১৩১	১৩৪	১৩৮	১৪২	১৪৬	১৫০	১৫৫	১৬০
৪০ "		১১৫	১১৭	১২০	১২৩	১২৬	১২৯	১৩৩	১৩৭	১৪১	১৪৫	১৪৯	১৫৪	১৫৯	১৬৪	১৬৯
৪৫ "		১১৮	১২১	১২৪	১২৭	১৩০	১৩৩	১৩৭	১৪০	১৪৩	১৪৭	১৫১	১৫৫	১৬০	১৬৫	১৭১
৫০ "		১২০	১২২	১২৫	১২৭	১৩০	১৩৪	১৩৮	১৪১	১৪৫	১৫০	১৫৪	১৫৯	১৬৪	১৬৯	১৭৪

এই তালিকায় একটি বিষয় দ্রষ্টব্য যে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের ওজন ভিন্ন করে দেখান হয় নাই। তবে স্ত্রীলোকদের ওজন পুরুষদের চাইতে স্বভাবতঃ কিছু কম হ'য়ে থাকে।

যদিও ক্রমান্বয়ে দেহের ওজনের হ্রাস টি-বির অন্যতম প্রধান লক্ষণ, তবুও একথা যেন কখনই ভাবা না হয় যে মোটা মানুষের দেহে এই ব্যাধি থাকতে পারে না। ওজনে মোটে না কমেও এই ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া এবং গয়েরের সঙ্গে যক্ষ্মাজীবাণুকে উৎক্ষিপ্ত ক'রে চারিদিকে ছড়ান একজনের পক্ষে খুবই সম্ভব, এবং এরকম লোক থেকেও থাকে অনেক। ওজনে কমাটা সব ক্ষেত্রেই যে একেবারে দৃষ্ট হবে, তা নয়।

যক্ষ্মারোগে আরেকটি কৌতূহলোদ্দীপক লক্ষণের কথা কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেছেন। এটা হচ্ছে—একটি বিষয়ের প্রতি ঝোঁক থেকে সহসা আরেকটি বিষয়ের প্রতি ঝোঁক বা মেজাজের পরিবর্তন ("Changes in disposition")। রোগীর হয়ত ফুটবল খেলার দিকে বিশেষ আকর্ষণ ছিল, হঠাৎ সে সব ছেড়ে দিয়ে সে বসল একেবারে বইএর পোকা হ'য়ে। একটি মেয়ে—সহসা হয়ত অতিরিক্ত রকম উচ্ছ্বাস-প্রবণ হ'য়ে উঠল। একটি পরিচারিকা—সামান্য সামান্য গৃহ কাজ নিয়ে বিশ্রী রকম খিট্‌ খিটে হ'য়ে উঠল। কারুর বা ইন্দ্রিয়-ক্ষুধা বেশি রকম বেড়ে উঠল। জনৈক বিশেষজ্ঞ এই মন্তব্য করেছেন যে অতিরিক্ত কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থতার ফলেই এই অসুখের অনেক ক্ষেত্রে হয় আবির্ভাব, এটা সচরাচরই ভাবা হ'য়ে থাকে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই এটা লক্ষ্য করা হয়েছে যে, আসলে রোগী অতিরিক্ত কামুক হ'য়ে উঠবার আগেই যক্ষ্মা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এসব ক্ষেত্রে যক্ষ্মা-বিষের ক্রিয়াই তাকে মাত্রা ছাড়িয়ে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হবার পথে চালিত করেছে!

দেহ যক্ষ্মাক্রান্ত হ'লে প্রথমেই যে সব কটি লক্ষণ একসঙ্গে আবির্ভূত হবে

রোগটা যখন 'টি. বি.'—

তার কোন মানে নাই এবং সব কটি লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করবার চেষ্টা না করা কিছুমাত্র নিরাপদ এবং বাঞ্ছনীয় নয়। প্রত্যেকের এটা বিশেষভাবে সমঝে রাখা উচিত যে, বুকের ক্ষত অধিক দূর অগ্রসর হলে এ রোগ থেকে সারবার সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত হয়ে পড়া আশ্চর্য নয়। এতগুলির ভিতর যে কোন একটি লক্ষণও যদি আপনার দেহে বিশেষভাবে প্রকাশ পায়, অবিলম্বে আপনাকে নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে হবে। কোথাও কিছু নাই, খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, বেশ স্ফূর্তি করে বেড়াচ্ছেন, হঠাৎ একদিন খক করে একটা কাসি মতন হল—মাটিতে ফেললেন, খানিকটা রক্ত! আপনার মাসিমা বললেন—ও কিছু নয়, দাঁত থেকে বেরিয়েছে; তাঁরও একদিন ওই রকম বেরিয়েছিল। আপনার পিসিমা বললেন—কিচ্ছু নয়, কিচ্ছু নয়, গলাটা একটু চিরে বেরিয়েছে; ওই রকমটি তাঁরও একদিন হয়েছিল।

আপনার মাসিমা বা পিসিমা বা মেসোমশাই বা পিসেমশাই আপনাকে পিঠ চাপড়ে অনেক কিছু অভয় দিতে পারেন, এবং আপনিও খুশি মনে আপনার কাজে লেগে যেতে পারেন, কিন্তু এইখানেই হল আপনার মারাত্মক ভুল এবং অসুখকে করে দিলেন প্রচুর সুবিধা।

ব্যাধির সামান্য চিহ্নও প্রকাশ পাওয়া মাত্র উচিত হচ্ছে উপযুক্ত চিকিৎসকের কাছে গিয়ে বুকটিকে ভাল করে দেখিয়ে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করা। রক্ত হয়ত আপনার একটুও না উঠতে পারে; শুধুই হয়ত একটা দীর্ঘদিনকার কাসির উৎপাতে কষ্ট পেতে হয় আপনার। অথবা আর কিছুই নাই, খালি বিকেলের দিকে কেমন একটু জ্বর-জ্বর লাগে; আর সেই জ্বরটুকুর তুলনায় নাড়ির বেগটা যেন অত্যন্ত বেশি। এ সবের যে উপদ্রবই আসুক না কেন আপনাকে সাবধান হতে হবে। আদৌ কোন লক্ষণ প্রকাশ না পেতেই যদি আপনার পক্ষে সাবধান হওয়া সম্ভব হত, তবে বোধ হয়

আরও ভাল হত! বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এক সঙ্গে একাধিক লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে: জ্বর, কাসি, রক্তহীনতা, আর বুকে একটু বেদনা। অথবা জ্বর, ওজনে কমে যাওয়া, রাত্তিরে ঘামা। অথবা জ্বর, থুতুর সঙ্গে মাঝে মাঝে রক্তের ছিটে, পেটের গোলমাল, অল্পেতে হাঁপ ধরা…ইত্যাদি। মনে রাখবেন, শরীরের এসব অবস্থান্তর ঘটবার পরে নিজের সম্বন্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে যত করবেন আপনি বিলম্ব, আপনার অলক্ষ্যে, অদৃশ্যভাবে—ততই ঘনিয়ে আসতে থাকবে আপনার কাল। শেষে আপনার অনুতাপের পরিসীমা থাকবে না—যখন আপনার চিকিৎসক আপনাকে নিষ্করুণ ভাবে শুনিয়ে দেবেন যে, এখন তাঁর প্রায় সাধ্যের অতীত হয়ে গিয়েছে এবং আগে এলে আপনাকে সুস্থ করে তোলা তাঁর পক্ষে কিছু অসম্ভব ছিল না।

যাই হোক, এসব উপদ্রবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে বুদ্ধিমান রোগী নিজের সম্বন্ধে চট করে হুঁশিয়ার হয়ে উঠতে পারেনও, অনেক সময় তাঁর একটি সমস্যা এসে উপস্থিত হয়—ডাক্তার নিয়ে। কোন্ ডাক্তারের পরামর্শ নিলে ভাল হবে, কোন্ ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে থাকা নিরাপদ—এটা অধিকাংশ সময়ে বহুজনের পক্ষেই হয়ে পড়ে চিন্তার বিষয়। সত্যি কথা বলতে গেলে, কোন রকম বাছ-বিচার না ক'রে যে কোন ডাক্তারের কাছে গিয়ে উপস্থিত হবার কোন মানেই হবে না। যাঁরা এই ব্যাধি নিয়ে বিশেষভাবে নাড়া চাড়া না করছেন, তাঁদের কাছে গিয়ে এই ব্যাধিগ্রস্তের পক্ষে কোন ব্যবস্থা নিতে চেষ্টা করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ঠিক সেই ডাক্তারকেই খুঁজে বের করতে হবে—"যিনি *টিউবারকুলোসিস্* সম্বন্ধে বোঝেন।" "যিনি *টিউবারকিউলোসিস্* সম্বন্ধে বোঝেন"—এই কথাটাকে হালকা ভাবে নেবার জিনিষ নয়। অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে পড়ে যে কত সংখ্যাতীত *টি.* বি. রোগীর অক্লেশে বৈকুণ্ঠ

লাভ হয়ে গেছে তা বলা যায় না। রোগ নির্ণয়ের ব্যাপারে এই সব চিকিৎসকেরা হয়ত একটি রোগীর সম্বন্ধে "নার্ভাস্ ডেবিলিটি" বা "হাইপোকণ্ড্রিয়া" থেকে সুরু ক'রে ম্যালেরিয়া বা যকৃতের বিকার অবধি সবই বলেন—কেবল "টিউবারকুলোসিস্" বাদে। একজন ডাক্তার একটি অতি খারাপ টাইফয়েড্ অথবা নিউমোনিয়ার রোগীকে চক্ষের নিমেষে সুস্থ করে দিয়েছেন, কিম্বা একজন সার্জেন দারুণ রকমের একটি "অ্যাপেন্ডি-সাইটিস্" অথবা "গল্-স্টোনে"র উপর অস্ত্রোপচার করবার ব্যাপারে অদ্ভুত কৌশল দেখিয়েছেন—এ সব দ্বারা এ' বোঝা যায় না যে তিনি একটি টিউবারকিউলোসিস্ রোগীকেও কৃতকার্যতার সঙ্গে চিকিৎসা করবার ক্ষমতা রাখেন। হয়ত প্রকাণ্ড একজন M.D. (সঙ্গে হয়ত আরও কতগুলো অক্ষরও আছে)—যাঁর নাকি বাজারে ভীষণ নাম এবং উপার্জন ততোধিক ভীষণ—শোচনীয়ভাবে টিউবারকুলোসিস্ সম্বন্ধে অজ্ঞ হতে পারেন এবং কোন টি. বি. রোগী গুরুতর রকম ভুল করবে যদি নাকি ঐ ডাক্তারটি সম্বন্ধে নানান্ বড় বড় গল্প শুনে যায় তাঁর কাছে নিজের ব্যবস্থা নিতে বা নিজের চিকিৎসার জন্যে। যেতে হবে শুধু তাঁরই কাছে—"যিনি টিউবারকুলোসিস্ সম্বন্ধে বোঝেন"—আর কারো কাছে নয়। এবং একথাও বলে রাখতে পারি যে এই ব্যাধি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সংখ্যা খুব অধিক নয় আমাদের দেশে এবং নিরর্থক বাজে ডাক্তারের কাছে গিয়ে অর্থে, দেহে, মনে সর্ব্বস্বান্ত হবার আগে সেই সব বিশেষজ্ঞদের সন্ধান নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হবার চেষ্টা সর্বতোভাবে করতে হবে। কতজনে যে কত ডাক্তারের নাম করবেন তার অন্ত নাই, কতজনে যে কত ডাক্তারের পরামর্শ নিতে বলবেন তারও অন্ত নাই। কিন্তু রোগীর এবং রোগীর আত্মীয় স্বজনের মস্তিষ্ক রাখতে হবে স্থির। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বেছে নিতে হবে নিজেদের পথ—এই ব্যাধির সর্বপ্রকার গুরুত্ব এবং দায়িত্ব আগে থাকতে উত্তমরূপে উপলব্ধি করে।

—রোগটা যখন 'টি. বি.'

এমন অনেক চিকিৎসকের সংস্পর্শে রোগী হয়ত আসতে পারেন, যে চিকিৎসক রোগীকে তাঁর থুতুটা পরীক্ষা করিয়ে আনবার জন্যে বলবেন। থুতুটা পরীক্ষিত হয়ে আসবার পরে রিপোর্টে হয়ত দেখা গেল যে থুতুতে Tubercle Bacilli অর্থাৎ যক্ষ্মা জীবাণু পাওয়া যায় নাই। অমনি হয়ত ডাক্তার বলে বসবেন—স্পিউটাম্ যখন নেগেটিভ্ তখন তিনি নিশ্চয় করে কিছুতেই বলতে পারেন না যে, এই ব্যাধি হয়েছে। অন্যান্য সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পেলেও তাঁরা এই একটি মাত্র অজুহাত দেখিয়ে এই ব্যাধিকে অস্বীকার করতে প্রয়াস পান। কিন্তু উপযুক্ত বিশেষজ্ঞগণ এই মত প্রকাশ করছেন, যে সব চিকিৎসক নাকি সঠিক ভাবে রোগ নির্ণয় করবার আগে কেবলই থুতুতে যক্ষ্মাজীবাণুর আবির্ভাবের অপেক্ষা রাখেন, তিনি ধরে রাখতে পারেন যে, তাহলে খুব কম যক্ষ্মারোগীরই সারবার সম্ভাবনা আছে। বস্তুতঃ অনেক সময়ে রোগের প্রথম অবস্থায়, অনেক সময়ে বা রোগ যথেষ্ট অগ্রসর হয়ে গেলেও থুতুতে যক্ষ্মাজীবাণু আবির্ভূত হয় না, অবশ্য যদিও অধিকাংশ সময়েই সাধারণতঃ হয়ে থাকে। কিন্তু থুতুতে যক্ষ্মা জীবাণু না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকাটা মারাত্মক ভুল ছাড়া আর কিছু নয়। বিশেষ করে এটাও দেখতে হবে যে আধুনিক নানাবিধ উন্নত উপায়ে (concentration method, inoculation method ইত্যাদি) পুনঃ পুনঃ থুতুটা পরীক্ষা করা হয়েছে কিনা এবং জীবাণু-সংক্রমণ দেহে ঘটেছে কিনা সুসম্বদ্ধ ভাবে তার অন্যান্য পরীক্ষাও সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে কিনা। যাদের থুতুতে জীবাণু পাওয়া যায় এবং যাদের পাওয়া যায় না—বিশেষজ্ঞেরা open cases এবং closed cases—এই দুই ভাগে তাদের দু দলকে ভাগ করেছেন।

রোগীর শেষ অবস্থা বড় ভয়াবহ। শেষ অবস্থায় রোগী এতদূর দুর্বল হয়ে পড়ে যে তখন তার উত্থান শক্তি একেবারেই তিরোহিত হয়ে যায়।

চেহারা হয়ে যায় একেবারে কঙ্কালসার। দেহে শয্যাক্ষতাদির অনেক সময় হয় উৎপত্তি। পা গুলি যায় ফুলে। ভীষণ ঘর্ম হয় সুরু, শরীরের উত্তাপেরও সুরু হয় অদ্ভুত সব পরিবর্তন। শ্বাস কষ্ট বিশেষ বৃদ্ধি পায়। কখনো কখনো বা হঠাৎ খুব রক্তবমি হতে থাকে। এবং নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কোনক্রমেই তাকে আর রক্ষা করা সম্ভব হয় না।

যক্ষ্মা রোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কোন সন্দেহের কারণ দেখলেই কেবলমাত্র "স্টেথোস্কোপে"র পরীক্ষার উপর নির্ভর না করে বুকের একখানা "এক্স-রে" ফটো নেবার জন্যে রোগীকে নিশ্চয়ই বলবেন। বুকের অবস্থা যথাযথভাবে নির্ণয় করবার জন্যে "এক্স্-রে" আজকাল অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু স্টেথোস্কোপের পরীক্ষায় বুকের সব দোষ, অথবা রোগ সারবার সময়ে ক্রমোন্নতির বিভিন্ন অবস্থাগুলি নির্ভরযোগ্য ভাবে কিছুই ধরা পড়ে না; এক্স-রে দ্বারা সেগুলি পরিস্কার ভাবে বোঝা যায়। সুতরাং রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশের জন্যে যোগ্য চিকিৎসকের পক্ষে রোগীর X-ray ফটোর অতীব প্রয়োজন। বাস্তবিক, এমনও দেখা গিয়েছে যে বাইরে কোন রকম লক্ষণ বা শারীরিক বিকৃতি প্রকাশ পাবার দু তিন বছর আগে X-ray দ্বারা বুকে টি. বি.র ক্ষত পরিস্কার ভাবে ধরা গেছে। কাজেই বিচক্ষণ "roentgenologist" দ্বারা বুকের এক্স্-রে ফটো তুলতে রোগীর কিছু মাত্র অন্যথা করা উচিত নয়। রোগীর রক্ত পরীক্ষা করারও বিশেষ প্রয়োজন। অধুনা বিশেষ নিয়মে রক্ত পরীক্ষা দ্বারা রোগের গতি এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে নানান নতুন জিনিষ জানা গেছে।

উপযুক্ত অর্থব্যয় করে বাড়ীতে ডাক্তার দেখান এবং বাইরে এক্স-রে, রক্ত পরীক্ষা, থুতু পরীক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা রোগীর পক্ষে যদি সম্ভব না হয় তবে কোন যক্ষ্মা-ডিস্পেন্সারিতে যাওয়াই রোগীর পক্ষে উচিত।

—রোগটা যখন 'টি. বি.'

এখানে আরেকটি কথা আমি বলতে চাই। অনেক ডাক্তার এবং অনেক রোগীর আত্মীয় স্বজনের ধারণা যে, এই রোগীর কাছে তার অসুস্থতার বিষয় গোপন রাখা উচিত। কিন্তু এর চেয়ে অন্যায় এবং নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই হতে পারে না—এই রোগের বহুদূরব্যাপী ফলাফলের বিষয় বিবেচনা ক'রে। হতে পারে এই অসুখের বিভিন্ন দিকের সমস্ত তথ্য বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বলা সব রকম রোগীর কাছে সঙ্গত নয়, বিশেষ করে কোন ভীতু রোগীর পক্ষে যখন অযথা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু তাই বলে এই রোগ নিয়ে সর্বপ্রকার চাপাচাপি অতিরিক্ত মাত্রায় অসঙ্গত। রোগীকে পরিস্কার করে বুঝিয়ে বলে দিতে হবে তার কি ব্যাধি হয়েছে, এই ব্যাধি থেকে সারতে হলে তাকে কি কি নিয়ম পালন করে চলতেই হবে, নিজের দোষে সে নিজের কি গুরুতর ক্ষতি করতে পারে, এবং থুতুতে যখন যক্ষ্মাজীবাণু রয়েছে—তার থেকে যাতে অপর কারুর এই ব্যাধি না হয় সে জন্যে সে নিজে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে বাধ্য। কোনরকম লুকোচুরি না ক'রে মোটের উপর তার ব্যাধির প্রকৃতি এবং তার সর্বপ্রকার দায়িত্ব তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কোন প্রকার রূঢ়তা যেন রোগীর প্রতি প্রকাশ না পায়। তাকে উৎসাহ দিতে হবে এবং এই কথা দৃঢ়ভাবে বলতে হবে যে সে যদি সততা এবং ধৈর্যের সঙ্গে তার চিকিৎসাবিষয়ক সমস্ত নিয়ম পালন ক'রে চলে তবে সে নিশ্চয় সুস্থ হয়ে উঠবে। নিজের অসুখের কথা জেনে প্রথমটা রোগী হয়ত একটা কঠিন আঘাত পাবে, কিন্তু বুদ্ধিমান এবং বিবেচক রোগী ধীরে ধীরে তা উঠতে পারবে সামলে। মনে রাখা উচিত, এ রোগে অনেকটা রোগী নিজেই নিজের চিকিৎসক এবং তার নিজের উপর নিজের ভালমন্দ বহুপরিমাণে নির্ভর করে। অবশ্য সর্ববিষয়ে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের মাঝখানে রোগীকে সর্বদাই নিরুপায় হয়ে

পড়তে হয়; এবং একথা নিশ্চয়ই অস্বীকার করবার উপায় নাই যে চিকিৎসা সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার জন্যে রোগীর নিজের মনের জোরের সঙ্গে অপর সবার পরিপূর্ণ সহযোগিতা যুক্ত হবারও নিতান্ত আবশ্যক।

আর, রোগীর নিজেরও কোন রকম লুকোচুরি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয় কোনমতেই। আত্ম-প্রবঞ্চনার প্রবৃত্তি তার ভিতরে তিলমাত্রও থাকা উচিত নয়। শরীর যখন সুস্পষ্টরূপে খারাপ হতে সুরু করেছে তখন "কিছু নয়" বলে নিজেরও উড়িয়ে দেওয়া নয় বা কোন অনুপযুক্ত চিকিৎসকেরও এড়িয়ে-যাওয়া ধরণের জবাবের প্রশ্রয় দেওয়া নয় বা থুতুর সঙ্গে রক্তের ছিট দেখা গেলে মাসিমা বা পিসিমার কথা অনুযায়ী তাকে দাঁতের অথবা গলার বলে পাশ কাটাবার চেষ্টা করা নয়—দাঁড়াতে হবে নিষ্ঠুর সত্যের একেবারে মুখোমুখি, সাহসে বুক বেঁধে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক নানা উপায়ে উত্তমরূপে পরীক্ষা ক'রে যখন টি-বি বলে মত প্রকাশ করবেন তখন চিকিৎসকের প্রতি অতিমাত্রায় বিরূপ হয়ে উঠে তাঁর মুণ্ডপাত করা অথবা তাঁর বিদ্যা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য মনে মনে প্রকাশ করা নয়—দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হবে নিজেকে ব্যাধিগ্রস্ত বলে এবং অবলম্বন করতে হবে নিজেকে সুস্থ করে তুলবার যথাযথ উপায়। রোগী যেন এমন ধারণা কদাচ মনে পোষণ না করেন যে টি-বি রোগটা কেবল অপর লোকেদেরই হয় এবং তাঁর নিজের দেহ এই ব্যাধিগ্রস্ত হবে এমন হতেই পারে না কিছুতেই।

এবারে এই ব্যাধির চিকিৎসার বিষয় কিছু বলব। এই ব্যাধির চিকিৎসার সর্বপ্রধান অঙ্গ হচ্ছে—সম্পূর্ণ বিশ্রাম। যক্ষ্মাবিদ্ চিকিৎসক বলছেন যে যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় অসুস্থ অঙ্গের পরিপূর্ণ বিশ্রামকে দিতে হবে সকলের উপরে স্থান। এই "বিশ্রাম" কথাটির অর্থ যে কতখানি কড়া ভাবে গ্রহণ করতে হবে, তা বিশেষভাবে বুঝিয়ে না বললে হয়ত অনেকে

কল্পনাই করতে পারবেন না। সর্বসাধারণের কথা ছেড়ে দিই—ডাক্তারদের ভিতরেও খুব কম লোকেই জানেন যে, একজন টি-বি রোগীর পক্ষে এর গুরুত্ব কতখানি হওয়া উচিত। রোগীর কাছে এ শব্দটির প্রকৃত অর্থ তিনিই বলতে পারেন, যিনি নাকি টিউবারকিউলোসিস্ সম্বন্ধে বোঝেন—"Who understands Tuberculosis." প্রকৃতপক্ষে একজন টি-বি রোগীর অধিকাংশ উপসর্গের প্রাবল্য কমিয়ে আনবার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে—সম্পূর্ণ বিশ্রাম—দেহের ও মনের। সূর্যোদয় থেকে স্বরু করে সূর্যাস্ত অবধি—সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত্রিই রোগীকে বিছানায় শুয়ে কাটাতে হবে। যদি প্রত্যেকটি উপসর্গ প্রবল হয় এবং ফুস্‌ফুসে ব্যাধির বিস্তৃতি যদি বেশি হয়, তবে বিছানার উপর উঠে বসা পর্যন্ত নিষেধ। বিছানায় সম্পূর্ণ বিশ্রামকে ইংরাজীতে বলা হয়েছে "Absolute rest in bed." একজন রোগীকে যতদিন পর্যন্ত "absolute rest" নিতে হবে, ততদিন তার খাবার জন্যে উঠে বসা, উঠে বসে হাত মুখ ধোয়া, নিজের শরীর নিজে স্পঞ্জ করা বা স্নান করতে বাথরুমে যাওয়া, উঠে মলত্যাগ করতে যাওয়া, লেখা, পড়া, বেশি কথা বলা (স্বরভঙ্গের অবস্থা থাকলে কথা বলা একেবারেই বারণ), নিজের বিছানা নিজে পাণ্টান, দাঁড়িয়ে থাকা, কোন রকম ক্রীড়া—ইত্যাদি ইত্যাদি একেবারে নিষিদ্ধ। তবে উপসর্গগুলি যদি প্রবল না থাকে এবং ফুস্‌ফুস্ যদি বেশিরকম ব্যাধিগ্রস্ত না হয়, তবে চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী (বারম্বার অনুযোগ এবং অনুরোধ ক'রে তাঁর অনিচ্ছাকৃত সম্মতি আদায় করে নয়)—দু-পাঁচ মিনিটের জন্যে উঠে বসে খাওয়া, অথবা এক এক সময়ে বিশ মিনিট তিরিশ মিনিটের জন্যে হালকা কোন বই বা খবরের কাগজখানা পড়া, বা দু-চার পা হেঁটে মলমূত্রাদি ত্যাগ করতে যাওয়া, বিছানায় ব'সে চুলটা একটু আঁচড়ে মুখখানাকে একটু মিষ্টি করা…ইত্যাদি অতি হালকা এবং অতি সংক্ষিপ্ত দু-চারটি কাজ দিনের ভিতরে অতি সামান্য বারের জন্যে করা

যেতে পারে। (রোগীর এই অবস্থায় লেখা বা পড়া সম্বন্ধে কোন স্যানাটোরিয়ামের কর্তৃপক্ষ যে নিয়মের নির্দেশ দিয়েছেন এখানে তার উল্লেখ করছি: রোগী কিছুক্ষণ ধরে পড়লেন বা লিখলেন (১৫ মিনিট), তার পরেই ঠিক ততটুকু সময় একেবারে বিশ্রাম করে নিলেন; পুনরায় ঐ রকম কিছুটা সময় পড়লেন বা লিখলেন, এবং পুনরায় তারপরেই ওরি সমান সময় একেবারে সব রেখে চুপচাপ পূর্ণ বিশ্রাম ক'রে নিলেন—এই ভাবে এটা চালাতে হবে।) বিশ্রাম যে কতকাল যাবৎ নিতে হবে তার কোনই বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই—রোগীর বুকের অবস্থার উপরেই সব কিছু করবে নির্ভর। খুব অল্পদিন নেবারও প্রয়োজন হতে পারে, আবার খুব দীর্ঘদিন নেবারও প্রয়োজন হতে পারে। বিশ্রামের অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে কেমন ক'রে শ্রমের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে এবং কে কতখানি শ্রমের উপযুক্ত হবে তার আলোচনা যথাস্থানে থাকবে।

এই বিশ্রাম কথাটার অর্থ ঠিকমতন বুঝতে না পেরে কত অসংখ্য রোগী যে নিজের সর্বনাশ করে তা বলবার নয়। আর, সব সময়েই যে রোগীরই দোষ তাও নয়। অনেক সময় দেখা যায় যে ডাক্তাররাও (যে সব ডাক্তার জানেনই না তাঁদের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, যাঁরা জানেন তাঁরাও) রোগীকে একথা একটু স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দেন না যে বিশ্রামের অবহেলা করলে রক্ত সঞ্চালনের সঙ্গে ব্যাধির বিষ কেমন করে দেহে বেশি করে ছড়িয়ে পড়বে এবং "সম্পূর্ণ বিশ্রাম" বস্তুটা ঠিক কি। একজন আমেরিকান যক্ষ্মাবিশেষজ্ঞ কোন পত্রিকায় তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধে তাঁর দুজন রোগীর যে কৌতুকাবহ বিবরণ দিয়েছেন, তা এখানে অনুবাদ করে দিচ্ছি:

"রোগীকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে, কাজ-কর্ম এখন সে করতে পারবে না, আর ছুটি নিয়ে বাড়ীতে থেকে তার বিশ্রাম নিতে হবে। সে ডাক্তারের উপদেশ মত কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে এসে তার বিবেচনায় বিশ্রাম পালন

করতে থাকল। খাওয়াটা অবিশ্যি বিছানাতেই সেরে সে তার সকালের শয্যা ছাড়ত বেলা এগারটার সময়ে, তারপরে বেরিয়ে পড়ত সহরের রাস্তায় খানিক ঘুরবার জন্যে। প্রথমে ঢুকল হয়ত এক নাপিতের দোকানে, সেখানে বসে ঘণ্টাখানেক আড্ডা মারল, আবার আরেক জায়গায় ঢুকে আরো খানিকটা সময় হয়ত কাটাল। তারপর বাড়ীতে ফিরে খাওয়া-দাওয়া করে আবার বিকেলে এক বন্ধুকে নিয়ে মোটরগাড়ী করে হাওয়া খেতে বেরুল অথবা এক প্রতিবেশীর সঙ্গে খানিক খোসগল্প করে এল—সারাটা সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

"আর একটি রোগী—খাওয়ার জন্যে উপরতলা থেকে নীচতলায় আসত দিনে তিনবার করে। দাড়ি কামাবার জন্যে এবং অন্যান্য নানান প্রয়োজনে বাথরুমে করত কয়েকবার যাতায়াত। তা ছাড়া একটা কিছু ভুলে ফেলে রেখে এল—সেটা আনবার জন্যে আরও বারকতক করত উপর-নীচেয় ওঠা-নামা। এসব জেনে একদিন আমি তাকে বললাম একটা Pedometer (অনেকটা ঘড়ির মত দেখতে একরকম যন্ত্র—পদক্ষেপের সংখ্যা যাতে ধরা পড়ে—যা থেকে একজন লোক কতটা পথ অতিক্রম করল তা মাপা যায়) —ব্যবহার করতে—দেখবার জন্যে যে সে দৈনিক কতটুকু করে হাঁটছে। এই পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে সে দৈনিক ঠিক দেড় মাইল ক'রে হাঁটছে!"

এই চিকিৎসক তাঁর একটি রোগিনীর কথা বলেছেন যে, সেই মেয়েটি সাহস এবং দৃঢ়তার সঙ্গে খানিকটা ত্যাগ স্বীকার এবং কৃচ্ছ সাধন করে পূরো দুটি বছর কড়া বিশ্রামে থেকে কেমন ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে স্বামী এবং সন্তানের সঙ্গে আবার মিলিত হয়েছে এবং সেই মেয়েটিরই আর দুটি বন্ধু, যারা নাকি তাদের ডাক্তারকে এই ভাবে বলত: "ডাক্তার বাবু, আমাকে একটি দিনের জন্যে কি চায়ের পার্টিতে যেতে দেবেন না?" অথবা, "শুধু একটি দিনের জন্যে একটু মোটরে চড়ে আসতে দেবেন না?" অথবা,

রোগটা যখন 'টি. বি.'—

"শুধু একটি বারের জন্যে এই ফিল্মটি দেখে আসতে দেবেন না ?…আমি ভারি সতর্ক থাকব এবং হৈ চৈ একটুও করব না। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনি কি মনে করেন না যে, এই রকম একটু আধটু পরিবর্তন দ্বারা আমার কোন ক্ষতি না হয়ে বরং উপকারই হবে ?"—সেই মেয়েটির সেই দুটি বন্ধু এই সব ছোট খাট আমোদের প্রলোভন ত্যাগ না করতে পেরে ভুল পথে শরীরের এমন ক্ষতি করেছে যে শেষ পর্যন্ত শোচনীয় ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

ডাক্তারটি তাঁর প্রবন্ধের শেষে আক্ষেপ করে বলছেন : (আমার অনুবাদ): "বিশ্রাম সম্বন্ধে কড়াকড়ি খানিকটা কমানর অবস্থাতে রোগীদের বেশ ভালই থাকতে দেখা গিয়েছে। ওজন বাড়ে, জ্বর কমে, অন্যান্য কষ্টদায়ক উপসর্গ-গুলিও কমে ; কিন্তু বুকের ক্ষত খুব অল্পই কমে এবং একটু একটু করে বিশ্রামের অবহেলার সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষত সহসা একদিন ভীষণ মূর্তি ধারণ করে রোগীদের সর্বনাশ ঘটায়। আমরা এসব ঘটনা জানি। অত্যন্ত সাময়িক একটু উন্নতির পরে কতজনের ব্যাধিই যে প্রবলভাবে বেড়ে পড়ে ! এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা ঘটে শুধু বিশ্রামের ত্রুটীর ফলেই।"

আর, রোগী যেন বিশ্রাম বলতে শুধু শরীরের বিশ্রামই না বোঝেন ; সঙ্গে সঙ্গে মনকেও দিতে হবে বিশ্রাম। এবং এই মনকে বিশ্রাম দেওয়াই হচ্ছে আরও ঢের শক্ত ব্যাপার। কিন্তু যে করেই হোক রোগীকে ক্রমাগত চেষ্টা করে মনের বিশ্রাম অভ্যাস করতেই হবে। শরীরের বিশ্রাম তখনই যথাযথরূপ হয় যখন নাকি মনও বিশ্রাম লাভ করছে। শরীরকে বিছানার উপরে জোর ক'রে কোন মতে লম্বা ক'রে রেখে নিজের ব্যাধি নিয়ে,সাংসারিক আরও দশটি বিষয় নিয়ে, নিজের জীবন নিয়ে, কোন কঠিন বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়ে—কেবলই যদি মনের ভিতর তোলাপাড়া করতে থাকে যায়, সহস্র দুশ্চিন্তার ঘোড়ায় চড়িয়ে মনকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াতে থাকা যায়

আর লাহোর—তাহলে স্মরণ রাখা আবশ্যক, রোগীর আরোগ্যের মূলে যথেষ্ট কুঠারাঘাত হবে। কোন ভাবনা নয়, কোন চিন্তা নয়, কোন উত্তেজনা নয়—শরীর এবং মনকে সম্পূর্ণরূপে ঢিল করে দিয়ে থাকতে হবে বিছানায় পড়ে। বিশ্রাম নিতে হবে—একজন ডাক্তারের ভাষায়—in very much the attitude in which you would expect to find a dead soldier lying on the battlefield—অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রের একজন মৃত সৈনিকের মত পড়ে থেকে। এই ডাক্তার বলছেন যে বিশ্রাম নেবার সময়ে নিজের সম্বন্ধে কোন ভাবেই সচেতন থাকতে পারবে না এবং নিজের শরীর মনকে এত "ছেড়ে দিয়ে" পড়ে থাকতে হবে যে কেউ যদি তোমার খাটের ফিতে কেটে দেয় তবে তোমার collapse on the floor will be complete—অর্থাৎ মেঝের উপরে সটাং চিৎপটাং।

অনেকেই ভুল করে মনে করেন যে, জ্বর ইত্যাদির অবস্থাতেও রোগীকে নদীর ধারে বা পার্কে-টার্কে একটু বেড়াতে দেওয়া, একটু তাস পাশা খেলতে দেওয়া বা একটু হাসি আমোদ প্রমোদ করতে দেওয়া বা কোন পার্টিতে যোগদান করতে দেওয়া ইত্যাদি চলতে পারে। কারণ তাতে রোগী বেশ প্রফুল্ল থাকে, এবং অসুখের কথা খানিকটা ভুলে থাকে, এবং তাতে তার সুস্থ হবার পক্ষে সুবিধাই হয়। হায়! অসুখকে রোগী ভুললেই যদি অসুখ রোগীকে ভুলতো! যাক, কথা আর না বাড়িয়ে এইটুকুই সোজা বলে দেওয়া যেতে পারে যে উক্ত সব কাজ পরিণামে রোগীর এবং তার লোকেদের আফশোষের এমন কারণ হবে যে তা বলা যায় না। অথবা নিজেদের অজ্ঞতার জন্যে তারা হয়ত কোন দিনই বুঝতে পারবে না যে ঐ সবই রোগীর সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করেছিল।

রোগীকে যখন চিকিৎসক সম্পূর্ণ বিশ্রামের অবস্থায় থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন তখন বাইরের লোক যাঁরা তাকে দেখতে আসবেন বা তার কাছে

বেড়াতে আসবেন তাঁদেরও কর্তব্য যখন তখন এসে তাকে বেশি না বকান বা অন্য কোন ভাবে উত্যক্ত না করা। রোগীর সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলবার দৈর্ঘ্যটাকেও এ সময় কমান ভাল।

বিশ্রাম ছাড়া এই ব্যাধির চিকিৎসার আর একটি প্রধান অঙ্গ—উত্তম খাদ্য। পুষ্টিকর এবং পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাব এই ব্যাধির অন্যতম প্রধান কারণ এবং বিভিন্ন রকমের পুষ্টিকর এবং উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা এই ব্যাধির চিকিৎসায় অপরিহার্য। এখন দেখা যাক ক্ষয়রোগগ্রস্তদের খাদ্য-বিধান সম্বন্ধে কি বলা যেতে পারে।

এই রোগীর পক্ষে সাধারণ ভাবে খাওয়ার দ্রব্য সম্বন্ধে খুব বেশি বাছ-বিচার কিছু করবার দরকার হয় না, অথবা বিশেষ কোন কারণ না ঘটলে ভয়ানক রকম খুটিয়ে খুঁটিয়ে জিনিষের দোষ গুণের হিসাব করে খেতে হয় না। সাধারণ সুস্থ মানুষ যা খায় একজন টি. বি. রোগী সাধারণ অবস্থায় সে সবই খেতে পারে। সাগু বার্লি খেয়ে থাকতে হবে সে রকমও কিছু নয়, অথবা কলা খাব তো মুলো খাবনা, মুলো খাব তো সজনে খাবনা—সে রকমও কিছু নয়।

টি. বি. রোগীর পক্ষে দুধটা মহা দরকারী জিনিষ—প্রতিবারের খাবারের সঙ্গে বেশ খানিকটা করে দুধ খাওয়ার দরকার। অবস্থায় কুলোলে এক একবারে একপোয়া, দেড় পোয়া করে একজন টি. বি. রোগী দৈনিক একসের দেড়সের দুধ খেতে চেষ্টা করতে পারেন। মাছ, মাংস, ডাল, সব রকম তরিতরকারিই রোগীর খেতে হবে। ডিম, মাখন খাওয়ার দরকার। খাওয়ার উপকরণের সঙ্গে নানা রকম ফলমূলও থাকবে। ভাত, রুটি, পরেটা, লুচি—সবই চলবে। আমাদের শরীরের বৃদ্ধি, পুষ্টি, তাপ, শক্তি ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্যে এবং নানাবিধ ব্যাধির হাত থেকে শরীরকে রক্ষার জন্যে সব রকম উপকরণে মিশ্রিত খাদ্যের প্রয়োজন। কোনটিরই অভাবও ভাল নয়, অতি

আধিক্যও ভাল নয়। অভাব এবং আধিক্য উভয়ের দ্বারাই দেহের ক্ষতি-বিধান হয়ে থাকে। ব্যক্তি-বিশেষের শারীরিক অবস্থা, প্রয়োজন, রুচি ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে খাদ্য তালিকা নির্ণয় করতে হয়। Protein বা আমিষপ্রধান খাদ্য, Fats বা চর্বি প্রধান খাদ্য, Carbohydrates বা শর্করাপ্রধান খাদ্য—সবই উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে। মাংস, ডিম, দুধ, মাছ, ডাল, সীম, কড়াই, ছানা—ইত্যাদি হচ্ছে Protein জাতীয় খাদ্য। দুধ, ঘি, মাখন, তেল, ওটমিল (যইএর ছাতু), সোয়া-বিন ইত্যাদি খাদ্য হচ্ছে স্নেহ বা চর্বি (Fats) জাতীয়। মাছ ও মাংসেও চর্বি আছে—ডিমেও। আর Carbohydrates সংগৃহীত হতে পারে এই সব খাদ্য থেকে: চাউল, আটা, দুধ, আলু, ফল, ডাল, তরিতরকারি, চিনি—ইত্যাদি। খাবার দ্রব্যের ভিতর "ভিটামিন" বলে একটি জিনিষ আছে যাকে A, B, C, D, E......এই রকম করে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এই ভিটামিনই হচ্ছে খাদ্য-প্রাণ। ভিটামিন-হীন খাদ্য দেহের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। নানাবিধ রোগের আক্রমণ থেকে এক এক রকমের ভিটামিন এক একভাবে দেহকে রক্ষা করে থাকে। এক এক রকম ভিটামিনের অভাবে দেহ হয়ে পড়ে এক একরকমের রোগ-প্রবণ। Vitamin A পাওয়া যায় ভেড়ার মাংস এবং যকৃৎ, কয়েকরকম মাছ, মাখন, ডিম, লিভারের তেল, দুধ, কয়েকরকম শাকসবজী, তরিতরকারি, বা ডাল, সর, টম্যাটো, কয়েকরকম ফল,—ইত্যাদির ভিতরে। Vitamin B পাওয়া যায় চাউল, গম, ভুট্টা, ডিমের হলদে অংশ, চিঁড়া, সুরাবীজ (Yeast), আলু, গাজর, কয়েকরকম রসাল ফল, তাজা তরিতরকারি, শস্যের খোলস— ইত্যাদিতে। মিলের পালিশ ধবধবে চাউল, ধবধবে আটা—ইত্যাদির ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। ধবধবে চিনি সম্বন্ধেও ওই কথা। দুধ যত ফোটান যাবে তার ভিতরকার ভিটামিনও সেই পরিমাণে নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই ঢেঁকিছাটা চাউল,

জাঁতায় ভাঙ্গা আটা, গুড় বা লাল চিনি ইত্যাদি অনেক বেশি উপকারী। দুধও বেশিক্ষণ জ্বাল দেওয়া ঠিক নয়। বলকান দুধকে সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা করে পান করা উচিত। Vitamin C পাওয়া যায় এই সবে : টাটকা তরিতরকারি, লেবু, কমলা, টম্যাটো ইত্যাদি কাঁচা ফল এবং তাদের রসে। আর ডিম, মাখন, দুধ, চর্বি, মেটে, মাছের তেল ইত্যাদিতে Vitamin D পাওয়া যায়। সমস্ত রকম শস্যের অঙ্কুরোদ্গত অংশে, বীজে, ডিমে Vitamin E পাওয়া যায়।

শরীরের পক্ষে লবণ (Salt) জাতীয় খাদ্যেরও প্রয়োজন। টাটকা ফলমূল, নানারকম উদ্ভিজ্জ আহার, ডাল ইত্যাদি থেকে শরীর প্রয়োজনমত লবণ সংগ্রহ করতে পারে। টাটকা অথবা শুষ্ক ফল, ডিম, দুধ ইত্যাদিতে "Minerals" পাওয়া যায় এবং এ-ও শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

রোগীর খাবারের প্রত্যেকটি জিনিষ টাটকা হওয়ার দরকার। মাছ, মাংস, ডিম,—এগুলি যদি ভাল টাটকা না পাওয়া যায় তবে একদম ব্যবহার না করাই ভালো। দুধটাও যেন অবশ্যই খাঁটি হয়। রোগীর রান্নায় খুব বেশি মসলাপাতি থাকা সব সময়ে ঠিক নয়, কারণ এতে অনেকসময় জিনিষের গুণও নষ্ট হয় এবং রোগীর পরিপাকশক্তি দুর্বল থাকলে তার পক্ষে খাদ্যদ্রব্যটা গুরুপাক হয়ে ওঠে। কম মশলায় ওরি ভিতর যথাসম্ভব সুস্বাদু করে রোগীর জন্যে বেশ হালকা রান্না করতে হবে। প্রতিদিনকার খাওয়া একেবারে একঘেয়ে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রোগীর মুখে অরুচির ভাব না থাকে এবং আহার্যগ্রহণকালে তার মন বিমুখ না হয়ে থাকে। খাদ্যদ্রব্যের উপকরণ অদলবদল করা এই জন্যেও দরকার যে তাতে বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের বিভিন্ন ভিটামিন, minerals ইত্যাদি রোগী গ্রহণ করবার সুযোগ পায়। অতিরিক্ত জল দিয়ে কোন কিছু রান্না না করাই ভাল। শুধু সিদ্ধ করবার জন্যে ঠিক যেটুকু দরকার তাই ব্যবহার

করা উচিত। যে জলে কোন খাদ্যদ্রব্য তৈয়ার করা হয়েছে অনেক সময় সেই জলটা ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু এই জলে খাদ্যদ্রব্যের অনেক মূল্যবান অংশ বেরিয়ে যায়। অনেক চিকিৎসকের মতে যক্ষ্মাগ্রস্তের পক্ষে জলীয় খাদ্য অপেক্ষা অনেক সময়ে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক খাদ্যই বেশি উপকারী। অবিশ্যি তাই বলে আলাদা ভাবে যক্ষ্মারোগীর পর্যাপ্ত পরিমাণে দৈনিক জলপানের পক্ষে কোনও বাধা নাই, বরং জ্বর, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদির অবস্থায় এতে রোগীর উপকৃত হবারই কথা। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুদিনের জন্যে নুন একেবারেই না-দেওয়া খাদ্যদ্রব্য রোগীকে ব্যবহার করতে দিয়ে সুফল পাওয়া গেছে, কিন্তু যে সকল চিকিৎসক এ নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁরা বলছেন যে নুন-হীন আহার বুকের যক্ষ্মার চেয়ে শরীরের অপর কোন কোন অংশের যক্ষ্মাতেই অধিকতর সুফল উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছে। কোন রকম ভাজা জিনিষ মুখরোচক হওয়া ছাড়া তার অন্য কোন গুণ নাই। পেটের গণ্ডগোল থাকলে ভাজা দ্রব্যাদি রোগীর একেবারেই ব্যবহার করা উচিত নয়। রোগীর খাবার জিনিষের উপর মাছি, ধুলো, বালি যেন না পড়তে পারে।

আগেকার দিনে এই রোগীকে একেবারে পেট বোঝাই করে খাওয়ানর ব্যবস্থা ছিল। ওজনে কেবলই বাড়াতে হবে—এদিকেই ছিল চিকিৎসকের লক্ষ্য। ইংল্যাণ্ডে স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসার প্রবর্তনের প্রথম অবস্থাকার সেই "Nordrach System" এর "Over-feeding" এর হাওয়া আজকাল সম্পূর্ণরূপে অন্যভাবে বইতে সুরু করেছে। যক্ষ্মারোগীকে ঠেসে খাওয়ানর ব্যবস্থা আজকাল সব জায়গা থেকে উঠে গিয়েছে। রোগীকে ওজনের দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, কিন্তু অতিরিক্ত মোটা হবার তার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অভিজ্ঞ চিকিৎসক বলছেন যে যথাসম্ভব কম খেয়েই ধীরে ধীরে ওজনে বাড়বার চেষ্টা করা উচিত। আর, অতিরিক্ত

ওজনে বাড়াটা বিঘ্নজনক। বস্তুতঃ শরীরে অতিরিক্ত চবি জমবার ফলে নতুনতর বহুরকম উপসর্গ দ্বারা রোগীর বিড়ম্বিত হওয়া যথেষ্ট সম্ভব। দেহের স্বাভাবিক ওজন রোগীর যা হওয়া উচিত, তা থেকে সামান্য কয়েক পাউণ্ড বেশি থাকলেই যথেষ্ট। রোগী যেন মনে রাখেন যে, ওজনে বাড়া মানেই রোগ সেরে যাওয়া নয়। এক পাউণ্ড ওজনে না বেড়ে অসুখ একেবারে ভাল হয়ে গিয়েছে, এবং ঝুড়ি ঝুড়ি ওজন বেড়েও অসুখ এক তিলও কমেনি, এরকম দৃষ্টান্ত বহু আছে। ওজনটা খুব কম থাকলে রোগী যদি উপযুক্ত আহার্য গ্রহণ করে ধীরে ধীরে শরীরকে পুষ্ট করতে পারেন, সেটা একটা ভাল লক্ষণ বলে ধরা হবে। কিন্তু রোগীর শরীরের ওজন যদি কিছু মাত্র না কমে থাকে এবং তাঁর ওজন যদি বেশ স্বাভাবিক থাকে, তা হলে বেশি রকম দুধ, ক্ষীর, ছানা, মাখন খেয়ে ওজনে আর কিছুমাত্র বাড়বার চেষ্টা না করাই সর্বতোভাবে নিরাপদ। এই অবস্থায় সাধারণ হালকা খাবার খেয়ে এইটে শুধু বজায় রাখতে পারলেই হল। শরীরে অতিরিক্ত খানিক চর্বি জমিয়ে হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্ ইত্যাদিকে শুধু ক্লিষ্টই করা হয়, এবং টি-বির চিকিৎসায় যা নাকি অত্যাবশ্যক—সেই বিশ্রাম গ্রহণের পক্ষেই ফুস্‌ফুস্ বিশেষ একটা প্রতিকূল অবস্থার ভিতরে পড়ে। শরীরের ক্ষয়ের অবস্থাতেই ওজনে বাড়বার বিশেষ চেষ্টা করতে হবে—নতুবা নয়। বুকের ক্ষত যদি ঠিকমতন সারতে থাকে তবে একটু কম ওজন নিয়ে খুব মাথা ঘামানর কিছু নাই।

দুঃখের বিষয় বহু চিকিৎসকেরও এসব বিষয়ে নানা প্রকার ভ্রম ঘটে থাকে—যা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়।

এ ছাড়া আরেকটি দিক আছে, অতিরিক্ত খেয়ে খেয়ে অতিরিক্ত ওজনে বাড়বার কু-চেষ্টা করতে গিয়ে অনেক রোগী তাদের পেটের একেবারে এমন সর্বনাশ করে বসে যার প্রতীকার নাকি শেষে বহু চেষ্টাতেও আর হতে চায় না! খাওয়াটাকে চালাতে হবে পেটের দিকে লক্ষ্য রেখে, যাতে করে

কোন ভাবেই পেটটা খারাপ না হয়। অধিকাংশ *টি*-বি রোগীর প্রায়ই পেটের গোলমাল লেগে থাকে এবং পেটটা ভাল রাখতে না পারলে শরীরের উন্নতি যথেষ্ট পিছিয়ে পড়ে। বিশেষ কোন একটা জিনিষ খেয়ে পেটের গোলমাল হয় কি না সেটা খুব লক্ষ্য রাখা দরকার। কারুর কারুর মাছ মাংস খেলে পেটের গোলমাল হয়। তাদের মাছ মাংস ছেড়ে দেওয়া উচিত। নিরামিষ আহারও উৎকৃষ্ট; মাছ মাংস ইত্যাদি না খেলে যে চলবেই না এমন কোন কথা নাই। আর যাঁরা মাছ মাংস খাবেনও তাঁরা যেন লোভীর মতন এগুলো একেবারে অতিরিক্ত রকম না খান—আর সব কিছু বাদ দিয়ে, যদি নাকি লিভার, কিড্‌নী, শরীরাভ্যন্তরস্থ ইত্যাদি যন্ত্রকে সুস্থ রাখবার মতলব তাঁদের থাকে। অল্প অথচ উপযুক্ত মাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সহকারে পরিবেশিত খাদ্যের প্রতিই লক্ষ্য রাখতে হবে। কারুর কারুর দুধ খেলে পেটের গোলমাল হয়। কেউ কেউ বা দুধ মোটে ভালই বাসে না। অথচ দুধের মতন উপকারী জিনিষ আর নাই। ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ফস্‌ফরাস্‌, ক্লোরিন, সাল্‌ফার, আয়োডিন্‌, iron—পূর্বোল্লিখিত অপরাপর বস্তু ছাড়াও শরীরের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এই সমস্ত minerals-ই দুধে রয়েছে এবং দুধ নিজেই একটি সম্পূর্ণ খাদ্য। মাত্র পৌনে এক সের দুধে যে পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে, আমরা প্রতিবারে যে পরিমাণে ফল, তরকারি সাধারণতঃ খেয়ে থাকি—সেই পরিমাণ ফল, তরকারি দিনের ভিতর বার কুড়িক খেলে পরে তবে ঐ পরিমাণ ক্যালসিয়াম আমরা তার ভিতর থেকে পেতে পারি। নিতান্ত পক্ষেই দুধ যদি সহ্য না হয় তবে দুধকে অন্য কোন ভাবে তৈরি করে খেতে চেষ্টা করা যেতে পারে, যেমন ঘোল করে অথবা দই করে অথবা ছানা করে অথবা পুডিং করে। দরকার হলে হজমের সুবিধার জন্যে বেঙ্গাবুস্‌ ফুড্‌ বা অ্যারারুট ইত্যাদি জাতীয় জিনিষ দিয়ে দুধ তৈরি ক'রে ব্যবহার করা যেতে পারে।

দুধের সঙ্গে একটু চুনের জল মিশিয়ে নিলেও সুবিধা হতে পারে। আগে অত্যন্ত পেট ভরে খেয়ে খানিকটে দুধ পরে খেলে অনেক সময় হজমের ব্যাঘাত হতে পারে—কারণ দুধ, আগেই বলেছি, নিজেই একটি সম্পূর্ণ খাদ্য—অন্য কিছুর সঙ্গে ভরা পেটে খাবার এ অপেক্ষা রাখে না। দুধ খাওয়ার পরে যদি একটু কমলা বা লেবুর রস খাওয়া যায়, হজমের পক্ষে বেশ সুবিধা হতে পারে। পেট ভাল না থাকলে একবারেই বেশি পরিমাণে দুধ খেতে চেষ্টা না ক'রে প্রথমে অল্প থেকে সুরু ক'রে ধীরে ধীরে দুধের পরিমাণ সহ্যমত বাড়ান যেতে পারে। একটু চা বা কফি বা কোকোর গন্ধ করেও দুধ খাওয়া যেতে পারে—একঘেয়ে আস্বাদটাকে দূর করার জন্যে। স্যানাটোজেন বা ওভালটিন জাতীয় জিনিষও মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে। দুধ কি ভাবে খেলে সহজে হজম হতে পারে এবিষয়ে চিকিৎসকও হয়ত কোন নির্দেশ দিয়ে দিতে পারেন—কোন ওষুধ দিয়ে দুধটা তৈরি করে নেওয়া সম্পর্কে। কাঁচা ডিম ভেঙ্গে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে খাওয়া বেশ ভাল। ডিমকে ভেজে না খেয়ে অল্প একটু সিদ্ধ করে বা "পোচ" করে বা দুধে মিশিয়ে খাওয়াই উচিত। তবে সামান্য পরিমাণও দুধ বা দুধের তৈরি কোন জিনিষ যদি কিছুতেই রোগী বরদাস্ত করতে না পারেন, তা হলে বাধ্য হয়েই এটা খাদ্যতালিকা থেকে মাঝে মাঝে বাদ দিয়ে পাঁচমিশালী অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা রোগীর শরীরের পুষ্টিবিধানের চেষ্টা করতে হবে বলেও চিকিৎসকেরা মত প্রকাশ করেছেন। জবরদস্তি করে কিছু খাওয়ানর চেষ্টা অনেক সময় ঠিক নয়। সকালে বিকালে জলখাবার হিসাবে সুজির তৈরি কোন জিনিষ, লুচি, চিঁড়ে, সন্দেশ জাতীয় মিষ্টি, ছোলাভিজা, মাখন-টোষ্ট, পনীর, বিস্কুট, কেক্, পুডিং, পরিজ, জেলী-মাখান রুটি, মধু—ইত্যাদি—রোগী রুচি, পেটের অবস্থা এবং পূর্বাভ্যাস অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারেন। সর্বপ্রকার শাকসবজি তরিতরকারি, ফলের ভিতর আম, পেঁপে, লিচু,

আনারস, আপেল, কলা, বেল, আঙুর, কমলা, টম্যাটো, লেবু, বাদাম, তা ছাড়া শুকনোর ভিতরে খেজুর, কিসমিস, আখরোট, ইত্যাদি রোগী প্রাণ ভরে আর্থিক অবস্থা অনুসারে খাবেন। নির্দোষ কোন চাটনি বা আচারও এক আধটু খেলে ক্ষতি নাই। মাংস বা তরকারির যূষ, "salad", ইত্যাদিও ভাল। পেঁয়াজও খাওয়া চলবে।

যক্ষ্মারোগীর দিনের ভিতরে কবার খাওয়া উচিত এ প্রশ্ন আমাদের মনে জাগতে পারে। সুস্থ লোকেরা সাধারণতঃ দিনের মধ্যে চারবার খেয়ে থাকেন—সকালে, দুপুরে, বিকালে এবং রাত্রে। যক্ষ্মারোগীরাও ঠিক এই নিয়মেই খাওয়া চালাতে পারেন অথবা পেটের অবস্থা সুবিধাজনক না থাকলে বিকালের আহার একেবারে তুলে দিতে পারেন। অনেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক টি-বি রোগীর পক্ষে তিন বার আহারই প্রশস্ত বলে মনে করেন। বিকালে কিছু খেলেও অত্যন্ত হালকা ধরনের কিছু সামান্য পরিমাণে খেতে হবে। নিয়মিত সময়ের প্রধান আহারের ফাঁকে ফাঁকে যখন তখন মুখরোচক এটা-ওটা-সেটা খাওয়া অথবা খানিকটা খানিকটা ক'রে দুধ পান করা অনেক সময়েই হজমের গোলযোগ ঘটায় এবং ক্ষুধা নষ্ট করে। এ অভ্যাস ছাড়া উচিত। মাংস এবং দুধ এক সঙ্গে খেয়ে অনেকের পেটের গোলমাল হতে পারে। এ অভ্যাসও ত্যাগ করা ভাল ব'লে অনেকে বলেন। এ রোগে জ্বরের সময় খেলেও জ্বর বৃদ্ধি পায় না এবং জ্বরের অবস্থাতে খাওয়াটা চালাতে পারা যায় নিরাপদেই। তবে রোগীর যখন জ্বর অত্যন্ত বেশি থাকে এবং রোগের বিষ অত্যন্ত সক্রিয় হয় তখন হয় ত তাকে হালকা এবং তরল খাদ্যের উপর রাখবার দরকার হতে পারে। রোগীর শারীরিক অবস্থা অনুসারে কখনো কখনো তাকে অল্প পরিমাণে বার বার খাওয়ানর প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু অবস্থা এবং সময় বুঝে ব্যবস্থা চিকিৎসকের উপরেই এক্ষেত্রে নির্ভর করবে। কড্লিভার বা হালিবাট্-লিভার

অয়েলও খাদ্যদ্রব্যের অন্তর্ভূক্ত—যদিও ওষুধ হিসাবে একে সাধারণতঃ ভাবা হয়ে থাকে। পেটের অবস্থা খারাপ থাকলে কড্‌লিভার অয়েল সহজে হজম হয় না। অতিরিক্ত জ্বরের অবস্থাতেও এ জিনিষটি শরীরের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী এসব দিকে লক্ষ্য রেখে তবে কড্‌লিভার অয়েল ব্যবহার করতে হবে। পেটের টি-বি থাকলে তার চিকিৎসা হিসাবে তিন বা চার আউন্স পরিমাণ কমলা বা টম্যাটোর রসের সঙ্গে আধ থেকে এক আউন্স পর্যন্ত কড্‌লিভার অয়েল মিশিয়ে ঠিক আহারের পরেই রোগীকে খেতে দেবার ব্যবস্থা আছে।

রোগীর পেটের গোলমাল নানা রকমের হতে পারে—অম্ল, বমি, পেটফাঁপা, ডাইরিয়া, কোষ্ঠবদ্ধতা, আমাশয়, পেটের বেদনা—ইত্যাদি। পেটের গোলমালের দীর্ঘকাল-স্থায়ী এবং জটিল অবস্থায় এই ব্যাধি অন্ত্রকে আক্রমণ করেছে কিনা এটা পরীক্ষা করবার দরকার। পেটের যক্ষ্মার চিকিৎসার জন্যে অন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করবার প্রয়োজন হতে পারে।

ধীরে ধীরে বেশ করে চিবিয়ে রোগীকে খাবার খেতে হবে। দাঁতের যত্ন নেবার অত্যন্ত দরকার এবং দাঁতের বা মাড়ির কোনপ্রকার ব্যারাম থাকলে উপযুক্ত দন্ত-চিকিৎসককে দিয়ে তার সংশোধনের ব্যবস্থা অবশ্য করতে হবে। খাদ্যদ্রব্যের প্রতি বিতৃষ্ণা, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি অবস্থার প্রতি রোগীর সতর্ক থাকতে হবে এবং মন ও খাদ্যের নানা রকম পরিবর্তন দ্বারা এটা দূর করবার চেষ্টা করতে হবে। মদ, আফিং, তামাক প্রভৃতি কোন প্রকার মাদক দ্রব্য চিকিৎসকের পরামর্শ ভিন্ন গ্রহণ করা কখনই সঙ্গত নয়। যাঁদের হাতে রোগীর খাদ্য পরিবেশনের ভার তাঁরা এটা লক্ষ্য রাখবেন যে বেশ যত্নের সঙ্গে এবং সুন্দর, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে যেন রোগীকে খাবার দেওয়া হয়। অযত্ন বা অবহেলার সঙ্গে কিম্বা দৃষ্টির পক্ষে বিরক্তিকর এরকম ভাবে

খাবার জিনিষ দিলে রোগীর মন সে খাবারের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়াই স্বাভাবিক।

খাওয়া সম্বন্ধে রোগীকে একটা কথা সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে খাবার উদ্দেশ্যে আমরা বেঁচে থাকি না—বাঁচবার উদ্দেশ্যে খাই। তাই জিহ্বার দিকে দৃষ্টি না রেখে দৃষ্টি রাখতে হবে শরীরের পুষ্টির উপর—চিকিৎসকের সহৃদয় নির্দেশের উপর—নিজের হজমশক্তির উপর। রমেন তেল-লঙ্কা ছাড়া খেতে পারে না—শ্যামলী আমকাসন্দি বা ঝাল-তেঁতুল ছাড়া ভাত খেতে পারে না—যদিও খাবার পর অম্বলের উদ্গার ওঠে বা পেট ভার হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে রমেন ও শ্যামলীকে বুঝতেই হবে যে তাদের আহারের এই অভ্যাস বদলাতেই হবে—প্রথম প্রথম দু চার দিন কষ্ট হলেও কয়েকদিন চেষ্টার পরেই দেখা যাবে মাখন দিয়ে আলু ভাতে বা বেগুন পোড়া, শুক্তা, শুধু ঘিয়ে অল্প ফোড়ন দিয়ে ডালনা—বেশি ছাড়া কম উপাদেয় নয়; এবং তার কাছে অম্বলের উদ্গার বা পেট ভার হয়ে থাকাটা ঘৃণিত হবারই যোগ্য। খাওয়া সম্বন্ধেও একটা শিক্ষার দরকার। যাঁরা রান্না করবেন তাঁদেরও অজ্ঞতাপূর্ণ অন্যায় জিদগুলি দূর করতে হবে। তবে পূর্বেও বলা হয়েছে এবং এখানেও বলা যেতে পারে যে অন্য কোন ভাবে অনিষ্টকর না হলে রোগী তাঁর সাধ অনুযায়ী এটা-ওটা-সেটা খেতে পারেন এবং তাঁর খাওয়া সম্বন্ধে অযথা নিষ্ঠুরতার কোন প্রয়োজন নাই।

ভাল খাওয়া ছাড়া আরেকটি জিনিষ হচ্ছে মুক্ত এবং বিশুদ্ধ বায়ু—যা নাকি যক্ষ্মারোগীর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। মুক্ত এবং বিশুদ্ধ বায়ু বলতেও সাধারণ লোকের আছে নানা রকম ভ্রমাত্মক ধারণা—যেমন নাকি আছে "বিশ্রাম" সম্বন্ধে। রোগীর জন্যে মুক্ত এবং বিশুদ্ধ বাতাসের ব্যবস্থা কেমন ক'রে করতে হবে আমি এখানে বলছি।

রোগটা যখন 'টি. বি.'—

প্রথমতঃ রোগী যদি সহরবাসী হন এবং সে সহরটি যদি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন এবং ধূম-ধূলি-ধূসরিত হয় তবে সে সহরের বাইরে—যেখানে ধুলো-ধোঁয়া ইত্যাদির উৎপাত নাই—মফঃস্বলে এমন কোন গ্রামের মত একটা জায়গায় গিয়ে বাস করতে চেষ্টা করা মন্দ নয়। তবে বেশি দূরে গেলে যদি নানা কারণে—বিশেষ করে চিকিৎসকের সাহায্য পাওয়ার এবং চিকিৎসার দিক থেকে সুবিধাজনক না হয় তবে, সম্ভব হলে, সহরের যে অংশে ধূলো, ধোঁয়া, ঘিঞ্জী অপেক্ষাকৃত কম, অথবা সহরতলির দিকটা যদি অন্যভাবে অস্বাস্থ্যকর না হয় তবে সেদিকে গিয়ে রোগীর থাকতে চেষ্টা করা উচিত। চারিদিকে খোলা রোদ-বাতাসের ভিতরেই রোগীর ঘরখানা হওয়া দরকার। সুবিধাজনক হলে ছাতের উপর রোগীর জন্যে সুন্দর কটেজ জাতীয় ঘর তৈরি ক'রে দেওয়া যেতে পারে—টাইল, গোলপাতা বা খড় দ্বারা।

রোগীর ঘরে কারুর শোয়া ঠিক নয়; তবে নিতান্ত অবস্থাগতিকে রোগীর ঘরে যদি কাউকে কোন কারণে শুতেই হয় তবে রোগীর বিছানার অন্ততঃ আট নয় ফিট দূরে তার বিছানা থাকবে। রোগীকে একটি যা-তা ঘর দিলে চলবে না—তাকে দিতে হবে বাড়ীর সর্বোৎকৃষ্ট ঘরখানি। সেরকম ঘর না থাকলে তার জন্যে আলাদা একখানা ঘর তৈরি করতে হবে।

রোগী যে ঘরে শোবে—সে ঘরে প্রচুর পরিমাণে দরজা-জানালা থাকা চাই এবং সেই দরজা-জানালা খুলে রাখতে হবে সমস্ত দিন এবং রাত—কি গ্রীষ্ম, কি শীত—সব দিনে। এইটুকু খালি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে—বাতাসের কোন জোর ঝাপ্‌টা যেন সোজাসুজি এসে রোগীর গায়ে না লাগে। এই ভুল ধারণা মন থেকে একেবারে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতে হবে যে, রাত্তিরে দরজা-জানালা খুলে শুলে পরে রোগীর ঠাণ্ডা লেগে যাবে। প্রকৃতপক্ষে দরজা-জানালা খুলে শুলে ঠাণ্ডা লাগেনা—ঠাণ্ডা লাগে সব বন্ধ ক'রে শুলেই। বন্ধ করা ঘরের হাওয়া থাকে গরম এবং বাইরের

হাওয়া থাকে ঠাণ্ডা; এই অবস্থায় গরম হাওয়া থেকে হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়ার সংস্পর্শে এলেই লেগে যায় ঠাণ্ডা। কিন্তু বাইরের তাপের সঙ্গে ঘরের তাপের যদি বিশেষ কোন তফাৎ না থাকে, তবে আর এ ভয় থাকেনা।

যদিও আমাদের কারুর কারুর অতিরিক্ত সর্দিপ্রবণধাত হবার মূলে অনেক কারণই বিদ্যমান থাকতে পারে, কিন্তু একথা বললে অন্যায় হবেনা যে অধিকাংশ সময়ে খোলা বাতাসের প্রতি ক্রমাগত বিমুখতার ফলে আমাদের শরীর এমন ভাবে তৈরি হয়ে ওঠে যে, একটুক্ষণ খোলা জায়গায় থাকলে যখন তখন সামান্য কারণেই যায় ঠাণ্ডা লেগে। ধীরে ধীরে একবার যদি জানালা দরজা খুলে শোয়া অভ্যাস করে ফেলতে পারা যায়, তবে ঠাণ্ডা লাগবার ভয় আর কস্মিন কালেও থাকবেনা এবং একবার ভাল রকম অভ্যাস হয়ে গেলে তখন বদ্ধ ঘরে শুতেই হাঁপিয়ে উঠতে হবে—শুধু তাই নয়, শুতে অবশেষে ঘৃণা বোধ হবে। প্রচণ্ডতম শীতের দিনেও রোগী খোলা ঘরে নিঃশঙ্কভাবে ঘুমোতে পারেন—গায়ে ভাল ক'রে লেপ কম্বল জড়িয়ে। একটা উলের টুপি দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা বেশ ভাল—কিন্তু এখানে একটা সতর্ক-বাণীর প্রয়োজন—মুখ ঢেকে যেন রোগী কদাচ না শোন। রোগী নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, সমস্ত শরীরটা এবং মাথা যদি ভাল ভাবে ঢাকা থাকে—প্রত্যেক ঋতুর প্রয়োজনানুযায়ী বস্ত্রে—তবে খোলা বাতাসে শুলে ঠাণ্ডা লাগবার ভয় কিছুমাত্র থাকে না। এবং খোলা বাতাসকে ভাল না বাসতে পারলে শরীরের সন্তোষজনক উন্নতি তিনি কখনই আশা করতে পারেন না।

মুক্ত, বিশুদ্ধ বায়ুতে থাকবার উপকারিতা কিছুদিনের ভিতরেই বেশ বুঝতে পারা যায়। জ্বর বেশ কমে আসতে থাকে, হজম শক্তি একটু একটু ক'রে বাড়তে থাকে, বিবর্ণ দেহে বেশ অল্পে অল্পে রক্তের আভা দেখা দেয়।

আর, আমি বিশ্রাম নেবার কথা যা বলেছি, যার গুরুত্ব নাকি টি-বির চিকিৎসায় অত্যন্ত বেশি, সে রকম বিশ্রাম মুক্ত বায়ুতে ছাড়া নেওয়া প্রায় অসম্ভব। বদ্ধ ঘরের বিযাক্ত, গুমোট হাওয়ায় মন ছটফট্ করতে থাকে এবং বিশ্রামের হয় সম্পূর্ণ ব্যাঘাত। কিন্তু মুক্ত বায়ুতে একেবারে তার উল্টো। বাইরের মনোরম ঝিরঝিরে হাওয়ার কোমল, সস্নেহ স্পর্শ শরীরে এসে লাগবার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের উত্তেজনা আসে কমে, মনে জাগে বেশ একটা শান্ত ভাব। বেশ চুপ চাপ শুয়ে থাকতে অতটা আর কষ্ট হয় না। এই রোগে অনেক সময় নৈশ ঘর্ম হয়ে থাকে। কখনো বা অল্প হয়, কখনো বা ঘামে রোগীর সমস্ত শরীর একেবারে ভিজে যায়। মুক্ত বায়ু এই নৈশ-ঘর্ম নিবারকও বটে (নৈশ ঘর্মের উৎপাতের প্রতিবিধানার্থে, ঘুমিয়ে পড়বার আগে রোগীকে টয়লেট্ ভিনিগার মিশ্রিত উষ্ণ জলে স্পঞ্জ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ও-ডি-কোলোনও ব্যবহার করা যেতে পারে। খুব বেশি কাপড় জামা পরে শোয়াও ঠিক নয়)। ঘরের হাওয়া যদি স্থির, স্তব্ধ হয়, তবে সেটা খারাপ। ক্ষমতায় কুলোলে এবং সুযোগ থাকলে বিদ্যুৎ-চালিত পাখার সাহায্যে ঘরের বাতাসকে বেশ ইতস্তত সঞ্চালিত করবার ব্যবস্থা করতে পারলে সেটার ক্রিয়া বিশেষ ভাল হবে। আধুনিক কয়েক-জন যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞ এই মত প্রকাশ করছেন যে রোগীর পক্ষে "air-conditioned" ঘরই সর্বাপেক্ষা ভাল। মশার কামড় থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে রোগীর মশারি ব্যবহার অবশ্য-কর্তব্য, কিন্তু বায়ু-চলাচল অব্যাহত রাখবার জন্যে "নেটের মশারি" ব্যবহার করা দরকার। হাওয়া খাওয়ার জন্যে তাই বলে ঘরের বাইরে একেবারে মাঠের মাঝখানে গিয়ে অথবা একেবারে উন্মুক্ত ছাতে রাত কাটান রোগীর পক্ষে একেবারেই ঠিক নয়। আরো একটা কথা এই যে রোগী খুব ঘন ঘন এবং গভীর নিশ্বাস নিয়ে যেন ফুস্ফুসকে হাওয়া খাওয়াতে চেষ্টা না করেন বা মুখ দিয়ে বাতাস

না গিলতে থাকেন খুব করে। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন মানে এসব নয়। জোরে, প্রচুর পরিমাণে এবং দ্রুত ভাবে বায়ু নাসিকা পথে যত গ্রহণ করা যাবে আর ত্যাগ করা যাবে, ফুস্‌ফুসের বিশ্রামও তত কম হবে, এবং অসুখের ক্ষতও সারবে না। খুব ধীরে, সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস প্রশ্বাসকে হতে দিতে হবে।

প্রত্যেকটি কাজে নিয়মানুবর্তিতা অভ্যাস করা টি বি রোগীর একান্ত প্রয়োজন। পথ্য গ্রহণ, বিশ্রাম, ঔষধ ব্যবহার ইত্যাদি প্রত্যেকটি কাজ প্রতিদিন একেবারে ঘড়ির কাঁটায় চালাতে হবে। নিয়মিতভাবে এক সপ্তাহ বা দু সপ্তাহ অন্তর ওজন নিতে হবে। সকালে, দুপুরে, বিকেলে, রাত্রে—ঘণ্টা চারেক অন্তর প্রতিদিন নিয়মিত টেম্পারেচার নিতে হবে এবং তা খাতায় বা চার্টে লিখে রাখতে হবে। দৈনিক সকালে এবং সন্ধ্যায় অন্ততঃ দুইবার নাড়ির বেগ মিনিটে কত করে হয় দেখে খাতায় লিখে রাখতে হবে। রোগীর উন্নতি, অবনতি, রোগের প্রকৃতি এবং গতি ইত্যাদি স্থির করতে পাল্‌স্‌ এবং টেম্পারেচারের প্রতি ক্রমাগত অত্যন্ত লক্ষ্য রেখে চলবার প্রয়োজন হয়; কাজেই যে খাতা বা চার্টে এগুলি নোট করা থাকবে সে খাতা বা চার্টখানা খুব যত্নে রাখতে হবে।

টেম্পারেচার নেওয়া, পাল্‌স্‌ দেখা, ওজন নেওয়া—এগুলি সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আছে। কোন পরিশ্রম বা উত্তেজনার মুহূর্তে টেম্পারেচার বা পাল্‌স্‌ দেখা একেবারেই বিধি নয়। প্রত্যেকবার টেম্পারেচার নেবার আগে অন্ততঃ আধ ঘণ্টাখানেক সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে এবং এই সময়টাতে গল্প করা, বই পড়া, লেখা, খেলাধূলো ইত্যাদি চলবে না। মুখে টেম্পারেচার নিতে হলে এই সময়টাতে ঠাণ্ডা বা গরম কোন কিছু খাওয়াও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ঠোঁট দুটিও বন্ধ করে রাখা উচিত। এই সব নিয়মগুলির অবহেলা করলে টেম্পারেচার ঠিক মতন থার্মোমিটারে উঠবে না—হয় উঠবে কম, না হয়

বেশি। পারা ঠিক মতন উঠছে কিনা এটা দেখবার জন্যে পাঁচ মিনিট পূরবার আগেই মুখ থেকে বার বার থার্মোমিটার বের ক'রে দেখা উচিত নয় বা মুখে থার্মোমিটার ঢুকিয়ে কথা বলার চেষ্টা করাও ঠিক নয়। বগলে যেন কেউ জ্বর না দেখেন, ওতে জ্বর ঠিক ওঠেনা এবং বগলের টেম্পারেচার বিশ্বাসযোগ্যও নয়। সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য হচ্ছে "Rectal temperature" (যা নাকি মুখের temperature এর চেয়ে সাধারণতঃ একটু বেশি), এবং Rectal temperature দ্বারা চালিত হওয়াই রোগীর পক্ষে সর্বোত্তম। রেক্টাল টেম্পারেচার নেবার নিয়ম হচ্ছে এই: থার্মোমিটারের বাল্‌বে প্রথমে একটু ভেসেলীন্ জাতীয় জিনিষ লাগাতে হবে, এবং ধীরে ধীরে মলদ্বারে ইঞ্চি দুই প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। জিভের নীচেয়ই হোক আর মলদ্বারেই হোক ঘড়ির কাঁটা দেখে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পূরো পাঁচটি মিনিট থার্মোমিটার রেখে টেম্পারেচার নিতে হবে। আধ মিনিটের মার্কামারা থার্মোমিটারও পূরো পাঁচ মিনিট রাখতে হবে, আধ মিনিটে কদাচিৎ সঠিক টেম্পারেচার ওঠে। মুখ বা মলদ্বার থেকে থার্মোমিটার বের করে টেম্পারেচার দেখে অ্যাল্‌কোহল জাতীয় কোন ওষুধে একটু তুলো ভিজিয়ে থার্মোমিটারটা বেশ করে মুছে ঝেড়ে ৯৫° ডিগ্রীর কাছে নামিয়ে খাপে বন্ধ করে রেখে দিতে হবে। একটা শিশিতে লোশানের ভিতরেও থার্মোমিটার ডুবিয়ে রাখা যেতে পারে, কিন্তু তাতে থার্মোমিটারের দাগগুলি কয়েকদিন পরে উঠে যায় এবং টেম্পারেচার দেখবার অসুবিধা হয়। রোগীর নিজের থার্মোমিটার ঝাড়বার চেষ্টা করা সব সময়ে উচিত নয়—বিশেষতঃ দুর্বল বা পীড়িত অবস্থায়। এ বিষয়ে অপরের সাহায্য নেওয়াই ভাল। এক রকম যন্ত্র কিনতে পাওয়া যায় যার ভিতর থার্মোমিটার প্রবেশ করিয়ে দিলে পারা আপনা থেকেই নেমে আসে।

সকালের টেম্পারেচার এবং পাল্‌স্ নেবার নিয়ম হচ্ছে একেবারে ভোরে

ঘুম ভাঙ্গবার সঙ্গে সঙ্গেই। সমস্ত প্রাতঃকৃত্য সমাপন করতে হবে তারপরে। দিনের ভিতর কোন্ সময়ে জ্বরের এবং নাড়ির বেগ সব চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায় সেটা নোট করতে হবে। এই ব্যাধিতে পাল্‌সের উপর অনেক বিশেষজ্ঞ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এই মত প্রকাশ করেছেন যে, অন্যান্য অবস্থা একই রকম এ রকম দুজন রোগীর ভিতর এক জনের নাড়ির গতি যদি বেশ ধীর হয় এবং অপরের নাড়ির গতি যদি অত্যন্ত দ্রুত হয় তবে শেষোক্তর চেয়ে প্রথমোক্ত রোগীর শারীরিক অবস্থা বেশি সন্তোষজনক বলতে হবে। এমন কি, একটি রোগীর জ্বর ৯৯° এবং পাল্‌স্ ৭০-৭২ যদি হয়, এবং আর একটি রোগীর জ্বর ৯৮·৪° এবং পাল্‌স্ ৯০-৯২ হয়—তবে আগের রোগীটিরই Prognosis ভাল বলা হয়ে থাকে। অনেক সময় অতি সামান্য কারণে যক্ষ্মারোগীর পাল্‌স্ অত্যন্ত বেড়ে যায়। কারুর উপরে একটু রাগ করলে, কিছুক্ষণ ধরে কথা বললে, একখানি চিঠি লিখলে, হঠাৎ কোন প্রীতির বা ঘৃণার পাত্রকে দেখতে পেলে, তর্ক করলে, ডাক্তার ঘরে এসে ঢুকলে—বা অন্য যে কোন ধরনের উত্তেজনার ফলেই পাল্‌স্ খুব বেড়ে যেতে পারে। বিশেষ ক'রে যে রোগী একটু ভাবপ্রবণ তার তো কথাই নাই। অবিশ্যি এই সব সময়ে সুস্থ লোকেরও স্বাভাবিক ভাবেই নাড়ির দ্রুততা ঘটতে পারে। কাজেই এই সব উত্তেজনায় মুখে পাল্‌স্ গুনতে নাই। শরীর মনের বেশ শান্ত এবং সম্পূর্ণ-বিশ্রামযুক্ত শয়নের অবস্থায় নাড়ির বেগ যা হয় সেইটেই রোগীর প্রকৃত অবস্থা সূচিত করে এবং সেইটেই চিকিৎসককে দেখানর জন্যে খাতায় বা চার্টে টুকে রাখতে হবে।

একটা বিষয় রোগীদের জানবার দরকার। পাল্‌সই হোক বা টেম্পারেচারই হোক—প্রত্যেকের ক্ষেত্রে একই রকম খাটবে এমন "absolute normal" বলে কিছু নাই। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ক্ষেত্রে

এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে টেম্পারেচার এবং পাল্‌স্‌-এর অনেক রকম পরিবর্ত্তন হতে পারে এবং রোগী যদি ৯৮°৪° এর দাগকেই তাঁর "নর্ম্যাল টেম্পারেচার" বলে ধরে বসে থাকেন তবে তিনি অতি দুঃখজনক ভুল করবেন। রাত্রে বেশ সুনিদ্রার পরে ভোর বেলায় রোগীর জাগরূক অবস্থায় তাঁর Rectal temperature ৯৭°৩° থেকে ৯৮° ডিগ্রী পর্যন্ত Normal হতে পারে এবং বিকেলের দিকে ৯৯°১° থেকে ৯৯°৫° পর্যন্তও Normal হতে পারে। এমন কি মেয়েদের ক্ষেত্রে Normal Temperatureগুলো এর চেয়েও কিছু বেশি হতে পারে। ভোরের টেম্পারেচার দু চার পয়েন্ট্‌ বেশিও হতে পারে যদি নাকি রাত্তিরে ভাল ঘুম না হয়—স্বপ্নাদি, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, মশা-ছারপোকা বা গরম ইত্যাদির জন্যে, বা কোন রকম মানসিক উত্তেজনা বশতঃ। সকাল থেকে বিকেলের টেম্পারেচার স্বভাবতই কিছু বেশি থাকতে পারে—সুস্থ লোক বা রোগী উভয়ের ক্ষেত্রেই। সেটাকে "জ্বর" বলে না। কিন্তু ভোরে ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে যদি টেম্পারেচার ৯৯° বা তার বেশি হয়, সেটাকে "জ্বর" ধরতে হবে। কাজেই এক সময় যে টেম্পারেচার স্বাভাবিক, অন্য সময় তা জ্বর হতে পারে, এবং এক সময় যা জ্বর, অন্য সময় তা স্বাভাবিক হতে পারে। আরেকটা কথা। দিনের ভিতর চার পাঁচবার জ্বর দেখার নিয়ম এই জন্যেই যে, কোন্‌ রোগীর জ্বর যে কখন সব চেয়ে বেশি বাড়বে তা বলা যায় না। কারুর জ্বরটা সব চেয়ে বেশি হয় হয়ত বেলা দুটোর সময়ে, কারুর বা অন্য সময়ে। এটা লক্ষ্য রাখবার দরকার। অবিশ্যি অধিকাংশের জ্বর সাধারণতঃ সন্ধ্যায়ই বেশি ওঠে। মুখের এবং Rectal temperatureএ যে তফাৎ তাও একরকম নয় এবং এই তফাৎটা পয়েন্ট্‌ এক ডিগ্রী থেকে সুরু ক'রে পূরো এক ডিগ্রী অথবা তারও কিছু বেশি হতে পারে—বিভিন্ন লোকের ভিতর এবং একই লোকের ভিতর বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন সময়ে।

আরোগ্যাভিমুখী রোগীকে যখন ক্রমে ক্রমে চলা ফেরা করতে দেওয়া হয় তখন রোগী তাঁর টেম্পারেচারের ভিতর আরও অদ্ভুত এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারবেন। ঠিক হেঁটে আসবার পরে বা কোন উত্তেজনার পরে তাঁর (রেক্‌টাল) টেম্পারেচার ১০০·২°-ও যদি হয় তবে তাও "জ্বর" নির্দেশ করবে না যদি নাকি টেম্পারেচারটা বিশ মিনিটকাল সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরেই ঠিকমতন পূর্বের অবস্থায় নেমে আসে। একজনের পক্ষে যে টেম্পারেচার "নর্মাল" অপরের পক্ষে তা সম্পূর্ণ বিপদ-জ্ঞাপক হতে পারে, এবং একজনের পক্ষে যা বিপদ-জ্ঞাপক তা অপরের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে পারে। কাজেই উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ দ্বারা অভিজ্ঞ চিকিৎসকই কেবলমাত্র বলতে সক্ষম যে বিশেষ বিশেষ রোগীর পক্ষে স্বাভাবিক টেম্পারেচার কি হতে পারে। রোগীর পক্ষে, স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক টেম্পারেচার সম্বন্ধে তাঁর নিজের উৎকট কল্পনা থেকে নিজেকে মুক্ত করাই মঙ্গলজনক।

ঠিক একই রকম ভাবে এটাও বলা যেতে পারে যে মিনিটে ৭০—৭২ থেকে ৮৪—৮৬ পর্যন্ত যে কোন পাল্‌স্‌-রেট (মেয়েদের ক্ষেত্রে এর চেয়েও বেশি হতে পারে কিছু) বিভিন্ন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে অথবা বিভিন্ন সময়ে একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের পক্ষে "নর্মাল" বলে ধরা যেতে পারে।

জ্বর বন্ধ হয়ে তারপরে একাদিক্রমে কয়েকমাস জ্বরশূন্য অবস্থায় কাটলেও রোগীর মাঝে মাঝে পাল্‌স্‌ ও টেম্পারেচারটা নেওয়া উচিত—বিশেষ ক'রে কোন শ্রমসাধ্য কাজের পরে। যতটা সতর্কতা দ্বারা চালিত হওয়া যাবে, ততই মঙ্গল।

এখানে আরেকটা বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে যে, টি-বি রোগীর যে কেবল টি-বির জন্যেই জ্বর হবে তা নয়। সঙ্গে যদি খারাপ টন্‌সিল্‌, ফ্যারিঞ্জাইটিস্‌, পেটের দোষ, বাত, ম্যালেরিয়া বা এই সব জাতীয় অন্য

কোন উপসর্গ থাকে, তবে রোগীর শরীরে এই সবের জন্যেও জ্বর থাকতে পারে, এবং সেটাকে খেয়াল ক'রে ধরতে পারা চাই।

দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ রোগীর ভোরের টেম্পারেচারটা সাধারণতঃ একভাবেই থাকে, কিন্তু দিনের অন্য সময়কার টেম্পারেচারের তারতম্য হয়। কাজেই ভোরের টেম্পারেচারের সঙ্গে দিনের অন্য সময়ে টেম্পারেচারের সব চেয়ে বেশি হওয়ার অবস্থার কতটা তফাৎ এটা বুঝবার জন্যে নিয়মিত ভাবে ভোরের টেম্পারেচার নিতে অবহেলা করা উচিত নয়। মাঝরাত্রে সাধারণতঃ গায়ের তাপ সব চেয়ে কম থাকে। শরীরের সব চেয়ে কম তাপের সঙ্গে সব চেয়ে বেশি তাপের তফাৎ ১·৯° ডিগ্রীর বেশি হওয়া উচিত নয়।

ওজন নেওয়া সম্বন্ধে এইটুকু বলবার আছে যে প্রথম দিন দিনের যে সময়ে, যে যন্ত্রে এবং যে পোষাকে ওজন নেওয়া হবে, পরবর্তী বারগুলিতেও ঠিক সেই পোষাকে সেই যন্ত্রে এবং দিনের ঠিক সেই সময়ে ওজন নিতে হবে। তা না হলে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটবে।

—৩—

যদিও রোগীর ঘরে যাতে প্রচুর রোদ আসে সেটা দেখবার দরকার, কিন্তু এটা লক্ষ্য রাখতে হবে তার গায়ে যেন রোদ না লাগে। অনেকে এই রোগীকে অনেকক্ষণ ধরে রোদে গিয়ে রোজ বসে থাকতে উপদেশ দেন এবং অনেক সময় পীড়াপীড়িও করে থাকেন। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে বুকে এভাবে রোদ লাগান অনেক সময়েই নিরাপদ নয়। অজ্ঞ চিকিৎসক অথবা আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শ গ্রহণ ক'রে খালি গায়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বুকে কড়া রোদ লাগিয়ে অনেক রোগীই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছে—মাথা ধরিয়ে, জ্বর বাড়িয়ে, রক্তবমি ক'রে···ইত্যাদি। বিচক্ষণ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া সৌর-স্নান একেবারেই অসঙ্গত। শরীরের কোন্ কোন্ অংশে কখন, কি ভাবে, কতদিন যাবৎ, কতটুকু রোদ লাগাতে হবে, অথবা কোন রোগী আদৌ সৌর-স্নানের উপযুক্ত কিনা—এসব সম্বন্ধে কেবল বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারেন। বুকের টি-বি ছাড়া শরীরের অন্যান্য কোন কোন স্থানের টি-বিতে আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি দ্বারা চিকিৎসার ফল বিশেষ সন্তোষজনক হয়েছে। সূর্যালোক ছাড়া Carbon Arc Lamp, Mercury Vapour Arc Lamp, ইত্যাদি দীপ কৃত্রিম উপায়ে Ultra-Violet রশ্মি বিকিরণের জন্যে নির্মিত হয়েছে। সুইট্জারল্যাণ্ডে আল্প্স্ পর্বতের উপরে লেঁজা নামক স্থানে স্থাপিত স্যানাটোরিয়ামে বিশেষ কৃতকার্যতার সঙ্গে Dr. Rollier নামক সুইস্-সার্জেন সূর্যালোক দ্বারা অস্থির ক্ষয়রোগের চিকিৎসা করে থাকেন। এই চিকিৎসা-প্রণালীকে বলা হয়ে থাকে "Helio-therapy."

যতদিন ব্যাধি সক্রিয় অবস্থায় থাকে, অনেক রোগীকেই কাসি দ্বারা বড়

বিব্রত হতে হয়। কিন্তু এই কাসিটা বড় ক্ষতিকর। কাসির সঙ্গে সঙ্গে ফুস্‌ফুসের সুস্থ অংশে রোগ ছড়িয়ে পড়বার সুবিধা পায়, কাশতে কাশতে রোগী নিজেকে ভীষণ ভাবে পরিশ্রান্ত ক'রে তোলে, জ্বর বাড়ে, অনেক সময় কাশতে কাশতে শেষে সুরু হয় রক্ত-বমি। কাসিকে কম রাখবার জন্যে যত রকম উপায় সম্ভব তা অবলম্বন করা উচিত। একটু তাল-মিছরির টুকরো, পেপ্‌স্‌ অথবা ইউক্যালিপ্‌টাস-মেন্থলের বড়ি, কোন ঝাঁঝওয়ালা কবরেজী অবলেহ, পিপারমিণ্ট্‌ লজেঞ্জ্‌, বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এরকম যে কোন throat-pill, বচ্‌ বা ঐ রকম যে কোন ঝাল দ্রব্য মুখে রাখা যেতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে এসব ধরনের কোন বড়ি বা সাধারণ কোন পেটেণ্ট কাসির দাওয়াই বা গলায় একটা পেইণ্ট্‌ লাগান অথবা প্রচলিত কোন ওষুধ দিয়ে গলায় "স্প্রে" করা অতি সাময়িক ভাবে কাসির বেগটাকে একটু কমাতে পারে, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত নাকি ফুসফুসের অসুস্থ অংশের প্রকৃত উন্নতি না হয় ততদিন পর্যন্ত এসব দ্বারা সত্যিকারের কোন উপকারই হয় না। তবুও ফুসফুস যাতে আরও জখম না হয় সেজন্যে কাসিকে কম রাখবার চেষ্টা যথাসাধ্য করতে হবে। গলার এবং টন্‌সিলের দোষ থাকলে তা ডাক্তারকে দেখিয়ে একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। অনেক সময়ে দেখা গিয়েছে রোগী অভ্যাসবশে কাশে। গলার কাছে একটুখানি সুড় সুড় ক'রে উঠলেই অমনি খকর খকর ক'রে কখনো কাশতে সুরু ক'রে দেওয়া উচিত নয়। ১০০ টার ভিতর ৬০টা কাসির বেগ রোগী একটু চেষ্টা এবং অভ্যাসের ফলে চাপতে সক্ষম হতে পারে। জোরে কেশে গয়ের তুলতে চেষ্টা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। অধিকাংশ সময়ে স্বাভাবিক ভাবেই গয়ের উপরে উঠে এসে আপনা থেকেই গলার কাছে জমে, তখন গলাটা একটু টেনে অথবা অল্প একটু কেশে সেই গয়েরটা তুলে ফেলতে হবে—কিন্তু "শুকনো কাসিকে" প্রশ্রয় দেওয়া

অসঙ্গত। কি রকম ভাবে শুলে বা বসলে কাসির বেগ বৃদ্ধি পায় বা কমে সেটাও লক্ষ্য করা যেতে পারে।

রোগীর আরেকটি উপসর্গ মুখ-দিয়ে-রক্ত-ওঠা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে রক্ত বন্ধ করবার একমাত্র উপায় শয্যায় সম্পূর্ণ বিশ্রাম এবং মৌনব্রত অবলম্বন। রক্ত ওঠা সুরু হলে একটা হৈ চৈ লাগিয়ে দেওয়া অথবা রোগীকে কোন রকম টানা-হ্যাঁচ্‌ড়া করা নিতান্ত অসঙ্গত। রোগীর যত ভয় এবং উত্তেজনা বাড়বে, যত নড়াচড়া হবে—রক্ত উঠতে থাকবে তত বেশি ক'রে। যে মুহূর্তে কাসির সঙ্গে রক্ত উঠে আসতে আরম্ভ করবে, রোগী বসে থাকুন, দাঁড়িয়ে থাকুন—আর কথাটি না বলে বিছানায় এসে সটান লম্বা হয়ে পড়বেন—আর নিজের মনকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করবেন। সম্পূর্ণ বিশ্রামের কিছুমাত্র ত্রুটি না করলে রক্ত দু তিন দিনের ভিতর আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে—যদিও কখনো কখনো একটু বেশি সময়ও নিতে পারে। বেশি রক্ত ওঠা বন্ধ হবার পরেও কয়েক দিন ধরে থুতুর সঙ্গে একটু একটু রক্ত বা একটু একটু জমাট রক্তের টুক্‌রো বেরুতে পারে, কিন্তু তার জন্যে রোগী যেন ভাবনা না করেন। রক্ত যদি বেশি ওঠে তবে সেই কয়েকদিন শক্ত অথবা গরম কোন জিনিষ খাওয়া বাদ দিতে হবে—ফলের রস বা বরফ দিয়ে দুধ খালি খেতে হবে। থুতুর সঙ্গে রক্তের খালি সামান্য ছিট থাকলে খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ কোন কড়াকড়ি নিষ্প্রয়োজন। বেশি রক্ত ওঠা সম্পূর্ণ বন্ধ হবার পরেও দু তিন সপ্তাহ অবধি ওঠা-বসা বা কোন কারণে বিছানা ত্যাগ করতে চেষ্টা করা কিছুমাত্র নিরাপদ নয়। এই সময়টা বেডপ্যান ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। এবং এর পরেও অনেকদিন পর্যন্ত যে কোনরূপ নড়াচড়া সম্বন্ধে প্রচুর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। রক্ত ওঠা বন্ধ করবার অন্যতম উত্তম উপায় হচ্ছে বুকে Artificial Pneumothorax নামক ইঞ্জেক্‌শান; কিন্তু

দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন কতকগুলি কারণ আছে যার জন্যে সমস্ত রোগীর ক্ষেত্রে এটা কৃতকার্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করা যায় না। তা ছাড়া এ ইঞ্জেক্শান যেখানে সেখানে নেবার সুবিধাও নাই এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছাড়া যে-সে ডাক্তারের হাতে নেওয়া কোন প্রকারেই বাঞ্ছনীয় নয়। (অবিশ্যি বহু ডাক্তার দিতে জানেনও না)। তবে রক্ত যাতে তাড়াতাড়ি জমাট বেঁধে আসে তার জন্যে মাংসপেশীতে বা শিরাভ্যন্তরে নানা রকম ইঞ্জেক্শানের ব্যবস্থা আছে। মুখ দিয়ে খুব বেশি রক্ত উঠবার সময়ে "Alternate Bandaging" হচ্ছে আরেকটি প্রক্রিয়া যা নাকি রক্ত বন্ধ করতে অনেক সময় সহায়তা করে থাকে এবং শরীরের প্রধান যন্ত্র এবং কেন্দ্রগুলিতে রক্ত সরবরাহ রক্ষা করে থাকে। এইভাবে "Alternate Bandaging" করা হয়: প্রথমে কনুয়ের উপর দুটি বাহু খুব জোরেও নয় খুব আস্তেও নয় এইভাবে একটা বেল্ট্ অথবা ফিতে দিয়ে বাঁধা হয় ঘণ্টা খানেকের জন্যে—অথবা রোগী সহ্য করতে পারলে আরও কিছু বেশি সময়ও রাখা যেতে পারে। তারপরে হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে বাঁধতে হয় ঠিক ওই ভাবে উরুদেশ এবং রাখতে হয় ঘণ্টাখানেক (বা তার বেশি)। একটা স্ট্র্যাপ্ দিয়ে (কাপড়ের খণ্ড অথবা রাবারের নলও ব্যবহার করা চলতে পারে) এই রকম করে একবার দুই বাহু একবার দুই উরু—বদলে বদলে বাঁধা চলতে থাকবে যতক্ষণ না রক্ত বন্ধ হয়। রক্ত উঠবার সময়ে রোগীকে কখনো কখনো মাথার নীচেকার সব বালিশ একেবারে সরিয়ে বিছানার উপরে একেবারে চিৎপাত ক'রে শুইয়ে রাখা হয়ে থাকে, অথবা কখনো কখনো তাকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে রাখা হয়ে থাকে: তার মাথা এবং পিঠের তলায় আরো বালিশ দিয়ে তাকে রাখা হয়ে থাকে অর্দ্ধ-এলায়িত অবস্থায়। যে দিকে রোগীর মাথা থাকে খাটের সেই দিকটা পায়ার নীচেয় কাঠ বা ইট দিয়ে একটু তুলেও দেওয়া যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে বুকের চামড়ার

নীচেয় অক্সিজেন ইঞ্জেকশান দ্বারা উপকার পাওয়া গেছে। কোন কোন রোগীর বেলায় Phrenic nerve অপারেশানও করা হয়ে থাকে। বুকের যে দিক থেকে রক্ত ওঠে সেই দিকে বুকের উপর একটা বরফের ব্যাগ রাখা কেউ বলেছেন ভাল কেউ বলেছেন মন্দ। গলার সুড়সুড়ি কমাবার জন্যে মুখে এক আধ টুকরো বরফ চোযা চলতে পারে। তলপেটে গরম জলের বোতল বা ব্যাগ রাখা কার্যকরী হতে পারে। কোষ্ঠ পরিষ্কার যাতে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রোগীর ঘরের হাওয়া-চলাচল অব্যাহত যেন থাকে। ধোঁয়া বা অন্য কোন কিছুর উগ্রগন্ধ রোগীর নাকে প্রবেশ ক'রে কাসির সৃষ্টি না করে তা দেখতে হবে।

রোগী অনেক সময় রক্ত উঠবার সময়ে ভীষণ ঘাবড়ে যায় এবং সময়টিকে মনে করে থাকে একেবারে তার মৃত্যু-মুহূর্ত বলে। কখনো বা একটুখানি রক্ত উঠলেই মনে করে শরীরের সব রক্তই গেল বুঝি বেরিয়ে। রোগী সাধারণতঃ এসব দুর্ঘটনা কাটিয়ে উঠতে পারবে এবং চিকিৎসায়ও তার বেশ উন্নতিই হবে। তবে এইসব রক্ত-কাসি—ইংরাজীতে যাকে বলা হয়েছে "Haemoptysis"—প্রায়ই শ্বাস-নালিকাগুলির ভিতর দিয়ে অসুখকে বেশি ক'রে ছড়িয়ে পড়তে সুবিধা প্রদান করে—যেমন নাকি করে বুকের পুঁজ-স্রাবি ক্ষত থেকে উৎপন্ন প্রচুর যক্ষ্মাজীবাণু-পূর্ণ গয়েরও।

কোন কোন রোগীর বেলায় দেখা যায় যে অসুখের কোন সময়েই তাদের মুখ দিয়ে রক্ত ওঠেনা। এই সব রোগী অথবা তাঁর আত্মীয়েরা অনেক সময় এই ধারণা নিয়ে বসে থাকেন যে যাদের রক্ত ওঠেনা তারাই হচ্ছে "ভাল" রোগী, এবং যাদের রক্ত ওঠে তারা হচ্ছে "খারাপ" রোগী। রোগীর রক্ত উঠেছে কিনা জিজ্ঞেস করলে তাঁরা দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে জানান যে—নাঃ, ওসব "খারাপ" কিচ্ছু হয়নি, এবং এমন প্রশ্নে অনেক সময় অসন্তুষ্টই হন। এ দের জানতে হবে যে, "ভাল" রোগী আর "খারাপ" রোগীর

বিচার এঁদের এই মতামত দিয়ে করা হয় না। অসুখের অতি প্রাথমিক অবস্থাতেও রক্ত উঠতে পারে, অথবা অসুখের অতি খারাপ অবস্থাতেও রক্ত না-ও উঠতে পারে, এবং প্রচুর রক্ত উঠেও অনেক রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যেতে পারে। এবং কোন দিনই রক্ত ওঠে নাই এমন রোগীও দ্রুতবেগেই টেঁসে যেতে পারে। বরং অসুখের প্রথম দিকে একটু আধটু রক্ত উঠলে যেসব রোগী ভয় পেয়ে সাবধান হয়ে যায় এবং নিজের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে তাদের পক্ষে ঐ রক্ত ওঠাটুকু একপক্ষে মঙ্গলজনকই হয়।

কাসি, রক্ত-ওঠা ইত্যাদি ছাড়া রোগীর নানা সময়ে নানা রকম উপসর্গ (প্রবল জ্বর, ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, অনিদ্রা, পেটের গোলযোগ, ঘর্ম ইত্যাদি) আসতে পারে এবং রোগের উপসর্গ ছাড়া চিকিৎসার উপসর্গও আছে অনেক। আবার হয়ত এই একটি ব্যাধির উপসর্গ ছাড়া ভিন্ন ব্যাধির ভিন্ন উপসর্গের আবির্ভাবও ঘটে থাকে অনেক সময়। অভিজ্ঞ চিকিৎসকই অবস্থা ও প্রয়োজনানুযায়ী এ সবের প্রতীকার করতে সচেষ্ট হবেন, এবং রোগীকে শান্তি দেবার জন্যে বা উপসর্গ গুলির প্রাবল্য কমাবার জন্যে ঔষধ পত্রের বা অস্ত্রাদি প্রয়োগের ব্যবস্থা দেবেন। চিকিৎসকের দূরদর্শিতার সঙ্গে শুশ্রূষাকারী বা কারিণীর বিশ্বস্ততা এবং বুদ্ধিমত্তা মিলিত হয়ে পুনরায় তা যদি মিলিত হয় রোগীর নিজের বিবেচনা-শক্তির সঙ্গে, তাহলে তা উত্তম ফলই প্রসব করবে বলে আশা করা যেতে পারে।

যক্ষ্মারোগীর কতকগুলি বিষয় সর্বদা মেনে চলা উচিত। কোন ভারী জিনিষ তুলতে যাওয়া তার কখনো ঠিক নয়। কোন গৃহাভ্যন্তরিক ক্রীড়া বা কোন কাজ বা যে কোন কিছুর উপরে অনেকক্ষণ কুঁজো হয়ে ঝুঁকে থাকা অন্যায়। কাউকে চীৎকার করে ডাকবার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। বিছানার পাশে রোগী একটি Calling Bell (কলিং বেল) রাখতে পারেন, কাউকে ডাকবার জন্যে সেইটে টিপলেই চলবে। অতিরিক্ত

অট্টহাস্য খুবই খারাপ। কারুর সঙ্গে জোরে জোরে কথা বলা অথবা বহুক্ষণ ধরে অবিরাম কথা বলা, গুন-গুনের চেয়ে পর্দা আরেকটু চড়িয়ে মনের আনন্দে অথবা দুঃখে গর্দভ রাগিণীতে গান ধরে দেওয়া ইত্যাদি পরিহার করতে হবে। হঠাৎ লাফ মেরে বিছানা থেকে ওঠা, অথবা ধাঁ করে চোখের নিমেষে ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ান, শরীরকে একটা ঝাঁকানি মেরে কোন কিছুর উপর উঠে বসা, দৌড়ান, দ্রুতগতিতে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা—অথবা শরীরের যে কোন ধরনের অতর্কিত প্রবল আন্দোলন—গুরুতর রকমের হানি করতে পারে। রোগী জামা কাপড় এমন আঁটসাট করে কখনো না পরেন যাতে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হতে পারে বা শুয়ে থাকবার সময়ে অস্বাচ্ছন্দ্যকর হতে পারে। রোগীর পোযাক পরিচ্ছদ থাকবে বেশ ঢিলে রকমের। অনেক রোগীর বদ অভ্যাস আছে—থুতু গিলে ফেলা। এটা যে শুধু একটা নোংরামি তাই নয়, এটা একটা মারাত্মক ব্যাপার। যাদের থুতুতে যক্ষ্মা জীবাণু বর্তমান আছে (এবং ব্যাধির কোন না কোন সময়ে অধিকাংশেরই প্রায় থেকে থাকে), তারা যদি থুতু-গিলে-খাওয়া-রূপ কদভ্যাস অচিরাৎ ত্যাগ করতে না পারে, তবে তাদের পেট যক্ষ্মাক্রান্ত হতে একটুও বিলম্ব ঘটে না। এবং মনে রাখতে হবে অন্ত্রাদির যক্ষ্মা সারানও অতিরিক্ত শক্ত ব্যাপার। যক্ষ্মারোগী যথা সম্ভব চিত হয়ে শুয়ে থাকা অভ্যাস করতে পারেন। অথবা যদি বুকের একটা দিকে অসুখ থাকে, তবে পাশ ফিরে শুতে হলে যে দিকে অসুখ সেই দিকেই পাশ ফিরে শোয়া উচিত। এতে সেই দিককার বিশ্রামটা আরেকটু ভাল ভাবেও হয়, আর সেই দিককার গয়ের বিপরীত দিককার সুস্থ ফুসফুসটিতে ঢুকে সেটিকেও খারাপ করবার সুযোগ পায় না।

থুতু সম্বন্ধে যক্ষ্মা রোগীকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যেখানে সেখানে যেভাবে সেভাবে থুতু ফেলে পরিবারের সুস্থ লোকেদের

আক্রান্ত করা তার পক্ষে মহাপাপ হবে। অবশ্য রোগী কখনই চান না যে তাঁর দ্বারা অপরের কোন ক্ষতি হয়। কিন্তু শুধু চাওয়া নয়, কিসে অপরের ক্ষতি হবে না হবে, সে সম্বন্ধে তাঁর ভাল রকম জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এই কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। আমি পূর্বেই বলেছি—গয়েরটাই হল আসল বিপদ। গয়ের ফেলবার জন্যে রোগীর কাছে সম্পূর্ণ আলাদা একটি পাত্র থাকবে। পাত্রটি ঢাকনা-যুক্ত হওয়া দরকার। টি-বি রোগীর থুতু ফেলবার উপযোগী কাপ্ কিনতে পাওয়া যায়। এই পাত্রের এক তৃতীয়াংশ ফিনাইল-জল বা কার্বলিক লোশান বা লাইসল লোশান (১ পাইন্ট জলে ১ চামচ) বা Izal লোশান (২০০ ভাগ জলে এক ভাগ) দ্বারা পূর্ণ করে তার ভিতরে থুতু ফেলতে হবে। কিছুই না পাওয়া গেলে অগত্যা শুধু জলই রাখতে হবে। প্রতিদিন এই থুতুর পাত্র সাবধানে পরিষ্কার করতে হবে। থুতুর পাত্রটিকে মাঝে মাঝে ফুটন্ত জলে আধঘণ্টা খানেক ধরে সিদ্ধ করে করে নেওয়া ভাল। থুতু সম্বন্ধে এই সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে: মাটিতে গভীর গর্ত করে পুঁতে ফেলা যেতে পারে, অথবা শক্ত কাগজের ঠোঙায় বা একটি পাত্রে ছাই বা কাঠের গুঁড়ো রেখে তার ভিতরে থুতু ফেলে শেষে তা আগুনে পুড়িয়ে ফেলে দেওয়া যেতে পারে। বড় সহরে পাইখানার নর্দামার ভিতরেও থুতু ঢেলে ফেলে কাপ পরিষ্কার করে নেওয়া যেতে পারে। ফ্ল্যাস্ টেনে পাইখানা ধোয়া হলে পরে আবার ফিনাইল-জল ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। যেখান থেকে লোকে পানীয় জল সংগ্রহ করে এমন কোন পুকুরে, বা যেখানে লোকে স্নান করে বা বস্ত্রাদি ধোয় বা বাসন মাজে এমন কোন জলাশয়ে থুতু নিয়ে ঢালা বা থুতুর মগ্ ধোয়া, অথবা যক্ষ্মা রোগীর দ্বারা ব্যবহৃত যে কোন দ্রব্যাদি ধোয়া—একটি জঘন্য অন্যায় ছাড়া আর কিছু নয়। হাতে-টাতে কখনো থুতু জড়িয়ে গেলে সে হাত তৎক্ষণাৎ কোন লোশানে অথবা কার্বলিক-জাতীয়

সাবান দিয়ে উত্তমরূপে ধুয়ে ফেলতে হবে। টি. বি. রোগী যখন কাশবেন, মুখের সামনে একখানা ন্যাকড়া বা কাগজ নিয়ে কাশবেন, পরে সেই ন্যাকড়া বা কাগজ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। রুমালও ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে পরে সেই রুমাল খুব ভাল করে সিদ্ধ করে নিতে হবে। পুরুষ যক্ষ্মারোগীর কখনো দাড়ি, গোঁপ রাখা ঠিক নয়। কাশবার সময়ে দাড়ি গোঁফে থুতুর কণা আটকে থাকে, কখনো বা গয়ের ফেলবার সময়ে দাড়িতে খানিক জড়িয়ে যায়। এ সব শুধু অপরিচ্ছন্নতা নয়—দস্তুর মত বিপজ্জনক। তা ছাড়া তরল খাদ্যদ্রব্যও এসব জিনিষে ঠেকে যায়—যে দৃশ্য অতি বিশ্রী।

যদি হঠাৎ কোনভাবে থুতুর পাত্রটি উল্টে যায় এবং মেজের উপর থুতু ঢেলে পড়ে, তাহলে তৎক্ষণাৎ—মাছি ইত্যাদি বসবার আগে—জায়গাটিকে উত্তমরূপে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। প্রথমে ফিনাইল-যুক্ত ন্যুড়িতে জায়গাটিকে থুতু-মুক্ত করে খানিক মেথিলেটেড স্পিরিট্ ঢেলে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিতে হবে।

রোগীর যদি হাড় বা গ্ল্যাণ্ড্ আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং সে সব স্থান থেকে পূঁজ ইত্যাদি যদি নির্গত হয় তবে এই সব ক্ষত বাঁধবার ব্যাণ্ডেজ্, তুলো ইত্যাদি একেবারে পুড়িয়ে ফেলতে হবে! থুতু হোক, পূঁজ হোক—এগুলি কিছুতেই শুকিয়ে ধূলি হয়ে হাওয়ায় উড়বার সুযোগ না পায়। রোগীর দেহ থেকে নির্গত হবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা অবস্থাতেই ওগুলিকে বিনষ্ট করে ফেলতে হবে। একটি পাত্রে যতক্ষণ এগুলি ভিজে বা কাঁচা অবস্থায় থাকে ততক্ষণ চারিদিকে ছড়াবার বা অন্যের শরীরে প্রবেশ লাভের সুযোগ এদের থাকে না। কিন্তু শুকিয়ে উঠলেই বিপজ্জনক। রুমাল ইত্যাদিতে কখনো থুতু ফেলতে নাই। কারণ থুতু ওতে শুষ্ক হয় এবং ঝাড়া লাগলেই চারিদিকে জীবাণু ছড়ায়।

রোগটা যখন 'টি. বি.'—

যক্ষ্মারোগীর সমস্ত শরীর, বিছানা-পত্র সর্বদা বিশেষভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। ঝাঁট দিয়ে রোগীর ঘরে ধুলো উড়ান ঠিক নয়। ঘরের মেজে, দেওয়ালের নীচের অংশটা প্রত্যেক দিন ফিনাইল বা ব্লিচিং পাউডার মিশান জলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে বেশ করে পুঁছতে হবে। যক্ষ্মারোগীর খাওয়ার বাসনপত্র, সাবান, টুথব্রাশ ইত্যাদি সম্পূর্ণ একটি প্রস্থ একেবারে আলাদা থাকবে—সেগুলি ব্যবহার করবার অধিকার অপর কারুরই থাকবে না। রোগীর ঘরে ছোট ছেলে-পিলেদের আনাগোনা হওয়াটা ঠিক নয়। ঘরের ভিতর অনাবশ্যক জিনিসপত্র কিছু থাকবেনা এবং ঘরটিকে গুদামে পরিণত না করে রাখতে হবে সর্বদা পরিস্কার, ঝরঝরে করে। রোগীর বিছানা-পত্র, কাপড়-চোপড় মাঝে মাঝে রোদে দিতে হবে—এবং দেখতে হবে সেগুলি কখনো কোন ভাবে নোংরা না থাকে। রোগীকে নিয়মিত স্পঞ্জ করিয়ে দেওয়া, মাথা ধোয়ান—ইত্যাদির অন্যথা কখনো না ঘটে। রোগী যদি অত্যন্ত পীড়িত বা দুর্বল না হন তবে ঈষদুষ্ণ জলে বা সহ্য করতে পারলে ঠাণ্ডা জলে চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করে নিয়মিত স্নানও করতে পারেন। এতে উপকার ছাড়া অপকার হবার সম্ভাবনা নাই, তবে দেখতে হবে রোগী স্নান করতে গিয়ে বেশি ঘষা মাজা করতে চেষ্টা করে নিজেকে ক্লান্ত না করে তোলেন। অতিরিক্ত গরম জলে স্নান হানিকর।

রোগীর ঘর মাস তিনেক অন্তর অন্তর চুনকাম করে দেওয়া ভাল। তার জামা কাপড় ধোপা-বাড়ী দেবার আগে বাড়ীতে সিদ্ধ করে বা ৭।৮ ঘণ্টা উজ্জ্বল সূর্যালোকে রেখে বিশোধিত করে দেওয়া উচিত।

রোগীকে খাওয়ার আগে এবং পরে ভাল করে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। হাতের নখ ইত্যাদি যেন বেশ ভাল ভাবে কাটা থাকে। রোগী মুখ ধোবেন গামলা জাতীয় কোন পাত্রে এবং থুতু বা থুতুর পাত্র সম্বন্ধে

যে সব সাবধানতা এবং ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, মুখ ধোয়া জল বা এই জলের গামলা সম্বন্ধেও তাই করতে হবে। অশক্ত অবস্থায় রোগীকে যখন বেড্-প্যান্ ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে তখন সেটাকেও সর্বদা পরিষ্কার রেখে বিশোধক ওষুধে প্রত্যেকবার ব্যবহারের পরেই ধুয়ে ফেলতে হবে। যে জলের মধ্যে একজন যক্ষ্মারোগীর বাসন-পত্র বা কাপড়-চোপড় ধোয়া হয়েছে, বাড়ীর সুস্থ লোকেদের বাসন-পত্র, কাপড়-চোপড় কখনই সে জলে ধোয়া চলবেনা।

রোগীকে যাঁরা দেখাশোনা করবেন, যাঁদের উপর রোগীর সর্ববিধ শুশ্রূষার ভার থাকবে, মনে রাখা দরকার যে, রোগীর নিজের চাইতে তাঁদের দায়িত্ব অনেক সময়ে অনেক বেশি। রোগীর নিজের তো শুয়েই থাকতে হয়, কাজ করবার ভার বেশির ভাগই অপরের উপরে। কাজেই তাঁরা যদি তাঁদের কর্তব্য ভাল ভাবে উপলব্ধি না করতে পারেন অথবা কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন করেন, তবে তার পরিণাম সকলের দিক দিয়েই শোচনীয় হতে পারে।

রোগীর পরিচর্যা যেমন করতে হবে, পরিচর্যাকারী বা কারিণীদের তেমন নিজেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও, রোগীর কোন রকম বিরক্তি উৎপাদন না ক'রে বেশ কৌশল ও বুদ্ধির সঙ্গে সতর্ক হতে হবে—যেন তাঁদের দেহে রোগ-সংক্রমণ না হয়। অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা মাঝে মাঝে নিজেদের শারীরিক অবস্থাটা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়াও তাঁদের পক্ষে ভাল হবে।

পরিবারে কোন যক্ষ্মারোগীর মৃত্যুর পর বা তাকে কোথাও সরিয়ে নেবার পর, এখানে যে নির্দেশগুলি দেওয়া থাকল এগুলি প্রতিপালন করলে ঘরের অবস্থা নিরাপদ হবে এবং পরিবারটির সুস্থ ব্যক্তিদের দেহেও জীবাণু সংক্রমণের আশঙ্কা তিরোহিত হবে। বৃষ্টিতে ধুয়ে যাবার সুবিধা আছে অথবা যে সব জায়গায় বেশ রৌদ্র-কিরণ পড়ে, সেখানে যক্ষ্মাজীবাণু তত

সুবিধা করে উঠতে পারেনা; কিন্তু কোন অসতর্ক রোগীর দ্বারা ব্যবহৃত গৃহ কোণে তাদের ক্ষমতা অসীম। কাজেই রোগী যদি তার থুতু সম্বন্ধে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন না করে থাকে তবে তার ব্যবহৃত ঘরকে উত্তমরূপে সংশোধিত করে নেওয়া অতীব প্রয়োজন।

(১) সব চেয়ে ভাল হচ্ছে, রোগী যে সব জিনিষ-পত্র ব্যবহার করেছিল তা সোজা পুড়িয়ে ফেলে দেওয়া। তবে নিতান্ত অবস্থাগতিকে কারুর যদি সেগুলি ব্যবহার করতেই হয় তবে :

(ক) প্রথমেই বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, তোয়ালে ইত্যাদি সোডা মিশ্রিত গরম জলে খুব মতন সিদ্ধ করে কেচে তার পরে রোদে শুকিয়ে পাঠাতে হবে ধোবির বাড়ীতে। রাগ্, কম্বল—এগুলি গরম জলে প্রচুর সাবান গুলে ভাল করে নিংড়ে ধুয়ে কয়েকদিন ধরে কড়া রোদে রাখতে হবে।

(খ) লেপ, গদি, তোষক, বালিশ এগুলোকে Izal বা Carbolic বা Formalin সলিউশানে ন্যাকড়া ভিজিয়ে বেশ করে মুছে কয়েক দিন ধরে কড়া রোদে ফেলে রাখতে হবে। সূর্যের আলো যক্ষ্মাজীবাণুর মহাশত্রু। ছয় থেকে আট ঘণ্টার ভিতরে প্রখর সূর্যালোকে যক্ষ্মাজীবাণু নিধন প্রাপ্ত হয়। অন্ধকার, স্যাঁত্সেঁতে জায়গায়, কোণা-কানাচে এরা বেঁচে থাকে দীর্ঘকাল—তিন মাস থেকে ছমাস আট মাসেরও বেশি।

কিন্তু রোদে যা-ই রাখা হোক না কেন, দেখতে হবে রোদটা সর্বত্র ঠিকমতন লাগছে কিনা। এক পিঠে লাগল আরেক পিঠে লাগল না, বা ভাঁজে ভাঁজে লাগল না—এরকম হলে চলবেনা। রোদ লাগবার ভিতর ত্রুটি থাকবার কিছুমাত্র সম্ভাবনাও যদি থাকে—তবে সব কিছু হয় বাষ্পীয় যন্ত্রে বিশোধিত করে নিতে হবে, না হয় সোজা পুড়িয়েই ফেলতে হবে—কোন মায়া না করে।

(গ) জামা, কাপড়—রোগী সর্বদা যা ব্যবহার করেছে—এসব একেবারে ষ্ট করে ফেলে দেওয়াই সব চেয়ে মঙ্গলজনক, না হলে যেগুলিকে খুব সিদ্ধ করা যাবে সেগুলিকে তাই করতে হবে এবং ধোপাবাড়ী পাঠাতে হবে, আর পশমী জিনিষ অথবা তুলোর জিনিষ—যেগুলি কেবল সাবান দিয়ে ধোয়া চলে অথবা আদৌ ধোয়া চলেনা, সেগুলিকে প্রখর রোদে এবং খোলা বাতাসে কয়েকদিন ধরে রাখতে হবে। অথবা ভাল কোন ষ্টিমলণ্ড্রীতে পাঠিয়ে দিতে হবে।

(ঘ) খাবার বাসন-পত্র, ছুরি, কাঁটা, চামচ—ইত্যাদিও উত্তমরূপে সিদ্ধ করতে হবে। বাসন-কোসন সিদ্ধ করবার প্রণালী সম্বন্ধে এইটে বলা যেতে পারে: প্লেট, কাপ, গ্লাস বা খাবার জন্যে ব্যবহৃত অন্যান্য দ্রব্য ডেকচি কিংবা অনুরূপ কোন উপযোগী পাত্রে রেখে জল দিয়ে একেবারে পূর্ণ করে দিতে হবে। তারপর ডেকচিটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুল্লীর আগুনের উপর রাখতে হবে। যখন ডেকচির জল গরম হয়ে বুদ্বুদ উঠতে সুরু হল তখন সিদ্ধও সুরু হল বুঝতে হবে। এই অবস্থায় ১৫।২০ মিনিট কাল রেখে ওগুলিকে সিদ্ধ করবার পর ওগুলি জীবাণু-মুক্ত হয়েছে বুঝতে হবে। পিকদানিকেও এই নিয়মেই সিদ্ধ করতে হবে।

যে সমস্ত দ্রব্যের উল্লেখ করা গেল, যেখানে সম্ভব হবে আধুনিক শক্তিশালী যন্ত্রে সেগুলিকে উষ্ণবাষ্প দ্বারা জীবাণুমুক্ত করে নেওয়াই হবে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। রোগীর ব্যবহৃত পাইপ, সিগারেট হোল্ডার, দাঁত-খড়কে, জিব-ছোলা, দাঁতের ব্রাশ—সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে হবে।

(২) টেবিল, চেয়ার, খাট, ইত্যাদি সমস্ত কিছু কার্বলিক অ্যাসিড মিশ্রিত গরম জল, সাবান, ক্লোরিন জল ইত্যাদি দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং রোদে রাখতে হবে। পরে নতুন করে পালিশ করে নিতে হবে।

(৩) ঘরের মেজে, দেয়াল, ইত্যাদি ফিনাইল, গরম সাবান-জল এবং কোন বিশোধক লোশান (যথা Izal বা কম্পাউণ্ড Cresol সলিউশান—জলে ১%) দিয়ে খুব করে ঘষে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং কয়েকদিন যাবৎ ঘরের সমস্ত দরজা জানালা খুলে রেখে রোদ হাওয়া লাগাতে হবে। দেয়ালে নতুন চুনকাম করা দরকার। Sulphur Dioxide অথবা Formalin Vapour দ্বারাও ঘরকে বিশোধিত করে নেওয়া যেতে পারে। ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে মেজের উপর বেশ পুরু করে কয়েকদিন চুন ছড়িয়ে রাখাও ভাল। ঘরের মেজে যদি মেটে হয় তবে মেজের উপরকার মাটি চেঁছে তা পুড়িয়ে ফেলে দেওয়া উচিত। তারপর ঐ মেজে কোন প্রতিষেধক ওষুধ দ্বারা ঘণ্টা ছয়েক ভিজিয়ে রেখে নতুন মাটি দ্বারা পুনরায় নতুন মেজে প্রস্তুত করতে হবে।

ঘরকে জীবাণুমুক্ত করবার জন্যে মিউনিসিপ্যালিটি বা পাব্লিক হেল্‌থ্‌ ডিপার্টমেন্টের সাহায্য নেওয়া ভাল। ঘরের হাওয়ার পোকা খুব মরছে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ঘরে একটু ধুনো জ্বালালেই কাজ হবে না। ঘরকে উপরোক্ত প্রণালীতে শুদ্ধ করার পর ঘরটি ব্যবহার না করে সমস্ত দরজা জানালা খুলে রেখে কয়েকদিন সূর্যালোক প্রবেশ করতে দিলে অবশিষ্ট জীবাণু নষ্ট হয়ে যায়।

যতদিন পর্যন্ত ব্যাধি সক্রিয় অবস্থায় থাকে, ততদিন পর্যন্ত রোগীর পক্ষে শারীরিক শ্রমের কথা ওঠেইনা। রোগী কেবল মাত্র তখনই ধীরে ধীরে একটু একটু করে কিছুটা শ্রমের উপযুক্ত হবে যখন নাকি সমস্ত উপসর্গগুলি একেবারে কমে গিয়ে শরীর বেশ ভাল হয়ে উঠেছে। সাধারণতঃ অন্যান্য উপসর্গগুলি অপেক্ষাকৃত শীগগীরই কমে আসে, কিন্তু নাড়ির একটু দ্রুততা এবং বিকেলের দিকে অল্প একটু জ্বর, এইটে কিছুতেই যেতে চায় না। এই অবস্থায় একটু ধৈর্য ধরে বিশ্রামই চালিয়ে যেতে হবে। থুতু জীবাণুমুক্ত

হওয়া সম্পূর্ণরূপে বাঞ্ছনীয় এবং রক্ত পরীক্ষার ফলও সন্তোষজনক হওয়া দরকার। অসুখ ক্রমেই বেশ কমের দিকে চলেছে, পুনঃ পুনঃ X-ray পরীক্ষা দ্বারা এটাও দেখবার দরকার। তাড়াহুড়ো করে ব্যায়াম করতে গিয়ে বহুদিনের চেষ্টায় ভাল-হয়ে-আসা অবস্থাটিকে রোগী মুহূর্তে নষ্ট করে ফেলেছে এর অনেক উদাহরণ আছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে দীর্ঘদিন বিশ্রাম নেওয়া রোগীর পক্ষে বড়ই অস্বস্তিকর হতে পারে ; কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে এটা সহ্য করতেই হবে। কারণ রোগের অবস্থায় শ্রমের চেষ্টা করলে কবরের দিকেই শুধু এগিয়ে যাওয়া হবে। রোগীর এমন ধারণা মনে পোষণ করা উচিত নয় যে যত বেশি ফূর্তিবাজ হয়ে লাফালাফি হৈ রৈ করা যাবে, ততই রোগটা আসবে কাবু হয়ে। প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ বিশ্রামই একমাত্র অস্ত্র যা তীব্রভাবে প্রয়োগ করতে হবে এই দুরন্ত শত্রুর অঙ্গে। রোগী হয়ত এমন গল্প—নিজে-দিগকে বিশেষ পণ্ডিত বলে মনে করে—এমন আত্মীয় বা বন্ধুর মুখে শুনতে পারে, বা কোন দায়িত্বজ্ঞানহীন লেখকের লেখায় পড়তে পারে, যে, অমুকের টি. বি. রোগ ঘোড়ায় চড়েই ভাল হয়ে গিয়েছে বা অমুক টি. বি.-গ্রস্ত হয়েও "যা-খুশি-তাই" করে বেড়াচ্ছে—টি. বি. তার কিছুই করতে পারছেনা। কিন্তু রোগী যেন মনে রাখে যে, ঐ সব করে ঘটনাচক্রে একটি রোগী যদি কোথাও বেঁচেও থেকে থাকে কোন গতিকে, সেখানে লক্ষটি রোগীর ঐ ভাবে হয় প্রাণান্ত, এবং সারবার চাইতে গুরুতর বিপদ মুহূর্তে ডেকে আনবার সম্ভাবনা এসব দৌড়-ঝাঁপের ভিতরে এ রোগীর পক্ষে হাজার হাজার গুণ বেশি।

যখন নাড়ি, টেম্পারেচার ইত্যাদির অবস্থা বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় এসে দাঁড়াবে এবং শারীরিক অন্যান্য অবস্থাও সন্তোষজনক হবে, তখন প্রথমে সুরু করতে হবে বারান্দায় চেয়ারে ঘণ্টাখানেক করে সকালে বাইরে এসে বসা থেকে। পাঁচ সাত দিন বসবার পরে পাল্‌স্‌ এবং টেম্পারেচার যদি না বাড়ে

তবে সময়টা ক্রমে বাড়িয়ে ঘণ্টা দুই করতে হবে এবং ক্রমে বিকেলের দিকেও বসা অভ্যাস করতে হবে। এতে যদি কোন ক্ষতি না হয়, তবে ধীরে ধীরে করতে হবে হাঁটবার চেষ্টা। প্রথমে এক ফার্লং, (৮ ফার্লং-এ এক মাইল হয়), তার পরে দুই ফার্লং, তার পরে তিন ফার্লং—১০।১২ দিন বা ১৫ দিন অন্তর অন্তর এইভাবে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে বাড়িয়ে এক, দুই, বা তিন মাইলও অবস্থানুযায়ী হাঁটা চলবে। এক ফার্লং এর জায়গায় আধ ফার্লং করে করেও বাড়ান যেতে পারে। হাঁটাটা দূরত্ব দ্বারা নিয়মিত না করে সময় দ্বারাও করা যেতে পারে। যেমন প্রথম কিছুদিন হাঁটা গেল পাঁচ মিনিট করে। তার পরে দশ মিনিট। তার পরে পনের। এইরকম করে করে আধ, এক, দেড় বা দুই ঘণ্টা অবধি ক্রমে শরীরের অবস্থা বুঝে বাড়াতে হবে। এই সময়টাতে লক্ষ্য রাখতে হবে হাঁটবার সময়ে কোনরকম ক্লান্তি বোধ বা শ্বাস কষ্ট হয় কিনা, এবং হেঁটে আসবার পরেই টেম্পারেচার এবং পাল্স্ যদি একটু বেড়ে থাকে তবে ২০।২৫ মিনিট সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরেই তা স্বাভাবিক অবস্থায় নেমে আসে কিনা। অসুখ যদি ভাল ভাবে নিস্তেজ হয়ে থাকে তবে অল্প একটু আধটু চলা-ফেরা বা পরিশ্রমের পরে পাল্স্ বা টেম্পারেচার তেমন বিশেষ কিছু আর বাড়ে না। যখনই বেড়ানর ফলে 'পাল্স্' বা 'টেম্পারেচার' বাড়তে দেখা যাবে—তখনই আবার পূর্ণ বিশ্রাম করতে হবে কয়েকদিনের জন্যে। আবার যখন বেড়ান সুরু হবে তখন আরম্ভ করতে হবে গোড়া থেকে অর্থাৎ বারাণ্ডায় বসা থেকে। রোগীর কখনো জোরে জোরে হাঁটা উচিত নয়। কোন অবসর-প্রাপ্ত সরকারী চাকুরিয়াকে ছড়ি হাতে করে সকাল বা সন্ধ্যের দিকে কোন পার্কে টার্কে বেড়াতে কি রোগী কখনো দেখেছেন? ঐ রকম ভাবে হাঁটতে হবে আর কি! দৌড়ান তো ভুলেও চলবে না। প্রথম প্রথম সমতল ভূমিতেই হাঁটবার অভ্যাস করতে হবে। বেশি উঁচু সিঁড়িতে ওঠা-নামা বা শরীরের আরও ভাল অবস্থায় পাহাড়ের

উঁচু-নীচু রাস্তায় ভ্রমণ—ইত্যাদি সবই রয়ে-সয়ে—ধাপে ধাপে করতে হবে। রোগীর পক্ষে প্রশস্ত পাদচারণা-রূপ ব্যায়াম গ্রহণ করবার উপযুক্ত সময় হচ্ছে সকাল, এবং অভ্যাস হয়ে যাবার পরে তার সঙ্গে বিকাল। কিন্তু দুপুর রোদে বেরুন একেবারে ভুল। ছুটোপুটি না করে যত নিয়ম মতন ব্যায়ামটি গ্রহণ করা যাবে, ততই জ্বর প্রভৃতি উপসর্গের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা কম থাকবে। ব্যস্তবাগীশ হতে গেলেই পস্তাতে হবে। (একটা কথা এখানে বলে রাখা ভাল। এই রোগের চিকিৎসায় বিশ্রাম এবং উপযুক্ত সময়ে সুনিয়ন্ত্রিত ব্যায়াম—উভয়েরই প্রয়োজন। চিরকালই কেবলমাত্র শুয়ে কাটাতে হবে তা নয়, এবং চিকিৎসকের বিচার অনুযায়ী উপযুক্ত অবস্থায় ব্যায়াম গ্রহণ না করাটাও ক্ষতিকর। বিশ্রাম এবং ব্যায়ামের সাম্য দ্বারাই দেহকে ক্রমান্বয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা হয়ে থাকে। তবে ব্যায়ামের সীমা এবং প্রকৃতি বিভিন্ন রোগীর পক্ষে বিভিন্ন। বিশ্রামের অবস্থা থেকে রোগীকে ক্রম-ব্যায়াম দ্বারা কর্ম্মঠ করে তুলবার ভিতরে চিকিৎসার একটি বিশেষ সার্থকতা নিহিত রয়েছে, এবং যথাকালে "ক্রম-ব্যায়াম" চিকিৎসার একটি অঙ্গ বিশেষ। এই রোগের এক অবস্থায় যেমন সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রম-ব্যায়ামেরও তেমনই প্রয়োজন। কাজেই রোগী এটা যেন মনে রাখেন যে, যখন চিকিৎসক তাঁকে ধীরে ধীরে চলা-ফেরা অভ্যাস করতে বলেছেন তখন তিনি অতি-সতর্ক হতে গিয়ে তার ক্রটি করে চিকিৎসার বিশেষরূপ অঙ্গ হানি না করে বসেন। বিশ্রাম দ্বারা রোগীর জড়তা সম্পাদন এবং তাকে নতুন কোন উপসর্গ-প্রবণ করে তোলা চিকিৎসার উদ্দেশ্য নয়।)

প্রকৃতপক্ষে কার যে কতদিন অবধি বিশ্রাম নিতে হবে এবং কে যে কতখানি পরিশ্রম সহ্য করতে পারবে—তা বুকের অবস্থা এবং উন্নতির অনুপাতই নির্দেশ করে দেবে। ব্যাধি যদি বেশি দূর এগিয়ে না থাকে এবং

উপসর্গগুলি যদি চট্ করে কমে আসে, তবে হাঁটা-চলাটা সেই অনুপাতেই শীগ্গীর সুরু করা যায়। হয়ত চিকিৎসা সুরু হবার পরে দু চার মাস বা পাঁচ ছয় মাসের ভিতরেই এটা সম্ভব হবে। কিন্তু বুকের অবস্থা যদি অন্য রকম হয় এবং চিকিৎসায় দ্রুত সাড়া না পাওয়া যায় তবে এক বছর, দুবছর অবধিও বিছানায় পড়ে থাকতে হতে পারে। চিকিৎসা অন্তে কেউ কেউ বা ক্রমান্বয়ে বেশ কঠিন পরিশ্রমের উপযুক্ত হয়ে ওঠেন, আবার কারুর কারুর বা পরিশ্রমের কাজ বিশেষ কিছুই তেমন আর চলে না—যতদিন বাঁচা যায় কোন মতে টিপে টিপে কাটিয়ে দিতে হয়।

হাঁটা চলা করবার অবস্থাতে এলেও রোগী যেন ভুলেও না মনে করেন যে তিনি সারাদিনই যা খুশি তাই করতে পারেন, বিছানার সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে। বিছানার সঙ্গেই যক্ষ্মারোগীর সব চেয়ে নিকট এবং আজীবনের সম্পর্ক। রোগী বিপজ্জনক অবস্থা অতিক্রম করে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকলেও দিনের ভিতর খানিকটা সময় তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতেই হবে। এক হচ্ছে, হেঁটে ঠিক ফিরে আসবার পরেই আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা। এই সময়টা রোগী খবরের কাগজ, বই পড়া অথবা কারুর সঙ্গে হাসি-গল্প-করা-রূপ "বিশ্রাম" না নেন। বিশ্রাম মানে শরীর মন সব এলিয়ে দিয়ে বিছানার ওপর চোখ বুজে পড়ে থাকা। তারপরে আরেকটি বিশ্রামের সময় হচ্ছে খাওয়ার আগে—অবস্থা বুঝে আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা। অনেক সময়ে খাওয়ার পরে অনেক রোগীর টেম্পারেচার অনেক বেড়ে যায়, পাল্স্ বেড়ে যায়, মুখ চোখ কান গরম হয়ে ওঠে। খাওয়ার আগে বিশ্রাম নিলে এ সব দ্বারা উপদ্রুত হবার সম্ভাবনা কমে যায়। আর একটি কথা, বেড়িয়ে এসেই অথবা অন্য যে কোন ভাবে পরিশ্রান্ত হয়ে অমনি খেতে বসার চেষ্টা রোগী যেন ভুলেও না করেন। ভাত, তরকারি ঠাণ্ডা হয়ে যাক—তবুও সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে ক্লান্তিটাকে দূর না করে যেন টি-বি রোগী কখনই খেতে চেষ্টা না করেন।

তারপরে আরেকটি "সম্পূর্ণ বিশ্রামে"র সময় হচ্ছে খাওয়ার ঠিক পরেই। দুপুর বেলাকার খাওয়া শেষ করে অবস্থা বিশেষে এক থেকে তিন ঘণ্টা চুপ-চাপ শুয়ে থাকতে হবে। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবার পরেও দুপুরে খাওয়ার পরে খানিকটা সময় বিশ্রামের অবহেলা রোগী দীর্ঘকাল অবধি করতে পাবেন না। তারপরে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরেও খানিকক্ষণ বিশ্রামের দরকার।

রোগীর অনেক সময়ে একটা সমস্যা উপস্থিত হয় এই নিয়ে, যে, চিকিৎসার জন্যে বাড়ীতেই থাকা উচিত, না-কি, কোন স্যানাটোরিয়ামেই যাওয়া উচিত। প্রকৃত পক্ষে প্রথম দিকে যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা স্যানাটোরিয়ামে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দুঃখের বিষয় স্যানাটোরিয়ামের ব্যবস্থা এবং চিকিৎসা-প্রণালী সম্বন্ধে সাধারণ লোকের, এমন কি অনেক চিকিৎসকেরও নানারূপ অজ্ঞতা আছে। স্যানাটোরিয়াম সম্বন্ধে সঠিক খবর রাখা সকলের পক্ষেই প্রয়োজন।

প্রথমতঃ স্যানাটোরিয়ামের চিকিৎসা প্রণালী। টি-বির চিকিৎসায় "বিশ্রামে"র মূল্য সম্বন্ধে আমি বিশেষভাবে বলেছি। সত্যি কথা বলতে কি, খালি বিছানায় শুয়ে থাকলেই যে বুকের সম্পূর্ণ বিশ্রাম সব সময়ে হয় তা নয়। যখনই রোগী কাশেন বা কথা বলেন বা হাসেন বা উঠে বসেন—তখনই ফুসফুসের কিছু না কিছু পরিশ্রম হয়। আর, এগুলো সম্পূর্ণরূপে এড়াতে পারাও নিতান্ত কঠিন। তা ছাড়া শ্বাস-প্রশ্বাসটাই ফুসফুসের পক্ষে একটা পরিশ্রম। শুয়ে থাকবার ফলে আংশিক বিশ্রাম যা হয়, তা রোগের উপশমের পক্ষে সবসময়ে পর্যাপ্ত নয়। কখনো হয়ত উপকার হতে অত্যন্ত দীর্ঘ সময়ের দরকার হয়, কখনো কখনো বিশেষ কিছুই কাজ হয় না—বিশেষ করে ফুস্‌ফুসে যখন "Cavity"র সৃষ্টি হয়েছে। ("ক্যাভিটি" হচ্ছে ফুস্‌ফুসের ভিতরে গর্তের অবস্থা।

ফুস্‌ফুসে ব্যাধিজনিত ক্ষতস্থান থেকে গয়ের, পুঁজ ইত্যাদি বেরুতে বেরুতে ক্রমে এই গর্তের সৃষ্টি হয়। যক্ষ্মাজীবাণু ফুস্‌ফুসের উপাদানের ধ্বংস সাধন করে এবং এইগুলি রূপান্তরিত অবস্থায় ঘন গয়েরের সঙ্গে শ্বাসনালীর ভিতর দিযে বেরিয়ে আসে—ফুস্‌ফুসের ভিতর ছোট থেকে ক্রমান্বয়ে বড় "Cavity" উৎপাদন ক'রে।) কিন্তু স্যানাটোরিয়ামে আধুনিক পদ্ধতিতে বিশেষ অস্ত্রচিকিৎসা বা অন্য এমন সব উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে, যা দ্বারা রোগী অধিকতর উপকৃত হতে পারেন এবং যার সুফল শীগ্‌গীরই প্রকাশ পায়। কোন একটা উপসর্গ প্রবল হয়ে উঠলে তাকে যথাসম্ভব সত্বর প্রশমিত করবার আয়োজন স্যানাটোরিয়ামে সর্বদাই থাকে এবং হাতের কাছে বিচক্ষণ চিকিৎসককে সর্বদা পাবার দরুন রোগীর মনে যথেষ্ট সাহস থাকে। নানা বিষয় বিবেচনা করলে দেখা যায় যে এই ব্যাধির আধুনিক উন্নত চিকিৎসাপদ্ধতির সর্ববিধ সুবিধা পাওয়া একজন রোগীর পক্ষে একমাত্র স্যানাটোরিয়ামেই সম্ভব। ইঞ্জেক্‌শানে এবং অপারেশানে এই চিকিৎসাগুলির ব্যবস্থা অধিকাংশই এমন, যেগুলি চলবার সময়ে সর্বদা ডাক্তারের চোখে চোখে থাকবার দরকার হয় এবং অনেক সময় এমন সব উপদ্রব এসে উপস্থিত হয়, যার প্রতিকার অবিলম্বে হওয়া দরকার। মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র রোগীর পক্ষে বাইরে থেকে এসব কদাচিৎ সম্ভব হয় এবং রোগী নিজের অবস্থা বিপজ্জনক করে তোলে। তারপরে রোগীকে স্যানাটোরিয়ামে আবশ্যকমত এত বার এত উপায়ে পরীক্ষা করা হয় এবং তার চিকিৎসা এবং আরোগ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়—যেসবের ব্যবস্থা অনেক রোগীর পক্ষেই বাড়ীতে থেকে করা অসম্ভব। রোগীর বিশ্রামের অবস্থা থেকে শ্রমের অবস্থায় ফিরে যাবার কথা বলা হয়েছে। আমি যা কিছু বলেছি, একটা মোটামুটি ধারণা দেবার জন্যেই। কিন্তু বিশ্রামের অবস্থা থেকে পরিশ্রম সুরু করবার সময়ে রোগীর দায়িত্ব যে কতখানি,

কত সতর্কতার সঙ্গে যে তাকে অগ্রসর হতে হবে, তা বুঝিয়ে বলবার নয়। বুকের অবস্থার উপরেই সব কিছু নির্ভর করে এবং রোগী কিছুই জানতে পারে না যে, তার বুকের অবস্থা কি রকম—এমন কি বাইরের সমস্ত লক্ষণ যথেষ্ট ভাল থাকলেও হঠাৎ একদিন গিয়ে একজন ডাক্তারকে দিয়ে বুক পরীক্ষা করিয়ে এলেও কিছুমাত্র সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। স্যানাটোরিয়ামের চিকিৎসক দীর্ঘদিন রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে যে ব্যবস্থা দিতে সক্ষম হন, সেটাই একমাত্র নিরাপদ ব্যবস্থা।

দ্বিতীয়তঃ, রোগীর পরিচর্যা। সত্যি কথা বলতে গেলে, এই রোগ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের অজ্ঞতা এত বেশি যে তা বলবার নয় এবং এই অজ্ঞতার ফলে রোগীর উপযুক্ত চিকিৎসা বাড়ীতে হওয়া সম্ভব কিনা সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। যাঁদের হাতে এই রোগীর সেবার ভার থাকে, তাঁদের দুইটি কর্তব্য: একটি—রোগীকে সুস্থ করে তুলবার চেষ্টা এবং আর একটি—পরিবারের অপর সবাইকে নিরাপদ রাখবার চেষ্টা। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই দেখা গিয়েছে যে, এই দুটোর কোনটাই বাড়ীতে সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয় না। নানা মুনি আসেন নানা মত দিতে, রোগীকে নিয়ে চলে ছেলেখেলা। রোগের গুরুত্ব পারেন না কেউ সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে, রোগীর প্রতি চলে বহু অবিচার এবং একভাবে নয়, নানাভাবে রোগীর উন্নতির মূলে করা হয় কুঠারাঘাত—শুধু এই বহুবিধ অজ্ঞতার ফলে। এবং কেবল যে দরিদ্র রোগীদের ক্ষেত্রেই এটা ঘটে থাকে তা নয়, বহু সময়ে সঙ্গতিসম্পন্নের ক্ষেত্রেও।

তৃতীয়তঃ, একটি স্যানাটোরিয়ামে রোগীর অনেক কিছু শিখবার, জানবার, বুঝবার আছে যা নাকি তাকে ভবিষ্যতে নিজেকে সাবধানে রাখতে এবং অপরকে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করতে সাহায্য করে। এই রোগটা একটি দিন, দুটি দিন, দুটি মাস অথবা ছ'টি মাসের ব্যাপার নয়। অনেক

সময় একটি লোকের সমস্ত জীবনটাই ওলট্-পালট্ হয়ে যায় এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হবার পরে। এই রোগের এমনই মজা যে, নিজেকে সুস্থ 'করা' বহু কষ্টে যদি বা সম্ভব হয়, তার চেয়ে আরও কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় নিজেকে সুস্থ 'রাখা'। একবার এই ব্যাধিগ্রস্ত হবার পরে ভবিষ্যৎ জীবনের অনেকখানি অংশকে, এমন কি কোন কোন সময়ে সমস্ত ভবিষ্যৎকেই নতুন করে গড়ে তুলবার প্রয়োজন হয়। জীবনকে এইভাবে নিয়ন্ত্রিত করবার সম্পূর্ণ শিক্ষা স্যানাটোরিয়াম-বাসের অভিজ্ঞতা থেকেই ভাল ভাবে হতে পারে—বাইরে থেকে এক আধজনের মুখে একটু শুনে এটি হয় না।

চতুর্থতঃ, স্যানাটোরিয়ামে একজন টি. বি. রোগী এমন বহু রোগীর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পায়, যারা অত্যন্ত খারাপ অবস্থা নিয়ে এসে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। এদের দেখে রোগী নিজে উৎসাহ পায়। আর, অনেক রোগীকে তার নজরে পড়ে যাদের শারীরিক বা অন্য কষ্ট তারই মতন, বা তার চাইতেও অনেক বেশি। এটাতে সে অনেক সময় নিজের দুঃখ ভুলবার সুযোগ পায়। বাড়ীতে থাকবার সময়ে রোগী দেখতে পায় যে, সে বাদে আর সবাই সুস্থ এবং সবাই বেশ ফূর্তি আর আমোদে রয়েছে। এটা তার মনে একটা প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। স্যানাটোরিয়ামে তার মত বহু লোকেই যে কড়াকড়ির ভিতরে থাকে, সেই কড়াকড়ি মেনে চলা তার মনের উপরে খুব বিরুদ্ধ ক্রিয়া করে না এবং রোগী নিজের খেয়াল মত যা খুশি তাই করবার সুযোগ না পেয়ে ধীরে ধীরে এবং অবাধে আরোগ্যের পথে চলতে থাকে। তার কোনরকম অধৈর্য এবং উচ্ছৃঙ্খলতাই এখানে প্রশ্রয় পাবে না—সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবার একটা ভীষণ প্রতিযোগিতার মাঝখানে।

অবশ্য আমাদের দেশের স্যানাটোরিয়ামের দোষ ত্রুটি যে কিছুই নাই,একথা নিশ্চয়ই সত্য নয়। এদেশের স্যানাটোরিয়াম হাঁসপাতালে যে অনেক সময়

অনেক অসুবিধা সহ্য করতে হয়, একথা আমি স্বীকার করি। অনেক সময়ে অনেক ব্যাপারে কোন কোন অবিবেচক ডাক্তারের অনেক রকম মন্তব্য রোগীকে পীড়িত করে, কোন কোন কর্তব্য-জ্ঞানহীন নার্স বা ওয়ার্ড-অ্যাসিস্ট্যান্টের অনেক দুর্ব্যবহার, অবহেলা, ঔদাসীন্য বা রূঢ়তা তার মনকে তিক্ত করে তোলে—এ-ও আমি স্বীকার করি। বিশেষ করে আরেকটি কথা, স্যানাটোরিয়ামের রান্নাটা অনেকেই তেমন রুচির সঙ্গে খেতে পারে না এবং খাওয়া নিয়ে যে অভিযোগ লেগে থাকে প্রায়ই, তাও আমি জানি। তা ছাড়া কারুর কারুর কাছে আরও হয়ত ছোট-খাট অসুবিধা থাকে, ছোট-খাট আরামের অভাব থাকে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও স্যানা-টোরিয়াম সম্বন্ধে চট্ করে কোন বিরুদ্ধ কথা বলতে আমি একটু কুণ্ঠিত হই, কারণ এ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন যে বাইরে স্যানাটোরিয়ামের মতন ব্যবস্থা করে নিজের চিকিৎসা চালান বড় সহজ কথা নয়। স্যানা-টোরিয়ামের বাইরে রোগীর বিড়ম্বনা ঘটতে পারে আরও বেশি। অবিশ্যি একথা আমি সর্বদাই স্বীকার করব যে, কোন স্যানাটোরিয়াম হাঁসপাতালে রোগীদের প্রতি কারুরই কোনরকম অকারণ দুর্ব্যবহার, কোনরকম অমনোযোগিতা, কোনরকম কর্তব্যে শিথিলতা কিছুতেই ক্ষমার্হ নয় এবং স্বীকার করব যে আমাদের দেশের অধিকাংশ, অধিকাংশ কেন—সবগুলি স্যানাটোরিয়াম হাঁসপাতালই এখনও যথেষ্ট সংস্কারের অপেক্ষা রাখে এবং এ-ও অস্বীকার করব না যে এদেশে এগুলির পরিচালকদের ভিতরে এখনও বহু সততা, আন্তরিকতা এবং সহৃদয়তার প্রয়োজন একান্তভাবেই আছে। তবে এক ধরনের লোক আছে যাদের অতি তুচ্ছ কতকগুলি বিষয় নিয়ে খুঁত ধরা এবং অভিযোগ করাই স্বভাব এবং এসব রোগীর নিজেদের চরিত্রে অন্যান্য এমন কতকগুলি ত্রুটিও আছে যেগুলির জন্যে স্যানাটোরিয়াম বা হাঁসপাতালের কর্তৃপক্ষ তাদের উপর বিরক্ত না হয়ে পারেন না।

রোগটা যখন 'টি. বি.'—

যাঁরা সঙ্গতি-সম্পন্ন, তাঁরা স্যানাটোরিয়ামে প্রচুর বিলাসিতা করতে পারেন। দু একজন আত্মীয়, বন্ধুও সঙ্গে নিতে পারেন, নিজেরা নিজেদের চাকর-বাকর বা নার্স রাখতে পারেন, নিজেদের খাওয়ার বন্দোবস্ত নিজেরা করতে পারেন, সময় কাটাবার জন্যে নিজেদের গ্রামোফোন, নিজেদের রেডিয়ো বা অন্য কিছু রাখতে পারেন। প্রায় সব স্যানাটোরিয়ামেই নানা-রকম শ্রেণীবিভাগ আছে, যিনি যে ক্লাসে যত ইচ্ছা খরচা করে থাকতে পারেন। দরিদ্র যে, তার অসুবিধা এদেশে সর্বত্রই ; এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

যাই হোক, প্রথমটা স্যানাটোরিয়ামে থাকাই বহু রোগীর পক্ষে যে সর্বতোভাবে সুবিধা এবং মঙ্গলজনক এ মত প্রকাশ করা আমি বিশেষ বিবেচনা করে সব দিক থেকেই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। লেখাপড়া শেখবার ব্যাপারেও যেমন বাড়ীতে থেকে পড়বার চাইতে স্কুল, কলেজে ভর্তি হওয়াই বহু রকমে ভাল ও সুবিধাজনক, টি. বি. রোগে স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসাটাও সেই রকম আর কি। স্যানাটোরিয়ামে রোগীর অনেকখানি দায়িত্ব থাকে উপযুক্ত লোকের হাতে এবং দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার প্রণালী গুলি নিয়েও রোগীর নিজের মাথা ঘামিয়ে মরতে হয় না। সাংসারিক গোলমাল থেকে দূরে থেকে তার মনও অনেকটা বিশ্রাম পায়। অনেকের পক্ষে প্রিয়জনের কাছ থেকে দূরে সরে থাকবার একটা বেদনা আছে, কিন্তু পরিবারের শিশু এবং অন্যান্য সবাইকে নিরাপদে রেখে রোগী যে অন্যত্র নিজেকে সুস্থ করে তুলবার প্রচেষ্টায় রয়েছেন এ চেতনা দ্বারা রোগীর খুশি থাকা উচিত এবং তার আত্মীয় বন্ধুদেরও। রোগীর উপরেই পরিবারের ভরণ-পোষণ বা অন্যান্য ব্যবস্থা নির্ভর করত এরকমটা যদি হয়, তবে রোগীর অনুপস্থিতির দরুন সংসারে বিশৃঙ্খলা ঘটা বিচিত্র নয় ; কিন্তু এটা শুধু সাময়িক। আশা করে থাকতে হবে রোগী ভাল হয়ে ফিরে এসে আবার

সবার কথা ভাববেন। রোগী এবং তাঁর পরিবারের লোকের মনে রাখা উচিত এই পৃথিবীতে কেউই "indispensable" (অপরিহার্য) নয়—একজন বাদ গেলেও সংসারে চলে যাবার ব্যবস্থা হয়ে থাকে!

কোন কোন রোগী হয়ত স্যানাটোরিয়াম-জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে কিছুতেই সক্ষম হয় না, কিন্তু এটা সত্যি কথা যে অসংখ্য রোগীই এই বলে আক্ষেপ করে যে একেবারে ষোল আনা সুস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত কেন তারা স্যানাটোরিয়ামে থাকবার সুযোগ পাচ্ছেনা!

তবে এখানে একটি বিষয় বলবার আছে। অনেক সময়ে অন্যান্য রোগীর যন্ত্রণা বা মৃত্যুই অনেকের মনের উপর বেশি ক্রিয়া করে; যারা ভাল হয়ে যায় তাদের তারা গণনার মধ্যে আনেনা বা তাদের দিকে তাকিয়ে সাহস পায়না। স্যানাটোরিয়ামে রাখবার ফলে যে সব রোগীর এই সব কারণে মানসিক ক্রিয়া অত্যন্ত খারাপ হবার সম্ভাবনা আছে এবং এসবের বিভীষিকা যদি রোগীর পক্ষে মারাত্মক হয়ে ওঠে, তা হলে সেই সব "নার্ভাস্" রোগীকে স্যানাটোরিয়ামে স্থানান্তরিত করা প্রকৃতপক্ষে সঙ্গত কিনা এটা ভাববার বিষয়। তবে এ ধরনের রোগীর সংখ্যা খুবই কম এটা বলা বাহুল্য। স্বতন্ত্র ভাবে থাকতে পারে বলে "কটেজ" বা "ক্যাবিনের" রোগীরা "জেনারেল ওয়ার্ডের" রোগীদের চাইতে এ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি সৌভাগ্যবান। কিন্তু স্বতন্ত্র ভাবে থাকবার সুবন্দোবস্ত রোগীর আর্থিক অবস্থার উপরেই শুধু নির্ভর করে।

স্যানাটোরিয়ামে যেসব রোগী চিকিৎসিত হয় তাদের কারুর কারুর মধ্যে একটা প্রধান ত্রুটি অনেক সময় পরিলক্ষিত হয়—তারা বড় "Tuberculosis-minded" হয়ে যায়। *টি*-বির গল্পই তাদের ভিতর বড্ড বেশি চলে, এবং *টি*-বির ব্যাপারগুলোই তাদের অন্যান্য সব চিন্তা বা কল্পনাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে রাখে। *টি*-বি ছাড়া তাদের কাছে আর যেন কোন সমস্যা

থাকেনা এবং বাইরের লোকের কাছেও অনেক সময় একটু বিরক্তিজনক ভাবে তারা টি-বির আলোচনা করে। অবিশ্যি সব্বাই-ই যে এরকম হয় তাও ঠিক নয়। যাই হোক, কোন রকম ব্যবস্থাই একেবারে ষোল আনা নিখুঁত কখনো হয় না এবং দোষ এবং গুণ অবিমিশ্র ভাবে কোন অনুষ্ঠানের ভিতর থাকতে পারেনা। কাজেই এগুলি উপেক্ষার যোগ্য। তা ছাড়া দীর্ঘকাল ব্যাপী একটি উৎকট ব্যাধির নিরবচ্ছিন্ন চেতনা এবং অভিজ্ঞতা এসব রোগীদের মনটাকে যে খানিকটা এই ধরনের করে দেবে এটা খুবই স্বাভাবিক এবং এর জন্যে তাদের দোষও দেওয়া চলেনা সব সময়।

পূর্বকালে টি. বি. রোগের চিকিৎসা-প্রণালী যেমন ছিল অদ্ভুত, তেমন বিপজ্জনক। ধমনী বা শিরা থেকে রক্ত-মোক্ষণের ব্যবস্থা অতি সচরাচর করা হত; ব্যবস্থা করা হত হরেক রকম বাজে ওষুধের; অনেকগুলি রোগীকে একত্র করে রেখে দেওয়া হত গরম ঘরের ভিতরে, ইত্যাদি।

একশ বছর আগে George Boddington টি. বি.র চিকিৎসায় বিশ্রাম এবং মুক্ত বায়ুর বিষয় সর্বপ্রথম প্রচার করেন, কিন্তু তাঁর মতামত সম্বন্ধে এত বিরুদ্ধ সমালোচনা হয় যে, তিনি অতিমাত্রায় নিরুৎসাহ হয়ে ইংল্যাণ্ডে Sutton Coldfieldএ তাঁর নিজের স্থাপিত হাঁসপাতাল নিজেই তুলে দিয়ে সেটিকে পরিণত করলেন একটি পাগলা হাঁসপাতালে। কিন্তু এর পনের বিশ বছর পরে জার্মান চিকিৎসক Hermann Brehmer দক্ষিণ জার্মেনীতে একটি স্যানাটোরিয়াম স্থাপিত করে বিশ্রাম, মুক্ত-বায়ু এবং ক্রম-ব্যায়াম দ্বারা টি-বি রোগের চিকিৎসা করতে লাগলেন, সমস্ত বাধাকে অগ্রাহ্য করে। এইটিই পৃথিবীর সর্বপ্রথম যক্ষ্মানিবাসরূপে পরিচিত এবং স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসার গোড়াপত্তনের সঙ্গে ব্রেমারের নামই সর্বপ্রধানভাবে জড়িত। কিন্তু বিশ্রামের উপর আরো বেশি জোর দিয়ে অধিকতর বৈজ্ঞানিক উপায়ে এবং সুসম্বদ্ধভাবে স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসাকে

নিয়ন্ত্রিত করলেন Dettweiler এবং তাঁর আরও পরে—Paterson. ব্রেমারের বিশ বছর খানেক পরে আমেরিকায় স্বনামধন্য চিকিৎসক Edward Livingstone Trudeau সর্বপ্রথম Saranac Lake-এ Adirondacks পাহাড়ে কটেজ স্থাপিত করে য়ুনাইটেড্ স্টেটস্-এ স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসার সূত্রপাত করলেন। আস্তে আস্তে এই রকম করে সুরু হয়ে এখন তো স্যানাটোরিয়ামে দেশ ছেয়ে গিয়েছে।

যক্ষ্মারোগ নির্ণয়ে, যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় এবং যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য প্রচারে কতজনের যে কতরকম কৃতিত্ব আছে, তার অন্ত নাই এবং কোনটিরই মূল্য কম নয়। যক্ষ্মাজীবাণুর আবিষ্কর্তা Robert Kochএর কথা আমি বলেছি। তাঁর আবিষ্কারের একশ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন Réné—Theóphile Hyacinth Laënnec. এই প্রতিভাশালী তরুণ ফরাসী চিকিৎসক আবিষ্কার করেন স্টেথোস্কোপ। তিনি এই ব্যাধিসংক্রান্ত নানা বিষয় জানতে চেষ্টা করেন এবং এর নানা বিষয়ে অনেক আলোকপাত করেন। Laënnecএরও আগে ফুস্ফুসে গুটিকার উৎপত্তি, তার সঙ্গে যক্ষ্মার সম্পর্ক, বুকে ক্যাভিটি বা গর্তের সৃষ্টি—পরপর ইত্যাদি বিষয়গুলির সন্ধান দিলেন এক একজনে (Sylvius, Morton, Bayle…ইত্যাদি)। Koch এর আবিষ্কারের কয়েক বছর পরে George Cornet দেখালেন যে, যক্ষ্মারোগীদের ব্যাধি যখন সক্রিয় অবস্থায় থাকে এবং তাদের প্রচুর পরিমাণে গয়ের উঠতে থাকে, তখন তার ভিতর লক্ষ লক্ষ যক্ষ্মাজীবাণু পাওয়া যায়। অত্যন্ত অসাবধানতার সঙ্গে যেখানে সেখানে নিক্ষিপ্ত গয়ের অপর সুস্থদেহীদের ভিতরে করে ব্যাধির বিস্তার এবং এই গয়ের পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলে দিলে আর কোন ভয় থাকে না। Cornetএর প্রদর্শনের পরে যত্রতত্র থুতু ফেলা, একই পাত্রে সকলের পানীয় গ্রহণ, অসাবধানতার সঙ্গে কাশা এবং হাঁচা

ইত্যাদির বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী শিক্ষাপ্রচার আন্দোলন হল। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে Wilhelm Konrad Roentgen X-ray উদ্ভাবন করেন। তখন অবিশ্যি শরীরের কোন হাড় মটকে গেলে, যুদ্ধক্ষেত্রে কোন সৈনিকের শরীরের কোথাও গুলি বিঁধলে এই সব ধরনের জিনিষ দেখবার জন্যেই চিকিৎসাক্ষেত্রে X-ray র বেশি চলতি ছিল। ক্রমেই X-rayর প্রয়োজনীয়তা বহুভাবে বেড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে টি-বি রোগীর বুকের অবস্থা নির্ণয়ে ত' বর্তমানে X-ray একেবারে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সূর্যালোক দ্বারা অস্থির যক্ষ্মা-চিকিৎসা-প্রবর্তক সুইস্ সার্জেন Dr. A. Rollier এর কথা আগেই বলেছি। Leysin এ তাঁর স্থাপিত Clinic এখন বিখ্যাত স্যানাটোরিয়ামে পরিণত হয়েছে। এতদ্ভিন্ন কেউ দেখালেন যক্ষ্মাজীবাণুর দুরকম টাইপ্‌কে ভাগ করে (human এবং bovine) এবং দেখালেন যে গো-জাতীয় জীবাণুও মানুষের দেহে ব্যাধি সৃষ্টি করতে পারে (Theobald Smith)। দেহে যক্ষ্মা-জীবাণু-সংক্রমণ ঘটেছে কিনা তা পরীক্ষার উন্নত উপায় দেখালেন আরেকজন (Clemens Von Pirquet)। কারুর নাম বা জড়িত হয়ে রইল পৃথিবীর প্রথম টিউবারকুলোসিস্ ডিস্‌পেন্সারি স্থাপন করবার ব্যাপারে (এডিন্‌বরায় Sir Robert W. Philip)। জনসাধারণের সহযোগিতা যাতে যক্ষ্মা রোগ নিবারণী কার্যে আসে এই উদ্দেশ্যে সহজ পুস্তিকাদি লিখে সর্বসাধারণের ভিতর এই ব্যাধি নিবারণ সংক্রান্ত বিবিধ তথ্যের প্রচারে কেউ-বা হলেন অগ্রণী (নিউ-ইয়র্কে Dr. Hermann M. Biggs)। কেউবা টি-বির হাত থেকে শিশুদের রক্ষা করবার জন্যে লাগলেন মাথা ঘামাতে (ফ্রান্সে Prof. Grancher)। আরও নানা বিষয়ের আবিষ্কার এবং প্রয়োগের ব্যাপারে আরও অনেকেই অবিশ্যি রয়েছেন। যাই হোক, চরক্, সুশ্রুত বা Hippocrates-এর আমল থেকে সুরু করে বহুজনেই এই

ব্যাধি সংক্রান্ত বহু নতুন বিষয়ের সন্ধান দিয়েছেন, এবং আজও দিচ্ছেন। এবং আশা করা যায়, আরও বহু সাধক মনীষীদের অক্লান্ত গবেষণা-প্রসূত ফলাফল এই ব্যাধি সংক্রান্ত আরো অভিনব তথ্যের উদ্ঘাটন করে দেবে ভবিষ্যতে।

আঠারশ-আশী থেকে উনিশশো দশ খৃষ্টাব্দ অবধি স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসার দোলা দুলত নানা ভাবে। কখনো খালি উঠত হাওয়া খাওয়ানরই ধূয়ো, শীতে এবং গ্রীষ্মে রোগীকে একেবারে জমিয়ে অথবা একেবারে পুড়িয়ে; কখনো অন্যান্য সমস্ত বিষয়কে উপেক্ষা করে রোগীদের একেবারে ঠেসে দুধ-ডিম খাইয়ে, দিনের ভিতর আট দশ বার ষোড়শোপচারের ব্যবস্থা করে উঠত খালি ওজন বাড়ানর ধূয়ো; কখনো বা উঠত অতিরিক্ত পরিশ্রম করানর ধূয়ো। Journal of Outdoor Life-এ Californiaর এক বৃদ্ধ তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন: তিনি যক্ষ্মাক্রান্ত হয়ে পঞ্চাশ বছর আগে রক্তবমির অবস্থায় Saranac Lake-এ Dr. Trudeau-র স্যানাটোরিয়ামে যখন চিকিৎসার জন্যে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর প্রতি প্রথমেই ব্যবস্থা হয়েছিল প্রত্যেকদিন অন্ততঃ তিন মাইল করে বেড়াবার—আবহাওয়ার অবস্থা যা-ই থাকুক না কেন। বুড়ো নিতান্ত বরাত-জোরেই এই রকম অসঙ্গত চিকিৎসায়ও বেঁচে উঠেছিল!

আজকাল নানারকম অভিজ্ঞতা এবং গবেষণার ফলে মাত্রা ছাড়িয়ে সব কিছু করবার ব্যবস্থার বিপুল পরিবর্তন হয়েছে এবং চারিদিকে একটা সাম্য এবং সামঞ্জস্যের মাঝখানে স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসা রোগীদের মঙ্গলজনক ভাবে বেশ সন্তোষজনক পথে চলেছে।

কোন স্যানাটোরিয়ামে সব সময়েই যে জায়গা খালি থাকে, তা নয়। রোগীর দরখাস্ত গ্রহণ-যোগ্য হলেও সঙ্গে সঙ্গেই রোগী স্যানাটোরিয়ামে বিছানা পাবেন—এমন নাও হতে পারে। যত শীঘ্র তিনি জায়গা পেয়ে যাবেন ততই

তাঁর পক্ষে মঙ্গলজনক, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই যখন কম বেশি বিলম্ব করতে হয়, তখন যতদিন পর্যন্ত স্যানাটোরিয়ামে রওনা হবার আদেশ না আসে এবং যতদিন পর্যন্ত তাঁকে বাড়ীতে অপেক্ষা করতে হয়, ততদিন পর্যন্ত তাঁর খুব সাবধানে থাকা উচিত এবং কোনরকম অনিয়ম অত্যাচারে রোগ যাতে বেশিদূর অগ্রসর হবার সুযোগ না পায়, আন্তরিকতার সঙ্গে সে চেষ্টা করা উচিত। সম্পূর্ণ বিশ্রাম, পুষ্টিকর আহার, মুক্ত বায়ুতে অবস্থান—এই সব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, এবং সম্ভব হলে এই সময় বিশেষজ্ঞের চিকিৎসাধীন থাকলে অসুখ বৃদ্ধি পাওয়ার চেয়ে কমবার সম্ভাবনাই বেশি। এই সময়ে রোগী এই ব্যাধি সম্বন্ধে সুলিখিত দু একখানি পুস্তকও পড়তে পারেন—নানা জ্ঞানলাভের জন্যে।

স্যানাটোরিয়ামে যাবার জন্যে যদি রোগী মনস্থির করে ফেলেন তবে তাঁকে এই ভাবে অগ্রসর হতে হবে: রোগী যে স্যানাটোরিয়ামে যেতে চান প্রথমে সেখানে চিঠি লিখে ভর্তির এবং মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের ফর্‌ম আনাতে হবে। যথাযথভাবে পূরণ করে আবার এগুলি ওই স্যানাটোরিয়ামের অধ্যক্ষ অথবা মেডিক্যাল অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। রোগী দরখাস্তের ফরম আনাবার সঙ্গে স্যানাটোরিয়ামের একটা পরিচয়-পত্রও চেয়ে পাঠাতে পারেন, এই পত্রে স্যানাটোরিয়ামটিতে কত রকমের থাকবার বন্দোবস্ত আছে, কোন্ শ্রেণীর কি রকম ভাড়া, কিরকম স্থানে স্যানাটোরিয়ামটি অবস্থিত এবং এর কতকগুলি সাধারণ নিয়মকানুনের অনেকগুলি জ্ঞাতব্য সংবাদ রোগী পাবেন। অধিকাংশ স্যানাটোরিয়ামেই সম্পূর্ণ বিনাখরচায়ও কিছু কিছু রোগী রাখবার বন্দোবস্ত আছে। যে সব রোগী অত্যন্ত দরিদ্র, তাঁরা এই সব "ফ্রী-বেড্"-এর জন্যে চেষ্টা করতে পারেন।

স্যানাটোরিয়ামে যাওয়ার কল্পনা যাঁরা করবেন, তাঁরা যেন একটি বিষয় স্মরণ রাখেন—ভর্তির দরখাস্ত করে উত্তর এবং রওনা হবার অনুমতি-পত্র না

আসা অবধি কেউ যেন রওনা না হন। প্রত্যেক স্যানাটোরিয়ামে সর্বদা বহু রোগীর দরখাস্ত এসে জমে থাকে। স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসার যারা উপযুক্ত বেছে বেছে সাধারণতঃ পর পর তাদের গ্রহণ করা হয়। কোন খবর-বার্তা না দিয়ে হুট্ করে কোন স্যানাটোরিয়ামে গিয়ে হাজির হলে সেখানে হঠাৎ বেশ কিছু মুস্কিলে পড়তে হতে পারে এই জন্যে যে, হয়ত স্থানাভাবেও ডাক্তার রোগীটিকে গ্রহণ না করতে পারেন, অথবা রোগীটির 'কেস্' হয়ত তাঁর বিবেচনায় স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসার যোগ্য না হতে পারে। এমতাবস্থায় কেবল যাবার কষ্ট ও হাঙ্গামা, অর্থব্যয় এবং অন্যান্য অসুবিধাই সার হবে।

স্যানাটোরিয়ামে যাবার প্রতীক্ষাকালে রোগীর সমস্ত তোড়জোড় সেরে ফেলে দিতে হবে। বিছানা, মশারি, তা ছাড়া জামা-কাপড়-চোপড়—সমস্ত কিছু প্রস্তুত রাখতে হবে। বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর, সার্ট, তোয়ালে, কাপড়, রুমাল—ইত্যাদির সবই দু একটা অতিরিক্ত সঙ্গে থাকা মন্দ নয়, নইলে স্যানাটোরিয়ামে প্রথমটা গিয়েই (বিশেষ করে যদি নিজের লোক কেউ কাছে না থাকে) কেনা-কাটি অথবা তৈরি করা হাঙ্গামা-জনক হতে পারে। থার্মোমিটার, পকেট স্পিটুন, আউন্স-গ্লাস, খাবার বাসন-পত্র—এসবও রোগীর নিজের থাকবে। কোন পাহাড়িয়া স্যানাটোরিয়ামে যদি রোগীর যাওয়া ঠিক হয় তবে উপযুক্ত জুতো, মোজা, মাফলার, সোয়েটার, কোট, ওভার-কোট, অধোবাস (আণ্ডার-উয়ার), পাজামা—এসব যেন রোগীর থাকে। কামাবার সমস্ত সরঞ্জামও পুরুষ-রোগীর রাখবার দরকার। মেয়ে-রোগীরা যেন বিশেষ কোন গয়না-পত্র অলঙ্কার নিয়ে স্যানাটোরিয়ামে না যান; কারণ এগুলি হারিয়ে গেলে বা চুরি গেলে স্যানাটোরিয়াম দায়ী থাকে না। রোগীর আত্মীয় স্বজন যেন স্মরণ রাখেন, রওনা হবার সময়ে গাড়ীতে রোগীকে অত্যন্ত সাবধানে এবং যথেষ্ট আরামের ভিতর রাখতে চেষ্টা করতে হবে।—যদি রোগীর শরীরে বিশেষ কোন গ্লানি

থাকে তবে তো কথাই নাই। এমন কোন যান ব্যবহার করা উচিত নয় যাতে খুব ঝাঁকানি লাগতে পারে। ষ্টেশনে যেখানেই গাড়ী বদল করতে হবে—সাহায্য নিতে হবে স্ট্রেচারের। কিছু পয়সা বাঁচাতে চেষ্টা করে রোগীর প্রাণ পথেই যেন বার করে দেওয়া না হয়। বুকের অবস্থা, চিকিৎসা এবং শারীরিক উন্নতি-অবনতি অনুযায়ী স্যানাটোরিয়ামে তিন চার মাস থেকে এক বছর, দেড় বছর অথবা তার চেয়েও বেশিদিন থাকতে হতে পারে। এর জন্যে রোগীকে সব দিকে তৈরি হয়ে যেতে হবে।

সব চাইতে নিকটের কোন স্যানাটোরিয়ামে যাওয়াই ভাল—আধুনিক চিকিৎসার যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা সেখানে থাকে। দূরাবস্থিত স্যানাটোরিয়ামে যাতায়াতের ক্লেশে অসুখ বেশি থাকলে আরও বেড়ে যেতে পারে এবং আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে সর্বদা দেখাশোনারও অসুবিধা হতে পারে।

আরেকটি কথা। স্যানাটোরিয়ামে গিয়ে ২।৩ মাসেই ভাল হয়ে যাবে—কোন চিকিৎসকেরই তাঁর রোগীকে এ রকম মিথ্যা আশা দেওয়া সঙ্গত নয়। রোগীর আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সম্বন্ধেও সেই কথা। এর ফল পরিণামে অতি খারাপ হতে পারে। রোগী এই সব ভরসা নিয়ে স্যানাটোরিয়ামে যায়, এবং ঠিক ঐ ২।৩ মাস হয়ত বেশ চুপচাপ থাকে। কিন্তু তারপরে যখন দেখতে পায় যে ২।৩ মাসে হয়ত কিছুই হয়নি তখন ওঠে ভীষণ অসহিষ্ণু হয়ে—এমন কি চিকিৎসকের সঙ্গে সহযোগিতা পর্যন্ত আর করতে চায় না। সত্য কথাই রোগীকে বুঝিয়ে বলতে হবে—সেটা প্রথমে একটু নৈরাশ্যের সৃষ্টি করলেও শেষ পর্যন্ত সুফলদায়ী এবং নিরাপদ। রোগীকে বলতে হবে সুস্থ সে নিশ্চয়ই হবে, এবং বহুলোকেই হচ্ছে। তবে একটু সময় লাগবে—হয়ত বা বছর খানেক।···তার জন্যে কি ?······

স্যানাটোরিয়াম জীবন দুই ভাগে বিভক্ত—বিশ্রামের অবস্থা এবং ক্রম-ব্যায়ামের অবস্থা। প্রথম, স্যানাটোরিয়ামে যাবার পরেই রোগীকে বিছানায়

সম্পূর্ণ বিশ্রামের অবস্থায় রাখা হয়। যতদিন পর্যন্ত রোগীকে এই ভাবে থাকতে হয় ততদিন তাকে বলা হয়—bed patient. তারপরে দিন যেতে যেতে যখন বুকের বেশ উন্নতি হতে থাকে, সব উপসর্গ কমে যায়, তখন ধীরে ধীরে রোগীকে হাঁটতে সুরু করতে হয়। এই সময়ে তারা walking patient নামে অভিহিত হয়। রোগী স্থানাটোরিয়ামে আসবার পরেই তার রক্ত, থুতু, মল, মূত্র ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয় এবং অবিলম্বে বুকের X-Ray ফটো তোলা হয়। তারপরে অবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় ওষুধের ব্যবহার যা আছে প্রকৃতপক্ষে তেমন বিশেষ কিছু করবার ক্ষমতা সেগুলির নাই এবং বিশেষ কোন "ওষুধের" উপর নির্ভর করেও এ রোগের চিকিৎসা ঠিক চলে না। অধুনা ফুস্‌ফুসকে পূর্ণ বিশ্রাম দেবার জন্যে বিশেষ কতকগুলি অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োগ ক্রমেই বেড়ে চলেছে, কারণ দেখা গিয়েছে যে সব চেয়ে কম সময়ে সব চেয়ে বেশি উপকার এতদ্বারা হয়ে থাকে। শরীরের যে অংশই আক্রান্ত হোক না কেন, সেই অংশের সম্পূর্ণ বিশ্রামের উপরেই চিকিৎসার কৃতকার্যতা নির্ভর করে, এবং সেই বিশ্রামটা যত বেশি হবে, চিকিৎসার ফলাফল তত বেশি সন্তোষজনক হবে। ফুসফুসটাকে একেবারে চেপে রাখতে না পারলে তাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়। রোগীকে অলসভাবে বিছানায় শুইয়ে রেখে দিলে শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা এবং ফুস্‌ফুসের শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত আলোড়নের গভীরতা অনেকটা কমে বটে, কিন্তু তা দ্বারা ফুস্‌ফুস যে পূর্ণ বিশ্রাম পায় তাও নয় বা জোর কাশির বেগে যে বিপুল ঝাঁকানি লাগে তা থেকে যে রক্ষা পায় তাও নয়। ফুস্‌ফুসের টি. বি.টা যে এত বেশি সংখ্যক লোকের মৃত্যু ঘটাচ্ছে তার প্রধান কারণই হচ্ছে ফুস্‌ফুসের এই রকম অবিশ্রান্তভাবে সক্রিয় অবস্থায় থাকা।

রোগটা যখন 'টি. বি.'—

"Artificial Pneumothorax" বা "Phrenic Evulsion" বা "Thoracoplasty" বা অন্য কোন অস্ত্র-চিকিৎসা দ্বারা অসুস্থ ফুস্‌ফুসের প্রয়োজন অনুযায়ী আংশিক বা সম্পূর্ণ বিশ্রাম সাধিত হতে পারে, এবং তা দ্বারা টি-বির জখমটা মেরামত হবার বিশেষ রকম সুযোগ পায়। ফুসফুসের নড়াচড়া-রূপ ক্রিয়া একেবারে কমে আসবার ফলে ক্ষত-কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিষ সমস্ত শরীবে ছড়িয়ে পড়বার এবং রোগ জীবাণুর পক্ষে ফুস্‌ফুসের সুস্থ অংশে প্রবেশ লাভ করবার সম্ভাবনা বিশেষ ভাবে হ্রাস পায়। ফলে, রোগীর সাধারণ অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়, তার জ্বর কমে আসে এবং ব্যাধির স্থানীয় ব্যাপ্তির আশঙ্কাকে বহুল পরিমাণে দূরীভূত করে। ফুসফুসের পূর্ণ বিশ্রাম—শ্বাস-প্রশ্বাস কালে, বিশেষ করে কাশবার ঠিক আগে এবং পরে দ্রুত এবং গভীর শ্বাস গ্রহণ কালে—শ্বাসনালী দ্বারা রোগের বিস্তৃতি ঘটবার সুযোগ নষ্ট করে। ফুস্‌ফুস্‌কে ভাল ভাবে চেপে রাখতে পারলে কফও অনেক কমে আসে এবং কাশবারও প্রয়োজন অনেক কমে। তাতে হয় কি, ঐ যক্ষ্মা-জীবাণু-পূর্ণ কফ অন্য ফুস্‌ফুস্‌টাকেও আক্রান্ত করবার সুবিধা পায় না।

"Cavity" সর্বদাই বিপজ্জনক, কারণ এগুলি যক্ষ্মাজীবাণু উৎপাদনের একটি কারখানা বিশেষ। ক্যাভিটির জীবাণুযুক্ত পুঁজ ফুস্‌ফুসের সুস্থ অংশে বা অপর সুস্থ ফুস্‌ফুসে প্রবেশ লাভ ক'রে অসুখের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। কাজেই ফুস্‌ফুসের ভিতরকার ক্যাভিটিকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সব রকমে দরকার। এবং এ ব্যাপারে অস্ত্রচিকিৎসার ফলাফলই সর্বপ্রধান—এই মত যক্ষ্মার অস্ত্র-চিকিৎসা-বিশারদগণ প্রকাশ করছেন। অবিশ্যি তাই বলে একথা যেন কেউ মনে না করেন যে অস্ত্র-চিকিৎসা হলেই শয্যা-বিশ্রাম এবং রোগীর অন্যান্য সাধারণ পালনীয় বস্তুগুলির আর প্রয়োজন নাই; বস্তুতঃ অস্ত্র-চিকিৎসাযোগ্য রোগী এবং অপর রোগী, সকলের পক্ষেই ওগুলি অত্যাবশ্যক।

"Artificial Pneumothorax" (সংক্ষেপে—A. P.)—চিকিৎসা বুকের টি-বির জন্যে আজকাল সুপ্রচলিত এবং এটা একটা সহজ প্রক্রিয়া। "A. P."কে পুরোপুরি অস্ত্র চিকিৎসা বলে ঠিক বলা চলে না, ব্যাপারটা অনেকটা "ইঞ্জেকশান্" ধরনের। পিঠের বা বুকের কোন জায়গায় সূচী দ্বারা ফুঁড়ে Pleural Spaceএর ভিতর বিশুদ্ধ হাওয়া ঢুকিয়ে ফুসফুসকে চেপে রাখা "A. P." চিকিৎসা দ্বারা সাধিত হয়। (Pleura-র যে অংশটা পাঁজরার দিকে লেগে থাকে তাকে বলা হয় "Parietal Pleura" এবং যে অংশটা ফুস্‌ফুসের গায়ে লেগে থাকে তাকে বলা হয় "Visceral Pleura"; আর দুটো Pleuraর মধ্যবর্তী স্থানকে বলা হয় "Pleural space")। দেখা গিয়েছে যে ফুস্‌ফুসের পূর্ণ সঙ্কোচন নয়, যাতে শুধু ফুসফুসের অসুস্থ অংশটাই সঙ্কুচিত হয় এবং সুস্থ অংশ অনেকটা সক্রিয় থাকে—সেটাই হচ্ছে সব চেয়ে বাঞ্ছনীয়। এবং বুকে হাওয়া দেওয়াটাকেও বর্তমানে সেই ভাবেই নিয়ন্ত্রিত করা হয়ে থাকে। ফুস্‌ফুসের আংশিক সঙ্কোচনই ফুসফুস থেকে রক্তের মধ্যে বিষ সঞ্চারণ বন্ধ ক'রে রোগের উপসর্গ কমিয়ে দিয়ে রোগীকে আরোগ্যের পথে নিয়ে যাবার পক্ষে প্রশস্ত। কিন্তু অনেক সময়ে "adhesion" (যা নাকি অনেক টি-বি রোগীর বুকে ঘটে থাকে এবং যার মানে হচ্ছে ফুস্‌ফুস্‌টা পাঁজরার দিককার দেয়াল থেকে আলাদা না থেকে তার সঙ্গে জায়গায় জায়গায় জোড়া লেগে আছে)—"A. P."কে কৃতকার্যতার সঙ্গে সম্পন্ন হতে দেয় না। এসব ক্ষেত্রে "Thoracoscope" নামক যন্ত্র-সন্নিবিষ্ট আয়নার ভিতর দিয়ে লক্ষ্য রেখে বুকের এই adhesionগুলিকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই অস্ত্রোপচারের নাম হচ্ছে—"Intra-pleural Pneumolysis." Thoracoscope এবং বৈদ্যুতিক শলাকার সাহায্যে adhesion কাটার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন বছর সাতাশেক আগে Stockholmএর Jacobaeus নামক

ব্যক্তি। হাওয়ার বদলে কখনো কখনো pleural cavityর ভিতর তেল (mineral oil, Gomenol, Olive oil···ইত্যাদি) প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। তেল দিয়ে ফুস্‌ফুস্‌কে চেপে রাখার নাম হচ্ছে "Oleothorax". বিশেষ এক একটা ক্ষেত্রে Artificial Pneumothoraxএর চাইতে Oleothoraxটা একটু বেশি সুবিধাজনক হয়েছে বলে দেখা গিয়েছে। অবিশ্যি "Oleothorax"এর চাইতে "Artificial Pneumothorax"এর ব্যবহার এবং সুবিধা বহু বহু গুণ বেশি। Robert Kochএর যক্ষ্মাজীবাণু আবিষ্কারের আমলেই Carlo Forlanini বলে একজন ইটালিয়ান Artificial Pneumothorax চিকিৎসা প্রচলিত করেন। অবিশ্যি এরও বছর ষাটেক আগে James Carson নামে একজন Liverpool-নিবাসী চিকিৎসকই Artificial Pneumothorax-এর কথা প্রথম বলেছিলেন, কিন্তু সফলতার সঙ্গে রোগীদের উপর এর প্রয়োগ Carlo Forlanini-ই করেন। তবে পরবর্তীকালে "A. P." দেবার যন্ত্রের এবং এই চিকিৎসা-পদ্ধতির নানাবিধ উন্নতি ক্রমে ক্রমে সাধিত হয়েছে। সম্প্রতি 'A. P'. অকৃতকার্য হলে Parietal pleura অর্থাৎ বাইরের পর্দাটাকে পাঁজরা থেকে ছাড়িয়ে ঐ নতুন স্থানে বিশুদ্ধ হাওয়া প্রবেশ করিয়ে ফুস্‌ফুস্‌কে সঙ্কুচিত করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর নাম Extra-pleural Pneumo-thorax.

ফুস্‌ফুস্‌কে নিরেট কোন বস্তু দ্বারা চাপবার আরেকটি নাম হচ্ছে Extra-pleural Pneumolysis. এতে অস্ত্র প্রয়োগ করে বুকের ভিতরকার পাঁজরার দিককার দেয়াল-সংযুক্ত প্লুরাটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে Pleural cavityর বাইরে এই সব জিনিস, যথা—চর্বি, মাংসপেশী, মোম, রাবার, গজ, প্যারাফিন্ (Plombe) ইত্যাদির কোনটা প্যাক করে দিয়ে ফুস্‌ফুসের আক্রান্ত জায়গাটিকে চাপা হয়। (ফুস্‌ফুসের Apex-টাকে যখন চাপা হয় তখন

তাকে বলা হয় "Apicolysis"). Extra-pleural Pneumolysis সর্বপ্রথম করেছিলেন Parisএর Tuffier—বছর পঞ্চাশেক আগে। বুকের টি-বির আরেকটি অস্ত্র-চিকিৎসার নাম হচ্ছে—"Phrenicectomy" অথবা "Phrenicotomy" অথবা "Phrenic-exairesis" অথবা "Phrenic Avulsion (বা Evulsion)"। এই অস্ত্রোপচারে ঘাড়ে ঠিক কণ্ঠাস্থির উপরে একটি স্থান চিরে phrenic nerveএর কিছুটা অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয় অথবা নার্ভ-টিকে একেবারে উৎপাটিত করা হয়। ঘাড়ের ডান এবং বাঁ দিকে প্রত্যেক দিকে একটি একটি করে দুটি phrenic nerve আছে। Phrenic nerveএর কাজ হচ্ছে Diaphragm (যে পেশী নাকি পেট এবং বক্ষগহ্বরকে পৃথক করে রাখে)—এর কাজকে নিয়ন্ত্রিত করা। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে Diaphragmটাও ওঠানামা করে। এই ওঠা-নামাকে বন্ধ করতে পারলে ফুস্‌ফুস্‌টাও সেই অনুপাতে বিশ্রাম পায়। এক দিককার phrenic nerveকে যখন কেটে ফেলা হয়, তখন diaphragmটা, যদি নাকি বক্ষ-প্রাচীরের সঙ্গে যুক্ত না থাকে, উপরের দিকে খানিকটা উঠে এসে ফুস্‌ফুস্‌কে কতকটা সঙ্কুচিত ক'রে তার খানিকটা বিশ্রামের ব্যবস্থা করে। কখনো কখনো diaphragmটাকে সাময়িক ভাবে অচল করে দেবার জন্যে phrenic nerveটাকে কেবল মাত্র থেঁতো করে দেওয়া হয় এবং এই অপারেশানের নাম হচ্ছে Phreniclasis অথবা Phrenemphraxis. প্রায় তিরিশ বছর আগে Steurtz বলে একজন প্রথম Phrenicotomy সম্বন্ধে প্রস্তাব করেন কিন্তু Sauerbruch এই operation সব প্রথমে চালাতে থাকেন—Steurtz-এর প্রস্তাবের কোন খবর না রেখে। "Scaleniotomy" হচ্ছে আরেকটি অপারেশান। এই অপারেশানে প্রথম এবং দ্বিতীয় পাঁজরার সঙ্গে যুক্ত, শ্বাস প্রশ্বাসে সহায়ক, পেশী-বিশেষকে কেটে দেওয়া হয়। এই মাংসপেশীর

আকর্ষণে উক্ত পাঁজরাগুলি উন্নত হয়; কাজেই এই পেশীকে কেটে দিলে Apexটা পতিত হয় এবং খানিকটা বিশ্রাম পায়। পেটের আভ্যন্তরীণ সমস্ত বস্তুকে আচ্ছাদনকারী রসসিক্ত আবরণের নাম—Peritoneum, এবং আচ্ছাদিত গহ্বরের নাম Peritoneal Cavity. এই Peritoneal cavityতে অক্সিজেন অথবা পরিস্রুত বায়ু প্রবেশ করান হয় এবং এই প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে "Oxy-Peritoneum" বা "Pneumo-peritoneum". এর ফলাফল কতকটা Phrenic Evulsionএর মতই, কিন্তু অন্ত্রের অথবা পেরিটোনিয়ামের যক্ষ্মাতেও এটা করা হয়। "Inter-costal Neurectomy" নামক অন্য এক প্রকার অস্ত্রোপচার দ্বারাও ফুস্‌ফুসের অচলতা ঘটান হয়। যে সব স্নায়ু পাঁজরাগুলির নড়াচড়াটাকে নিয়ন্ত্রিত করে, এই অস্ত্রোপচারে সেই সব স্নায়ুর অংশ কর্তন করা হয়। এই অস্ত্রোপচার প্রথম করেন Konigsberg এর Warstat. বুকের টি. বি.র অস্ত্র চিকিৎসার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে "Extra-pleural Thoracoplasty"—যেটাও নাকি খুবই জমকাল রকমের, এবং যেটা ক্রমেই একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করছে বুকের যক্ষ্মায় অস্ত্র চিকিৎসার ভিতরে। বছর পঞ্চান্ন আগে Lausanne এর de Cerenvilleই যদিও সর্বপ্রথম Thoracoplasty সম্পাদন করেন, কিন্তু Brauer-কেই যক্ষ্মায় আধুনিক Thoracoplasty অপারেশানের প্রকৃত জনক বলা হয়েছে। কতকগুলি পাঁজরার অংশকে বা কতকগুলি পাঁজরাকে সম্পূর্ণরূপে কর্তন করে বক্ষ-প্রাচীরের পতন ঘটিয়ে ফুস্‌ফুসকে চেপে দেওয়াই Thoracoplastyর কাজ। মেরুদণ্ড, পাঁজরা এবং সামনে উরঃফলক দ্বারা তৈরি হাড়ের খাঁচাটির ভিতরেই তো থাকে ফুস্‌ফুস। শ্বাস প্রশ্বাসের সময়ে যদিও একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই ফুস্‌ফুসকে ওঠানামা করতে হয় তবুও এই হাড়ের খাঁচাটার জন্যে ফুস্‌ফুসটার সম্পূর্ণ পতন ঘটান সম্ভব হয় না। যখন নাকি কতকগুলি পাঁজরা

থেকে খানিকটা অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয়, খাঁচাটার আয়তন কমে আসে এবং ফুস্‌ফুসেরও সঙ্কোচ ঘটে। এই রকম চেপে থাকবার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা ফুস্‌ফুসের আর নড়াচড়া হবার সম্ভাবনা থাকে না। ফুস্‌ফুসের আয়তন এবং সঙ্কোচন-প্রসারণকে যথেষ্ট পরিমাণে কমানর জন্যে অনেকখানি পাঁজরা কেটে ফেলবার দরকার হতে পারে।

থোরাকোপ্লাস্‌টির পরে বুকের বিকৃতি অনেক সময়ে খুব বিশেষ কিছু ঘটে না, কিন্তু অনেক সময় খুবই ঘটে থাকে। বাইরে থেকে খারাপ দেখালেও বিবেচক রোগী তাঁর অধিকতর কুৎসিত রোগের চেয়ে এই বিকৃতিকে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করেন। (বিকৃতি মানে, দেখলে দেখা যায় যেন বুক বা পিঠের একটা জায়গা—অর্থাৎ যেখানে অপারেশানটা করা হয়েছে সেই জায়গাটা—খানিকটা যেন চেপে গেছে। থোরাকোপ্ল্যাস্‌টি করে একজন রোগীকে পঙ্গু করে রাখা হয় তা যেন কোন রোগী না ভাবেন। বাস্তবিক যদি কোন রোগীর এই অপারেশানটা ঠিক মতন লেগে যায়—অন্য কোন বিপদের সৃষ্টি না করে—তা হলে রোগী উপযুক্ত সময়ে দস্তুরমতন পরিশ্রমের কাজের উপযোগীও হতে পারেন এবং চলাফেরায়ও যে তাঁর কোন অস্বাভাবিকতা থাকবে তা নয়।)

অনেক সময়ে Thoracoplastyর পরে রোগীকে একরকম দোলা বা ঝোলায় শুইয়ে রাখা হয়—যাতে অপারেশান করা অংশটি বেশ চেপে থাকবার সুযোগ পায়।

ফুস্‌ফুসের বিশ্রাম সাধনের জন্যে আরও নানা রকম উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে। কখনো কখনো বালু বা সীসার ছোট বল-পূর্ণ থলি বুকের যে জায়গাটাতে অসুখ সেই জায়গাটার উপরে (সাধারণতঃ কণ্ঠাস্থির নীচেয়) বাইরে বসিয়ে রাখা হয়। এই ব্যাগের চাপের দরুন ফুস্‌ফুসের নড়াচডাটা একটু কম থাকে। কখনো বা রোগীকে বিশেষ ভাবে নির্মিত এক রকম

বেল্ট (belt) বুকে পরতে দেওয়া হয়—যে বেল্ট্‌ও ঐ উদ্দেশ্যই সাধন করে থাকে।

অস্ত্র-চিকিৎসা ভিন্ন এই রোগের চিকিৎসায় শিরার ভিতর বা মাংসপেশীর ভিতর বা চামড়ার নীচে যে সব ইঞ্জেক্‌শান্‌ প্রচলিত আছে, তার ভিতরে 'ক্যালসিয়াম', 'গোল্ড', 'টিউবারকিউলিন'—ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ভাল স্যানাটোরিয়ামে, রোগীর যদি টি-বি ছাড়াও অন্য কোন ব্যাধির কোন উপসর্গ থাকে, তবে তার চিকিৎসার ব্যবস্থাও কম-বেশি যথাসম্ভব করা হয়ে থাকে। তবে স্যানাটোরিয়ামের কাছেই বড় কোন হসপিট্যাল থাকলে রোগীর অপর কোন উপসর্গের জন্যে অনেক সময়ে সেখানকার ডাক্তার বা সার্জেনদেরও সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। যক্ষ্মারোগী যদি অন্য কোন রোগ দ্বারা বিড়ম্বিত হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে তারও সুষ্ঠু চিকিৎসা না হলে তার কোনই উন্নতি হবে না। কাজেই বহুদূর প্রদেশে, সব কিছু থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কোন স্থানে—যেখানে সব রকম সুবিধা হাতের কাছে পাওয়া যায় না এমনতর জায়গায় গিয়ে স্যানাটোরিয়াম স্থাপন আধুনিক যক্ষ্মা-বিশারদরা সমর্থন করেন না।

সঙ্গে টি-বি যদি না থাকে তবে খালি ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, কালাজ্বর, "ম্যালোয়ারি"...সারাবার জন্যে কেউ যেন কোন টি-বি স্যানাটোরিয়ামে যাবার উপক্রম না করেন। কেউ শুধু একটা সাধারণ চেঞ্জের জন্যেও এসব জায়গায় যাবার কল্পনা না করেন। টি. বি. স্যানাটোরিয়াম "হোটেল" নয়।

স্যানাটোরিয়ামে আসবার পরে রোগীর একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত—নিজের আরোগ্যলাভ। এবং এই আরোগ্যলাভের জন্য তার অভ্যাস করতে হবে অসীম সংযম আর নিষ্ঠা। অভ্যাস করতে হবে বিপুল ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা।

রোগী স্যানাটোরিয়ামে আসবার পরে স্যানাটোরিয়ামের কি কি নিয়ম-

কানুন মানতে হবে এবং কখন কিভাবে চলতে হবে, তার একখানা ছাপান কাগজ অথবা ছোট্ট বই তাকে দেবার ব্যবস্থা অনেক স্যানাটোরিয়ামে আছে, অনেক স্যানাটোরিয়ামে নাই। যেখানে এই কাগজ দেওয়া হয়, সে ত' ভালই, যেখানে দেওয়া হয় না সেখানে নবাগত রোগী পুরান রোগীর কাছ থেকে সব শুনে নিতে পারবেন। তবে যে করেই হোক সব নিয়ম-কানুন জানবার পরে রোগী প্রত্যেকটি নিয়ম পালন করে চলবেন—আন্তরিকতার সঙ্গে। রোগী নিজেকে নিজে এই প্রশ্নটি করবেন: "কিছুদিন একটু কষ্ট সহ্য করে নিজেকে সারিয়ে তুলে আবার ফিরে যাব আমার সেই স্বাধীন, কর্ম্মময়, আনন্দময় জীবনে—সেইটা আমি চাই, না কি বর্ত্তমানের কতকগুলি অতি ছোটখাট তৃপ্তির মোহের বশবর্ত্তী হয়ে অতি ছোটখাট কতকগুলি দুর্বলতা প্রকাশের লোভ সম্বরণ করতে না পেরে, নিজেকে ক্রমাগত ভুগিয়ে ভুগিয়ে চলব মাসের পর মাস—বছরের পর বছর—সেইটা আমি চাই?" প্রকৃতপক্ষে আরোগ্যলাভের পথে যক্ষ্মারোগীকে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, বহু ক্ষুদ্র প্রলোভনের প্রতি উদাসীন হতে হবে, জয় করতে হবে প্রতি পদে পদে বহু হৃদয়-দৌর্বল্য, নিজেকে পরিণত করতে হবে এক নিষ্ঠুর সাধকে। এমন দেখা গিয়েছে যে, রোগীকে যখন কড়াভাবে বিছানায় সর্বক্ষণ শুয়ে থাকতে বলা হয়েছে, সে একটুখানি বসবার বা দাঁড়াবার দিব্যি একটা কৈফিয়ৎ চট্ করে আবিষ্কার করেছে অথবা একটু পায়চারি করবার একটু সুযোগ চুরি করে করে নিয়েছে। নবাগত রোগী স্যানাটোরিয়ামে হয়ত এমন অনেক রোগী দেখতে পাবেন, যারা করবে বিশ্রামের অবহেলা, অমান্য করে চলবে স্যানাটোরিয়ামের নিয়ম-কানুন; কিন্তু ডাক্তারের সাড়া পাওয়া মাত্র সাজবে একেবারে ভিজে বেড়াল, সটান বিছানায় এসে এমন মড়ার মত পড়ে থাকবে যে, দেখলে মনে হবে, যেন তারা সেই আদমের যুগ থেকে এমনি করে বিশ্রাম নিচ্ছে—একটু এপাশ ওপাশও করেনি! তাদের

ভিতরে যা'-দিগকে হাঁটবার অনুমতি ডাক্তার দিয়েছেন, তারা এক ফার্লং-এর জায়গায় এক মাইল হেঁটে এসে মনে মনে করবে পৌরুষ অনুভব! কিন্তু এই সব রোগীর, মিঃ গান্ধী তাঁর "My Experiments with Truth" গ্রন্থে যে সুন্দর কথাটি বলেছেন, এটি জেনে রাখা ভাল—"Ultimately a deceiver only deceives himself"—একজন প্রতারক শেষ পর্যন্ত নিজেকেই প্রতারিত করে। ডাক্তারকে ফাঁকি দিলে তাঁর হবে না একটুও কিছু, ঠকতে হবে নিজেরই। এই ব্যারাম নিয়ে ছেলেখেলা নয়, কাজেই মনের সমস্ত বিদ্রোহকে শান্ত করে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ—অবশ্য সারবার মতলব থাকলে।

বড় এবং ভাল স্যানাটোরিয়ামগুলিতে রোগীদের সময় কাটাবার কিছু কিছু ব্যবস্থা আছে। গ্রামোফোন, রেডিয়ো অথবা দুচার রকম খেলাধূলার ব্যবস্থা—যাতে নাকি কোন পরিশ্রম না হয়, ইত্যাদি আছে। লাইব্রেরিও থাকে—রোগীরা ইচ্ছামত বই পত্রিকা আনিয়ে পড়তে পারেন। কখনো কখনো স্যানাটোরিয়াম-কর্তৃপক্ষ বাইরের লোককে আমন্ত্রণ করে গান-বাজনা অথবা অন্য কোনরকম জলসার ব্যবস্থা, বা উৎসব. সখের মেলা··· ইত্যাদি রোগীদের আমোদ-বিধানের জন্যে করে থাকেন। যতদিন অবধি "বেড্-পেসেণ্ট" হয়ে থাকতে হয়, ততদিন সত্যই খানিকটা কষ্টে এবং অসুবিধায় থাকতে হয় বই কি; কিন্তু ভাল হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে যখন বাইরে বসবার, বেড়াবার বা আমোদ-প্রমোদে একটু আধটু যোগদান করবার অনুমতি পাওয়া যায়, তখন স্যানাটোরিয়াম-জীবন দুঃসহ আর ঠিক তেমনটি থাকে না। "ওয়াকিং-পেসেণ্ট"রা অনেক সময়েই বেশ দল বেঁধে আড্ডা দেবার সুযোগ পায়—নানা বিষয় আলোচনা করে তাদের সময় কাটে। তবে রোগীদের অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত—যাতে নাকি শরীর এবং মনের পক্ষে গুরুতর-রকম ক্ষতিকর ঝগড়াঝাঁটি বা উত্তেজনাপূর্ণ বাগ্-বিতণ্ডা

নিজেদের ভিতর কখনো কিছু নিয়ে না হয়। স্যানাটোরিয়ামে গিয়ে স্যানাটোরিয়ামের নিয়ম-কানুন ক্রমাগত লঙ্ঘন করবার মনোবৃত্তি যাদের থাকবে, তাদের এসব জায়গায় না যাওয়াই উচিত। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির ভাব, পরস্পরের ভিতর একতার ভাব, চিকিৎসকের সঙ্গে চিকিৎসা ব্যাপারে অহিংস-সহযোগের প্রচেষ্টা—ইত্যাদি রোগীদের নিজেদের অন্তরে সযত্নে জাগিয়ে তুলতে হবে।

রোগীকে হতে হবে সাহসী এবং নির্ভীক। কত রোগীর কত যন্ত্রণার কথা, কত রোগীর শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদ কানে আসবে—চোখেও দেখতে হতে পারে। নিজের শরীরেও যথেষ্ট গ্লানি থাকা সম্ভব। কিন্তু তার ভিতরেও নিজেকে রাখতে হবে শান্ত, সমাহিত। নিজের অথবা চারি পার্শ্বের এত বেদনার মাঝখানেও নিজেকে শক্ত রাখতেই হবে, নইলে চলবে না। হতাশ হয়ে পড়বার চেয়ে টি. বি. রোগীর বড় বিপদ আর নাই। সেরে উঠবই—এই দৃঢ়তা মনে জাগিয়ে রাখতে হবে সর্বক্ষণ।

এখানে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করবার প্রয়োজন বলে মনে করি। এমন রোগী অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায়, যিনি ডাক্তারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, চিকিৎসা চলবার অবস্থায়, স্যানাটোরিয়াম থেকে চলে যেতে সচেষ্ট হন। অবিশ্যি দীর্ঘকালের ভিতরেও যদি কোন রকম উন্নতি না হয়, তবে রোগী অন্য চেষ্টা ইচ্ছে হলে করতে পারেন, কিন্তু উন্নতি যদি সুস্পষ্ট হয়, তবে শুধু খেয়ালের বশে মাঝ-পথে স্যানাটোরিয়াম ত্যাগ করা কখনই সঙ্গত নয়। এমন দেখা গিয়েছে, যক্ষ্মারোগীর জীবনে বহুবার সাময়িক উন্নতি আসে, বহুবার সে উন্নতি চলে যায়। কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিয়ে শরীরটা একটু ভাল ঠেকল, দুদিন জ্বরটা একটু কম থাকল, অথবা কাসিটা একটু কম থাকল, অথবা দু সপ্তাহ ওজনটা একটু বাড়ল, এইতেই যক্ষ্মারোগী নিজের সম্বন্ধে কোন রঙিন কল্পনা যেন গড়ে না তোলেন। চিকিৎসা সম্পূর্ণ শেষ

না করে স্যানাটোরিয়াম ছেড়ে চলে আসবার জন্যে ব্যস্ত হওয়া মানে কিছু দিনের ভিতরেই পুনরায় সেখানে ফিরে যাবার পথ পরিষ্কার করে রাখা।

কেবলমাত্র স্যানাটোরিয়ামের রোগীদের কথাই নয়; স্যানাটোরিয়ামের বাইরেও যে সব রোগী বিশেষজ্ঞের অধীনে চিকিৎসিত হবেন, তাঁদের সম্পর্কেও এই সব কথা খাটবে। এ বিষয়ে জনৈক চিকিৎসক তাঁর একটি রোগিণীর শোচনীয় পরিণতির ইতিহাস A Case of False Sense of Safety নামে তাঁর একটি প্রবন্ধের ভিতরে দিয়েছেন। ভদ্রমহিলা বিবাহিতা এবং বয়স ছিল ২৫ বছর। কাসি, রক্তবমন, জ্বর, দুর্বলতা—সবই তাঁর ছিল। এই অবস্থায় তাঁকে "Artificial Pneumothorax" করা হল এবং "Gold" দেওয়া হল। ১০ মাস চিকিৎসার পরে তাঁর চমৎকার উন্নতি হল, কিন্তু তখনও তাঁর আরও দীর্ঘকালের চিকিৎসার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। অথচ এই সময় তিনি এবং তাঁর আত্মীয়েরা বেঁকে বসলেন—আর কিছুতেই চিকিৎসা করান হবে না। তাঁদের মতে—এখন একটু হাওয়া পরিবর্তন করলে, আর একটু ভাল খাওয়া দাওয়া করলেই রোগিণী ভাল থাকবেন—এইটে হল ঠিক এবং তাঁরা ধরে নিলেন রোগিণী সুস্থ হয়ে গিয়েছেন। ডাক্তারের উপদেশ তাঁরা গ্রাহ্য করলেন না।··· অল্প কিছুদিন পরেই মেয়েটি হলেন গর্ভবতী—ডাক্তারের ঘোর অমতে।

জানেন, এ সবের পরিণাম শেষ পর্যন্ত মোটের উপর কি হল···?

শেষ পর্যন্ত তাঁর অসুখ এমন ভীষণ ভাবে বেড়ে পড়ল যে, তাঁর জন্যে আর কিছুই করা সম্ভবপর হল না। মৃত্যু ছিল তাঁর নিশ্চিত এবং অতি দ্রুত অবশেষে তাই-ই সংঘটিত হল।

যক্ষ্মা-রোগীর জীবনে সাময়িক উন্নতিও যেমন অনেকবার আসতে পারে, সাময়িক অবনতিও ঠিক তেমনিই আসতে পারে এবং এর জন্যে রোগীর কিছুমাত্র হতাশ হয়ে পড়া ঠিক নয়। বেশ হয়ত দিন চলেছে, হঠাৎ জ্বর

বেড়ে পড়ল, কাসি বেড়ে গেল, খুব গয়ের উঠতে থাকল, ওজনও তরতর করে খানিক গেল কমে, কি জানি বা মুখ দিয়ে খানিক রক্তই মাঝে বেশ উঠে পড়ল! কিন্তু রোগীর যদি সুদৃঢ় ধৈর্য এবং জয়ী হয়ে উঠবার অদম্য ইচ্ছা থাকে তবে এসব অবস্থা তিনি নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে উঠতে পারবেন কাটিয়ে। অনেক সময়েই এমন দেখা গিয়েছে যে, কিছুদিন এই সব উপদ্রবের পরে রোগীর সহসা একেবারে আশ্চর্যজনক-ভাবে উন্নতি সুরু হয়েছে। কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়মের ভিতর দিয়ে এ অসুখ অগ্রসর হতে থাকে এবং এমন অনেক সময় হয় যে কতকগুলি নিয়ম সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সারবার দিকে অসুখ সহজে মুখ ফিরাতে চায় না; কখনও চাপা থাকে, আবার কখনও ওঠে একটু মাথা চাড়া দিয়ে। কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসা চলবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে অসুখ শান্তভাব ধারণ করে এবং রোগীর আরোগ্যলাভকে নিশ্চিত করে। রোগীর মনে রাখা উচিত: যখন নাকি কোন বিষয় নিয়ে অবস্থা এমন *জটিল* হয়ে ওঠে যে, মনে হয় যেন সব কিছুই তাঁর বিরুদ্ধে যাচ্ছে এবং মনে হয় যেন মাত্র একটি মিনিটও আর তাঁর শক্ত হয়ে লেগে থাকবার উপায় নাই—কিছুতেই যেন তিনি সেই সময়টাতে হাল ছেড়ে না দেন—কারণ সেইটেই হচ্ছে আসল জায়গা এবং সময়, যে জায়গায় এবং যে মুহূর্তে অবস্থার মোড় আবার ঘুরে যাবে।

স্যানাটোরিয়ামে যখন একজন নতুন রোগী আসবেন তখন পুরানো রোগীর কর্তব্য হবে তাঁকে সর্বদা এই বলে প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টা করা যে আরোগ্য-লাভই তাঁর আসন্ন, মৃত্যু নয়! তাঁরা তাঁকে এই সব মধুর, মমতাপূর্ণ, সাহসযুক্ত কথা দ্বারা অনুপ্রাণিত করবেন: "বন্ধু! মেঘের ফাঁকে রয়েছে আলো; তোমার বিপদের দিন কেটে গেছে, কিছু ভয় নাই। স্বাস্থ্যদেবতা ফিরে আসছেন তোমার দুয়ারে—তুমি তাঁকে অভিনন্দিত করো!

—৫—

রোগের উপশমান্তে রোগী যেদিন হাঁসপাতাল বা স্যানাটোরিয়াম ত্যাগ করেন, সেটি তাঁর পক্ষে শুভদিন। যখন তিনি প্রথম এসেছিলেন, দেহ ছিল তাঁর জীর্ণ—ব্যাধির সহস্র গ্লানি দ্বারা জর্জ্জরিত। কিন্তু যেদিন তিনি স্যানাটোরিয়াম থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন—তখন আর তাঁর সে অবস্থা নাই। পরিপুষ্ট, উজ্জ্বল দেহে তাঁর জেগেছে নতুন রক্তের লাবণ্য, গতির ভিতরে আবার এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য, তাঁর আশা-ভরা মনের প্রান্তে এসে পড়েছে নতুন জীবনের ছায়া, ব্যাধির দীর্ঘকালের যত কুৎসিত উপদ্রব কোথায় করেছে আত্মগোপন—তার ঠিকানা নাই।

কিন্তু তত্রাচ, একদিক দিয়ে এটি রোগীর পক্ষে যেমন সুদিন, অপর দিক দিয়ে আবার এটি বিপজ্জনক দিনও বটে! এই রোগের এমন ব্যাপার, এতদিনকার সাধনার ফল রোগীর অদূরদর্শিতার ফলে সহসা কখন, কি ভাবে যে নষ্ট হয়ে যাবে কিছুই বলা যায় না!

আমি এই বিষয়টির উপর বেশি করে জোর দিতে চাই এই জন্যে যে স্যানাটোরিয়াম-কর্তৃপক্ষ যখন রোগীকে মুক্তি দিয়ে গৃহে যাবার অনুমতি দিলেন, তখনও সত্যি সত্যিই কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে শৃঙ্খল-মুক্ত নন! রোগীদের হিতার্থে যক্ষ্মারোগে "সম্পূর্ণ-সেরে-যাওয়া" কথাটাকে খুব হালকা ভাবে ব্যবহার না করাই ভাল, এবং চিকিৎসকেরও কর্তব্য রোগীকে তার রোগের পুনরাবির্ভাবের বিপদ সম্বন্ধে প্রথমেই সতর্ক এবং সচেতন করে দেওয়া। রোগাক্রান্ত অবস্থায় ফুস্‌ফুস্‌টির স্বাভাবিক এবং সুস্থ অবস্থার পরিবর্তন হয়ে স্থান হয় নতুন নরম tissue (টিসু)-র—যেগুলির নাকি সহজে ভেঙ্গে পড়বার এবং স্ফোটক সৃষ্টি করবার প্রবণতা থাকে। এবং

সারবার কাজে "Fibrous tissue"গুলি যত ঘন ও শক্ত হতে থাকে, সারাটাও সেই পরিমাণে ভালভাবে চলতে থাকে। কিন্তু যে নিয়মের ভিতর দিয়ে এগুলি অগ্রসর হতে থাকে তা রাতারাতি শেষ হয় না; তাতে সময় লাগে।

ব্যাপারটা হয় এই: যক্ষ্মাজীবাণু প্রথমে ধরুন ফুস্‌ফুসের উপর অংশে গিয়ে আশ্রয় নিল। তারা সেখানে গিয়ে একটা প্রদাহের সৃষ্টি করল এবং ছোট ছোট কতকগুলি গুটিকার উৎপত্তি ঘটাল। এই গুটিকাগুলি ক্রমে আকারে বড় হতে থাকে। এই গুটিকাগুলির নামই হচ্ছে "tubercles"—যা থেকে অসুখের নামকরণ হয়েছে "tuberculosis" বলে। একটি tubercleকে যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচেয় পরীক্ষা করা যায় তাহলে তার মাঝখানে দেখা যায় বৃহৎ একটি কণিকা—যাকে অভিহিত করা হয় "giant cell" বলে। এই "giant cell"-এর ভিতর এবং টিউবার্ক্‌ল্‌টা অন্য যে সব cell দ্বারা গঠিত হয়েছে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় তার ভিতর যক্ষ্মাজীবাণুকে পাওয়া যায়। এই giant cell-টার চারিপাশে ছোট ছোট কতকগুলি cell এসে জমা হয়—যেগুলিকে বলা হয়—"monocytes"; এবং এদেরও বাইরে থাকে শ্বেত-কণিকার এক বিশিষ্ট দল—যাদের বলা হয় "lymphocytes". "Tubercle"এর ভিতরে কোন রক্তকোষ থাকে না—কাজেই রক্তের ভিতর কোন ওষুধ ইঞ্জেকশান করে সোজাসুজি যক্ষ্মাজীবাণুকে ধ্বংস করে এই ব্যাধির প্রতিকার সম্ভবপর হয় না। যাহোক, রোগের গতি যদি অপ্রতিহত অবস্থায় থাকে, তবে টিউবার্ক্‌ল্‌গুলি এবং যে সব টিস্যুর ভিতর টিউবার্কল্‌গুলি অবস্থিত থাকে, সেগুলির একরকম রূপান্তর ঘটতে থাকে—যে ব্যাপারটিকে বলা হয়েছে—"caseation". তারপরে ওগুলি সব মিলে পরিণত হয় পুঁযে—অথবা তার আগেই হয়ে যায় "calcified," আক্রান্ত স্থানে চুন জমে

যেটা নাকি অসুখের বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এক ধরনের "arrested" হবার অবস্থা।

অপর পক্ষে, বাড়াবাড়ি হবার সুযোগ না পেয়ে অসুখ যদি ভালর দিকে যায় তবে "caseation" অবধি আদৌ গড়ায়না অথবা গড়ানর মত হলেও বেশি দূর এগুতে পারে না এবং "fibrous tissue" বলে নবগঠিত আরেক রকম টিস্যু সমস্ত টিউবার্ক্‌ল্‌ গুলিকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। এই "fibrosis" হয়ে যাবার অবস্থাটা হচ্ছে অসুখটার আরেক রকম ভাবে "arrested" হবার অবস্থা এবং এইটের ফলই অধিকতর সন্তোষজনক।

রোগ "অ্যারেস্টেড্‌" হওয়া এবং রোগীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাওয়া এক কথা নয়। এই রোগের ক্ষত এত ধীরে ধীরে সারে যে একেবারে "সম্পূর্ণ" সুস্থ হতে রোগীর কয়েক বছরও হয়ত লেগে যেতে পারে। রোগের কোনই উপসর্গ আর না থাকতে পারে, থুতুও হয়ত সম্পূর্ণরূপে জীবাণু-মুক্ত; কিন্তু ফুস্‌ফুসের ক্ষত-স্থানে "scar tissue" দ্বারা নব-নির্মিত স্থান এখনো হয়ত তেমন শক্ত হয়নি এবং Scar tissueর দেয়ালের মাঝে মাঝে এখনও অনেক স্থানেই পুঞ্জীভূত ব্যাধিগ্রস্ত টিস্যু হয়ত রয়েছে। এগুলির ভিতরে লক্ষ লক্ষ যক্ষ্মাজীবাণু বন্দী অবস্থায় রয়েছে। রোগীর অনিয়ম অত্যাচারের সুযোগ নিয়ে যে কোন মুহূর্তে এই জীবাণুর দল Scar tissueর দেয়াল ভেঙে পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠে আপনাদিগের করতে পারে দ্রুতগতিতে বিস্তার সাধন, এবং করতে পারে পুনরায় রোগীর প্রচণ্ড ক্ষতি সাধন।

স্যানাটোরিয়ামে আসবার জন্যে বহু সংখ্যক রোগীই চেষ্টা করে থাকেন এবং সকলেই যাতে চিকিৎসার সুযোগ পায় ডাক্তারের এটা দেখবার দরকার হয়; কাজেই একজন রোগী একেবারে ষোল আনা সুস্থ যতদিন না হন তত দিন পর্যন্ত তাঁকে স্যানাটোরিয়ামের একটি বিছানা অধিকার করতে দিয়ে রাখা কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভবপর হয়না। সাধারণতঃ একজন রোগীকে ততদিন

পর্যন্তই রাখা হয় যতদিনে তাঁর অবস্থাটা মোটামুটি নিরাপদ হয়ে ওঠে। স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসাকে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য করবার জন্যে তারপরে বাড়ীতেও তাঁকে ঠিক একই নিয়মে কাটাতে হবে।

আমেরিকান স্যানাটোরিয়াম অ্যাসোসিয়েশান এবং U. S. A.র *ন্যাশ্‌নাল টিউবারকিউলোসিস্‌* অ্যাসোসিয়েশান স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসার ফলাফলকে এই ভাবে ভাগ করাটা গ্রহণ করেছেন :

(১) আপাত-দৃষ্টিতে—"Cured".

রোগের কোন লক্ষণেরই আর প্রকাশ নাই ; থুতু, যদি থেকেও থাকে, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গিয়েছে সম্পূর্ণ জীবাণু-মুক্ত ; X-ray পরীক্ষা দ্বারা দেখা যাচ্ছে ক্ষত-স্থানগুলি সেরে গেছে। এবং রোগী সাধারণ ভাবে চলাফেরা, কাজকর্ম করে এই অবস্থায় অন্ততঃ দুটি বছর কাটিয়েছেন।

(২) "Arrested".

রোগের আর কোন লক্ষণ নাই ; থুতু, যদি থেকেও থাকে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের পরীক্ষায় সম্পূর্ণরূপে জীবাণু-মুক্ত ; X-ray পরীক্ষা দ্বারা দেখা যাচ্ছে ক্ষতস্থানগুলি ক্রমে কমে আসছে এবং আর বাড়ছেনা। এই অবস্থাটা রোগীর বজায় রাখতে হবে অন্ততঃ ছ মাস এবং শেষের দুমাস রোগীর এক ঘণ্টা ক'রে দৈনিক দুবেলা হাঁটা-চলার উপযুক্ত হতে হবে।

(৩) আপাত-দৃষ্টিতে—"Arrested".

রোগের কোন লক্ষণ আর নাই , থুতু থাকলেও তা আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত ; X-ray পরীক্ষা দ্বারা দেখা যাচ্ছে যে বুকের ক্ষত গুলি কমছে এবং আর বাড়ছে না। রোগীর এই অবস্থাটা থাকা চাই অন্ততঃ তিন মাস, এবং শেষের দু মাস রোগীর সক্ষম হওয়া চাই একঘণ্টা দৈনিক দুবেলা হাঁটা চলা করতে।

(৪) "Quiescent."

ব্যাধির লক্ষণ নাই ; থুতু যদি থাকে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তার ভিতর জীবাণু পাওয়া নাও যেতে পারে বা যেতেও পারে ; X-ray পরীক্ষা দ্বারা দেখা যাচ্ছে যে বুকের ক্ষত কমছে এবং আর বাড়ছে না। অন্ততঃ দুটি মাস রোগীর এই অবস্থায় থাকা চাই, এবং শেষের মাসটাতে রোগীর পারা চাই আধ ঘণ্টা করে দৈনিক দুবেলা হাঁটতে।

(৫) "Improved".

রোগের লক্ষণ কমে এসেছে বা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়েছে ; থুতু যদি থাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তার ভিতর জীবাণু পাওয়া নাও যেতে পারে বা যেতেও পারে ; X-ray পরীক্ষা দ্বারা দেখা যাচ্ছে যে বুকের ক্ষতগুলি কমে আসছে অথবা আর বাড়ছে না।

(৬) "Unimproved".

আসল উপসর্গগুলি কমে নাই, বা আরো বেড়ে গেছে। X-ray পরীক্ষায় দেখা গেছে রোগ সক্রিয় অবস্থায় আছে। বা ক্ষত আরো বেড়ে গেছে।

(৭) "Died."

অর্থাৎ—রোগী পটল তুলেছেন।

রোগ Arrested হবার পরেও রোগীর দীর্ঘকাল অবধি অত্যন্ত সাবধানে থাকবার দরকার হয়। আর, যাঁদের রোগ বেশি ছিল বা চিকিৎসার পরেও রোগের চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়ে যায় নাই, তাঁদের দীর্ঘকাল কেন, চিরকালই বেশ সাবধানতার সঙ্গে কাটাতে হবে। স্যানাটোরিয়াম থেকে মুক্তিলাভ করে বহু রোগীই স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি করে সুরু করতে গিয়ে পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। আরোগ্যলাভকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে স্যানাটোরিয়াম থেকে ছুটি পাবার পরে বুকের অবস্থা অনুযায়ী দুই থেকে পাঁচ বছর রোগীকে অপেক্ষা করতে হবে। বুকের জখম

বেশি থাকলে এই সময়কে আরও দীর্ঘ করে দিতে হবে। কিন্তু তার মানে মোটেই এ নয় যে এই সময়টা একেবারেই কিছু না করে রোগী আলস্যে অতিবাহিত করবেন ; যে জিনিসটা তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা শুধু হচ্ছে এই : তাঁকে এই সময়টা বিশেষ ভাবে একটি নিয়মিত জীবন যাপন করতে হবে এবং যখন যে রকম বিশ্রাম নেবার দরকার সেটি ঠিকমতন নিতে হবে। কোন প্রসিদ্ধ স্যানাটোরিয়ামের কর্তৃপক্ষগণ স্যানাটোরিয়াম থেকে মুক্ত রোগীদের পরবর্তী জীবন অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে যারা নাকি স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরিয়ে টি. বি.র দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় তারা সাধারণতঃ প্রথম দু বছরের ভিতরেই মরে ; কিন্তু যারা স্যানাটোরিয়াম ত্যাগ করবার পরে পাঁচ বছর বেশ ভাল ভাবে কাটাতে পারে তাদের ভিতর খুব কম ব্যক্তিই পরে টি. বি.তে মরে।

স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরুনর পরে রোগীর সর্বদা ডাক্তারের সংস্রবে থাকবার প্রয়োজন। মাসখানেক বা মাস দুই পর পর নিয়মিত বুক পরীক্ষা করাতে হবে। কখনো গয়ের উঠতে থাকলে সেটা পরীক্ষা করান দরকার—যক্ষ্মাজীবাণু সম্বন্ধে সন্দেহ ভঞ্জন করে নেবার জন্যে। রক্ত, থুতু ইত্যাদি মাঝে মাঝে পরীক্ষা করাতে অন্যথা করা তাঁর উচিত নয় এবং পুনরায় তিন থেকে ছমাস পর পর বা ডাক্তার যেরকম বলেন, বুকের আবার এক্স-রে ফটো নেওয়া উচিত। স্যানাটোরিয়ামে রোগী যে ভাবে ছিলেন ভবিষ্যতেও তাঁকে ঠিক সেই ভাবেই থাকতে হবে—মুক্ত এবং বিশুদ্ধ আলো-বাতাস-যুক্ত ঘরে শয়ন, নিয়মিত সময়ে সব রকম উপাদান-মিশ্রিত পুষ্টিকর আহার্য গ্রহণ, প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে প্রচুর বিশ্রাম—ইত্যাদি। কিছুকালের জন্যে থিয়েটার, সিনেমা, সভা-সমিতি—ইত্যাদি এড়িয়ে চলা ভাল। এমন নতুন কোন যক্ষ্মারোগীর সংস্পর্শেও আর তাঁর আসা উচিত নয় যার অসুখ সক্রিয় অবস্থায় আছে এবং যে নাকি অসতর্ক, অপরিচ্ছন্ন এবং যে তার

জীবাণুপূর্ণ থুতু সম্বন্ধে কোনরূপ সাবধানতা অবলম্বন করে না বা অপরের মঙ্গলের বিষয় চিন্তা করতে জানেনা। রাত্রে বেশ শীগ্‌গীর করে শুতে হবে এবং ৮।১০ ঘণ্টা বেশ ভাল ভাবে ঘুমুতে হবে। ধূলি ধোঁয়া দ্বারা দূষিত এবং জনাকীর্ণ স্থানে রোগীর বাসস্থান হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অন্য কোন ব্যাধি—যথা সর্দি, ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা—ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত না হতে হয়—সেদিকে রোগীর খুব হুশিয়ার থাকতে হবে। একেই এই রোগ, তারপরে আবার আরেকটি এসে জুটলে হবে গোদের উপর বিষফোড়া। রোগীর নিজের জন্য একখানা ঘর থাকবে এবং তিনি একাকী এক শয্যায় শয়ন করবেন।

দেখা যাচ্ছে যে স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরুনর দিনটি শুভদিন হলেও আবার ঠিক এই কারণেই দুর্দিনও বটে যে, বাইরের সমাজে রোগীকে মিশতে হবে প্রতি পদে পদে নিজের সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা নিয়ে, পরাজিত ব্যাধি রোগীর কোন্ অবস্থা বিপর্যয়ে কোন্ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুনরায় করে নিজ মূর্তি ধারণ! এই সময় থেকে আরেক ভাবে রোগীর দায়িত্ব আরও অনেক বেড়ে গেল। এতদিন তিনি যে রকম আবহাওয়ার ভিতর ছিলেন, বাইরের আবহাওয়া সে রকম নয়। হাঁসপাতালে ছিল শুধু তাঁকে সারিয়ে তুলবার আয়োজন এবং তাঁর নিজের সমস্ত চিন্তাও ছিল প্রধানতঃ সেই দিকেই নিবদ্ধ; কিন্তু হাঁসপাতাল থেকে বেরুনর পরে তাঁর নিজের সম্বন্ধে, পরিবারের সম্বন্ধে অথবা আরও দশটি বিষয়ে সহস্র চিন্তা তাঁকে করে তুলবে উদ্ব্যস্ত, হয়ত প্রধানতঃ আর্থিক কারণেই চিকিৎসকের উপদেশ যথাযথভাবে মেনে চলা হবেনা তাঁর পক্ষে সম্ভব। ফলে শরীর তাঁর আবার ভাঙবে। কতকগুলি অদ্ভুত, অনিবার্য অবস্থার ভিতর দিয়ে এতদিনকার চিকিৎসা, এতদিনকার তপস্যা, এতদিনকার বিপুল কৃচ্ছ সাধন—সব যাবে ব্যর্থ হয়ে। রোগী যেন স্বপ্নেও না মনে করেন যে, হাঁসপাতাল বা স্যানাটোরিয়াম থেকে

বেরুনর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর চিকিৎসা অথবা আরোগ্যলাভ সমাপ্ত হল। স্যানাটোরিয়াম তাঁকে কেবল একটা "Equilibrium" বা সাম্যের অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়ে দেয়, এবং জনৈক অভিজ্ঞ চিকিৎসক এই কথা বলছেন যে রোগীর স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনবার বা T. B. কে গ্রেপ্তার করবার ক্ষমতা স্যানাটোরিয়ামের কতখানি, চিকিৎসার শেষ ফলাফল দ্বারা এটা নির্ণয় হয়না ; বস্তুতঃ নির্ণয় হয় স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসা দ্বারা লব্ধ প্রতিরোধ-ক্ষমতাটাকে বা সাম্যাবস্থাটাকে সেই পারিপার্শ্বিকের ভাঙ্গবার ক্ষমতা—যে পারিপার্শ্বিকের ভিতর স্যানাটোরিয়াম থেকে মুক্ত হবার পরে রোগীকে বাস করতে হয় এবং কাজ করতে হয়।

এই ব্যাধিগ্রস্তের এমন সব শোচনীয় অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অনেক সময় চলতে হয় যে তার মনে এরকম চিন্তা আসা স্বাভাবিক যে এই রোগ সত্যি সত্যিই সারে কি না। আগেকার দিনে এটা ছিল "শিবের অসাধ্য ব্যাধি" বলে খ্যাত। বর্তমানেও বহুলোকের ধারণা এর চাইতে অন্য রকম নয়। মনে হয় উপযুক্ত সময়ে ধরাও পড়তনা এবং ধরা পড়লেও চিকিৎসা সুষ্ঠুরূপে হতনা, এবং ফলে মৃত্যু ছিল অনিবার্য ; তাইতেই লোকের মনে গড়ে উঠেছিল ঐ ধারণা। এই রোগ নির্ণয়ের প্রক্রিয়াদি এবং এই রোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি বর্তমান কালে যতদূর অগ্রসর হয়েছে তাতে আধুনিক যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞগণের মত হচ্ছে এই যে যক্ষ্মা একটা খুবই সেরে যাবার মতন রোগ। এবং এটা পরিষ্কার ভাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে, রোগ যদি উপযুক্ত সময়ে ধরা পড়ে এবং রোগী যদি উপযুক্ত চিকিৎসাধীনে ধৈর্য ধরে যত দীর্ঘদিন প্রয়োজন—কাটাতে পারে তবে ১০০-করা ১০০টি রোগীই ভাল হয়ে যেতে পারে! টাইফয়েড বা ডিপ্‌থেরিয়া বা অন্যান্য বহু রোগ সম্বন্ধেই যেমন একথা বলা যেতে পারে যে যথা সময়ে ধরা পড়লে এবং যথারীতি চিকিৎসা হলে এগুলিও সম্পূর্ণরূপে সাধ্য ব্যাধি, কিন্তু তার অন্যথা

হলেই অসাধ্য—তেমনি টি-বি সম্বন্ধেও সেই কথাই বলা যেতে পারে। যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর হার যে এত বেশি তার কারণ এটা মোটেই নয় যে না-সারাটা যক্ষ্মার একটা প্রকৃতিগত দোষ; বাস্তবিকপক্ষে যক্ষ্মারোগের আরম্ভটা এবং অগ্রসর হওয়াটা এমন নিঃশব্দে অনেক সময় হতে থাকে যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এর সন্ধান, রোগ-নির্ণয় এবং উপযুক্ত চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থায় বহু বিলম্ব ঘটে যায়। যে সব যক্ষ্মারোগী দীর্ঘকাল ভুগে অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বলছেন যে, তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই কোন না কোন সময়ে এমন অবস্থা থেকে থাকে যখন সুব্যবস্থা হলে তারা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারত !

যাদের কম অসুখ শুধু তাদের কথাই নয়, অধুনা সমস্ত বিশেষজ্ঞগণের মতই কম-বেশি এই ধরনের যে, যাদের অসুখ অনেকদূর এগিয়ে গেছে—এমন বহু রোগীকেও আধুনিক চিকিৎসা দ্বারা বেশ সুস্থ করে তোলা যেতে পারে—যদি নাকি বহুমূত্র অথবা অন্য কোন ক্ষয়কারী এবং কঠিন ব্যাধি সঙ্গে যুক্ত হয়ে রোগীর অবস্থাটি জটিল না করে তোলে। এটা যে একটা কঠিন ব্যাধি তা কেউই অস্বীকার করেন না, কিন্তু হলেই যে অম্নি হাত-পা ছেড়ে দিয়ে রাম নাম জপতে হবে—এটাও অধুনা কেউ মানতে রাজী নন। তবে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে এই রোগ থেকে সেরে যাওয়াটা অনেক সময়েই একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কাজকর্ম, অর্থোপার্জন করে সাধারণ সামাজিক জীবন যাপন এবং অন্য কাউকে আক্রান্ত না করে পূর্ণ জীবন-যাত্রার পরে স্বাভাবিক মৃত্যু—এইটেই আমি সেরে যাওয়ার মাপকাঠি ধরছি। যত শীঘ্র রোগ ধরা পড়বে এবং যত শীঘ্র ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে, তত শীঘ্র—তত কম অর্থব্যয়ে সেরে উঠবার সম্ভাবনা থাকবে এবং শারীরিক পঙ্গুতাও তত কম আসবে। যাদের অসুখ অত্যন্ত বেশি এগিয়ে গেছে এবং চিকিৎসাও যাদের আর ভালমত চলবার

উপায় নাই—তাদের কথা নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র। সারার অনুপাতটা বাস্তবিক পক্ষে এই সব অবস্থার উপরেই নির্ভর করে: রোগীর বয়স, অসুখের অবস্থা এবং প্রকৃতি, রোগী চিকিৎসায় কি রকম সাড়া দিচ্ছে এবং চিকিৎসা ঠিকমতন চলছে কিনা, তার প্রতি তার বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের ব্যবহার, তার আর্থিক সঙ্গতি, এবং তার আপন মনোবৃত্তি। (অসুখের "Stage" সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে রোগ অল্পদূর অগ্রসর হলেও একেবারে নিশ্চিতই সেরে যাবে এমন নয়; এবং অসুখ খানিকটা বেড়ে গেলেও তার অর্থ নিশ্চয়ই এটা নয় যে রোগীর আর কিছুতেই ভাল হবার সম্ভাবনা নাই।)

যথা-নিয়মে থেকে অনেকে যে বেশ ভাল হয়ে গেছেন, ভাল আছেন এবং কাজকর্মও করছেন—এমন কতক কতককে আমরা ব্যক্তিগত ভাবেও যে না জানি তা নয়; অন্যের মুখেও অনেকের কথা শুনেছি; বইতেও হয়ত অনেকের কথা পড়েছি। এঁদের জীবন থেকেই সব রোগীর আশান্বিত হতে হবে। যারা ভাল হলনা, যারা মৃত্যুমুখে পতিত হল, যাদের ক্ষেত্রে চিকিৎসা সার্থক হলনা, তারাই সব নয়! এবং শুধু তাদের দিকে তাকিয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতিকে অশ্রদ্ধার দৃষ্টি দিয়ে দেখবার চেষ্টাও নিতান্ত অযৌক্তিক ছাড়া আর কিছু নয়। এটা সত্যি কথা যে খাঁটি রকমের ষোল আনা আরোগ্যলাভ হয়ত সকলের জন্যে নয় এবং ঐ ঘোড়াডিম্বের "much improved" এর অবস্থায় বহু অসন্তোষের ভাব নিয়ে যে অনেক রোগীকে দিন যাপন করতে হয় তাও সত্যি; কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা যে অনেক রোগীকেই আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা ক'রে তাদের জীবনকে খানিকটা অন্ততঃ দীর্ঘ করে দিচ্ছে, তাদের ভিতরকার অনেককে আবার আরো খানিকটা ভাল ক'রে বেশ খানিকটা কাজকর্মেরও উপযুক্ত করে দিচ্ছে এবং বিশেষজ্ঞেরা যে বলছেন তাদের আবার অনেককে বেশ স্বাভাবিক

অবস্থায়ই ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে—এসব দ্বারা এই-ই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এই উন্নতিকে আর উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখা চলবেনা এবং অদূর ভবিষ্যতের জন্যে এর ভিতর বহু সম্ভাবনা যে নিহিত রয়েছে একথা সর্বাংশে স্বীকার্য। সব অসুখেই লোক মরে ; টি-বিতেও মরবে! অনেক অসুখ ভালও হয়, টি-বিও যতটা আপাততঃ হচ্ছে, ভবিষ্যতে তার চেয়ে আরও হবে! এর চাইতে বেশি আর কি আশা করা যায়?

বহু তথা-কথিত "সুস্থ" লোকের (পূর্ণ জীবন-যাত্রার শেষে মৃত্যুর পরে) দেহ পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে তাদের শরীরে সেরে-যাওয়া T. B.র চিহ্ন রয়েছে। তাদের জীবনে কখন যে তারা আক্রান্ত হয়েছিল, কখন যে তারা ভাল হয়ে গিয়েছিল—কিছুই তারা জানতনা! তারা আগাগোড়া সাধারণ জীবনই যাপন করে গিয়েছে। টি-বির ক্ষত যে বেশ ভাল ভাবেই সারতে পারে এটা তার প্রমাণ। কিন্তু এ-রকমটা যাদের ঘটেছে তাদের কপাল ভাল। যারা পীড়িত হয়ে পড়ল তাদের নিয়েই গোল!

আরোগ্যলাভের পথ দীর্ঘ হতে পারে, মনের দৃঢ়তা এবং সাহসের কঠিন অগ্নি-পরীক্ষা হতে পারে, কিন্তু এইটেই জেনে রাখা সব চেয়ে ভাল যে, রোগী অবশ্যই তাঁর সাধনার পুরস্কার পাবেন—কম বা বেশি।

রোগ আবার বেড়ে পড়াটাকে "relapse" বলা হয়ে থাকে। এই relapse যাতে না ঘটে, চিকিৎসার পথে তার জন্যে রোগীকে সর্বদা খুব সতর্ক থাকতে হবে। কখনো যদি সর্দিটর্দি করে বসে অথবা কাসির উপদ্রব সুরু হয়, তবে সেটা সম্পূর্ণ চলে না যাওয়া পর্যন্ত রোগী যেন বিশ্রামের ত্রুটি না করেন। সর্দিকে অবহেলা করা কখনই ঠিক নয়। সর্দি করলেই তাকে সারিয়ে ফেলবার জন্যে সব রকম চেষ্টা করতে হবে—অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থা নিয়ে। সর্দি-রোগগ্রস্ত লোককে এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ সর্দি সংক্রামক ব্যাধি। সামান্য সর্দিকেই অবহেলা করলে পরে সেটা শেষে বহু অনর্থের

কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে—রোগীর জানা উচিত। বাইরে বেড়াতে বেরিয়ে হঠাৎ কখনো বৃষ্টি এলে রোগী যেন ভুলেও কখনো দৌড় না মারেন—ভিজতে হয় ভিজবেন। রাস্তায় বেরুবার সময়ে রোদ থাকলে ছাতা নিতে কখনো ভোলা উচিত নয়, রোদে ঘোরা রোগীর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ফুসফুসের আক্রান্ত স্থান যখন সেরে আসতে থাকে তখন স্থিতিস্থাপকতাহীন নতুন তন্তু-উৎপত্তির অর্থাৎ scar-tissue দ্বারা নতুন ক্ষেত্র-গঠনের অবস্থাকে "Fibrosis" বলে। চলন্ত বাস বা ট্রাম থেকে লাফিয়ে পড়া বা তাতে দৌড়ে ওঠা, অথবা প্ল্যাটফরমের উপর দিয়ে ছুটে ট্রেন ধরতে যাওয়া—ইত্যাদি ধরনের দুটো চারটে অবিবেচনার কাজ এই Fibrosisকে ফাটিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট এবং এসব করতে গিয়ে বহু রোগী দীর্ঘ দিনের উপকার এক মুহূর্তে নষ্ট করে ফেলে রোগকে আবার বাড়িয়ে তুলেছেন। স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসার পরে অনেক সময় রোগীর চেহারা এত ভাল হয় এবং তিনি এত ভাল বোধ করেন যে, সে রকম হয়ত আগে তাঁর জীবনে কখনই ঘটেনি। কিন্তু শরীরটা তাঁর যতখানি ভাল 'লাগে', আসলে তা ঠিক ততখানি 'ভাল' নয়। এবং রোগী যেন সর্বদা স্মরণ রাখেন যে, যে সব পরিশ্রম অথবা 'ছোট-খাট' যে সব অসুখ-বিসুখ, বা কোনও মানসিক অশান্তি বা দুর্ঘটনা একজন সুস্থ লোকের পক্ষে কিছুই নয়, তা বহু সময়েই তাঁর পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। একজন সুস্থ লোকের চেয়ে শরীর সম্বন্ধে অন্ততঃ একশ গুণ বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তাঁকে। কোন কোন যক্ষ্মাবিশেষজ্ঞ তাঁদের রোগীদের এই কথা বলেছেন যে এমন ভাবে তোমরা সতর্ক থাকবে যেন তোমাদের শরীরটা কাঁচের বাসনের মত ঠুনকো! অপর একজন প্রসিদ্ধ যক্ষ্মাবিদের মত হচ্ছে এই যে রোগী এবং তাঁর চিকিৎসক উভয়ের পক্ষেই সব চেয়ে নিরাপদ নিয়ম হচ্ছে—যক্ষ্মারোগের সক্রিয় হয়ে উঠবার প্রবণতা সর্বদাই বর্তমান থাকে—এইটে সবসময়ে মেনে নেওয়া। একথা

প্রায় বলা চলতে পারে যে একবার 'infected' হওয়া মানে সর্বদা 'infected'!

নিজেকে অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত করে তোলাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগীর অসুখ পুনরায় বেড়ে পড়বার কারণ। বাস্তবিক, শুধু এই কারণটিতে যত সহজে এবং যত শীগ্‌গীর রোগ আবার বেড়ে পড়ে এমন আর কোন কারণেই পড়েনা, পুষ্টিকর খাদ্যের কথঞ্চিৎ অথবা সাময়িক অভাব ঘটলে নয়, অপেক্ষাকৃত খারাপ "Climate"-এ নয়, অপেক্ষাকৃত দূষিত বায়ুতে অবস্থানের ফলে নয়, অথবা অন্য কিছুতে নয়। রোগী যা-ই কিছু করুন না কেন, সে কাজকর্মই হোক, কথাবার্তা গল্প-গুজোব-হাসি-আড্ডাই হোক অথবা অন্য কোনরকম আমোদ-প্রমোদই হোক, তিনি যেন সর্বদা খেয়াল রাখেন যে, নিজেকে তিনি ক্লান্ত এবং অবসন্ন করে তুলছেন কিনা। নিজেকে খুব বেশি পরিশ্রান্ত করতে থাকলে কিছু দিনের ভিতরেই শরীর আবার ভেঙ্গে পড়বে। কোন কিছু করার পরে ক্লান্তি বা অবসাদের ভাব আসে এটা লক্ষ্য করবার সঙ্গে সঙ্গে সে সব কাজের মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে এবং নিয়মিত বিশ্রাম নিতে হবে। মাত্রা ছাড়িয়ে রোগীর কোন কাজই চলবেনা; শরীর বা মনের উপর কোনরকম অত্যাচারই খাটবেনা তাঁর। তাঁকে মনে রাখতে হবে যে, বিশ্রাম এবং ব্যায়ামের আপেক্ষিক মূল্য নিয়ে যখন তাঁর মনে দ্বন্দ্ব এসে উপস্থিত হবে, তখন যদি ভুলই করতে হয় তাহলে বেশি ব্যায়ামের চেয়ে বেশি বিশ্রাম নেবার দিকেই ভুল করা ভাল।

তবে একটা কথা না বলে পারা যায় না যে কতকগুলি রোগী আছে যারা খামখা বড় খুঁতখুঁতে হয়ে ওঠে। দুনিয়ার অন্য সব কিছু ভুলে গিয়ে, সব কিছু থেকে আগ্রহ হারিয়ে তারা কেবল সারা দিন রাত বসে বসে আর শুয়ে শুয়ে নাড়িই টিপছে আর পঞ্চাশ বার থার্মোমিটারই মুখে গুঁজছে। এই পাল্‌স্ ষাটের জায়গায় একষট্টি হয়ে গেল, এই

টেম্পারেচার আটানব্বই পয়েন্ট এক এর জায়গায় আটানব্বই পয়েন্ট দুই হয়ে গেল—এই নিয়েই দিন রাত ঘামাচ্ছে মাথা। আর, কেউ কাছে এলেই খালি তাদের প্রত্যেকের কাছে ওই-ই বলছে দিনরাত—আর কোন কথা নাই! অথচ বাস্তবিক-পক্ষেই হয়ত তাদের বুকের অবস্থা চমৎকার, চিকিৎসকও বেশ বেড়াতে-টেড়াতে বলেছেন; কিন্তু তাদের দুশ্চিন্তা আর যাচ্ছেই না! এসবও ভাল নয়। সর্বদা বেশ শান্ত ও সংযত মনে চলতে হবে, অথচ অকারণ এবং অন্যায় খুঁতখুঁতিকেও দিতে হবেনা প্রশ্রয়।…অবিশ্যি মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর দিন রাত রোগের কথা ভেবে ভেবে আর ভুগে ভুগে অনেক রোগীর এরকম বিভীষিকাগ্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তবুও এ অবস্থাটাকে কাটানর প্রয়োজন।

রোগীর যদি সুস্থ হয়ে যাবার পরে পুনরায় এই সব লক্ষণের কয়েকটি বা কোন কোনটি কখনও প্রকাশ পায়: অনবরত সর্দি লেগে থাকা, ভোর বেলার দিকে গয়ের-হীন অথবা-যুক্ত কাসি, প্লুরিসি, থুতুর সঙ্গে রক্তের ছিট, ওজন কমতে থাকা, শরীর অনবরত দুর্বল বোধ করা, রাত্রে ঘাম, রক্তহীনতা, ক্রমাগত পেটের গোলমাল, বুকে-পিঠে বেদনা, স্বরভঙ্গ, সামান্য শ্রমেই হাঁপিয়ে পড়া বা শ্বাস-কষ্ট, সন্ধ্যাবেলা অল্প জ্বর ক্রমাগত চলতে থাকা, স্ত্রীরোগীর পক্ষে ঋতুর গোলযোগ, অনিদ্রা—তবে রোগী আর কালবিলম্ব না করে ডাক্তারকে দিয়ে বুক পরীক্ষা করাবেন। এমন হতে পারে যে, যে কোন কারণেই হোক তাঁর অসুখ পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং বেশি বাড়াবাড়ি কিছু হলে অবিলম্বে পুনরায় কোন স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি হওয়া সঙ্গত কিনা সেকথা ভাবতে হবে। ব্যাধির লক্ষণের কোনটির পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যথাসময়ে রোগীকে সতর্ক হতেই হবে—নতুবা তিনি অবিলম্বে নিজের গুরুতর ক্ষতি করবেন। হয়ত কোন স্যানাটোরিয়ামে যাবার প্রয়োজন আদৌ না-ও

হতে পারে। হয়ত কয়েকটি দিন বা সপ্তাহের সম্পূর্ণ বিশ্রাম বা সাধারণ একটু চিকিৎসা (বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা) কিম্বা সাবধানতাতেই সাময়িক উপসর্গটি চলে যেতে পারে। কিন্তু যাই হোক না কেন, উপেক্ষা করা চলবেনা কিছুই, এবং যথাসময়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও করতে হবে—নিজের মঙ্গলাভিলাষী হলে। এই সময় বুকের একটা এক্স্-রে ফটো তুলবার ব্যবস্থা হয়ত বিশেষজ্ঞ দেবেন। বারে বারে "relapse" ঘটনাটিকে রোগী যেন বেশি "মজা" বলে ধরে না নেন। দীর্ঘদিন অসুখে ভুগবার ব্যবস্থা করলে কপালে যে শেষে কত দুঃখ জমে থাকবে—তা রোগী প্রথমটা বুঝতেই পারবেন না। নিজের অর্থ শেষ হবে, ধৈর্য শেষ হবে, আত্মীয় স্বজনের সমস্ত সহানুভূতি শেষ হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধিরও ক্রমবিস্তৃতির ফলে সুস্থ হবার সম্ভাবনা ক্রমেই যাবে দূরে সরে। প্রথম বার সুস্থ হবার পরেই রোগীর একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, আপ্রাণ চেষ্টায় কি করে সেই সুস্থতাকে বজায় রাখা যায়। অসুখের সুরুতেও যেমন অনেক সময় অল্পেতে সন্দেহ আসেনা, অনেক সময় অসুখের গতি-কে রোগী বা তাঁর চিকিৎসক ধরতে পারেন না, relapse এর বেলাতেও অনেক সময় এ ব্যাপার ঘটে। বাইরে কোন লক্ষণের প্রকাশ না করে বা অনুভব-যোগ্য কোন অসুবিধার সৃষ্টি না করে চাপা অসুখ ধিকি-ধিকি করে ক্রমে ধূমায়িত অবস্থা থেকে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে, এবং অনিয়ম অত্যাচারের ফলাফল ধীরে ধীরে হলেও একদিন না একদিন নিশ্চয়ই প্রকাশ পায়। প্রথমটা কড়াকড়ির ভিতর কাটিয়ে শেষে রোগী ভালভাবে একটু শক্ত হতে পারলে অনেক কাজই করতে পারবেন জীবনে—ভবিষ্যতের জন্যে এখন তাঁকে তৈরি হতে হবে ধীরে ধীরে। এটা স্বাভাবিক যে দীর্ঘ অসুস্থতা ভোগ এবং এই অসুখের নানা রকম বিশ্বাসঘাতকতার চেতনা এবং অনেক সময় একটা অন্ধকারময় ভবিষ্যতের কল্পনা রোগীকে বড়

বেশি দমিয়ে দেয়। কিন্তু রোগীকে মনে রাখতে হবে যে মানুষের সমস্তটা জীবনই একটা প্রকাণ্ড সংগ্রাম। সমস্ত ব্যর্থতাগুলিকে তাঁর চলতে হবে ক্রমাগত ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে, যেটুকু হারিয়ে গেল তার জন্যে মনের খেদ না রেখে করতে হবে তাঁর নতুন প্রচেষ্টা। নিজেই T. B.-গ্রস্ত Marcus Aurelius-এর এই কথাটির ভিতর একটি গভীর অর্থ নিহিত আছেঃ (আমার অনুবাদ): "যখন কোন কিছু বড় বেশি কষ্ট-দায়ক হয়ে ওঠে, এই কথাটি মনে রাখবেন—এই সব বিরুদ্ধ ঘটনা দুর্ভাগ্যের বিষয় কিছু নয়; একে ভালভাবে সহ্য করতে পারলে একটা সুবিধাজনক অবস্থার দিকেই মোড় ঘুরবে।" কোনরকম কাজ বা কোনরকম আনন্দ করতে না পেরে জীবনের যতখানি অংশ পীড়ার ভিতর দিয়ে কাটল তার জন্যে রোগীর মনে বেদনা আসা স্বাভাবিক—, কিন্তু, (আমার অনুবাদ):—

জীবনে পথ-রেখা কেমনে আঁকি'
চলিবে, এখনো যা রয়েছে বাকি,—
শুধুই অতীতেরে স্মরণ ক'রে
ব্যথার বারি যদি পড়ে গো ঝ'রে—?

(ব্রাউনিং)

বলেছি, অনেক সময়ে চিকিৎসার পরে রোগীকে ভারি স্বাস্থ্যবান বলে মনে হয়—যদিও ফুস্‌ফুসের অবস্থা এখনও হয়ত ততদূর সন্তোষজনক অবস্থায় এসে পৌঁছায় নাই। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং বাইরের লোক রোগীর বাইরের চেহারা (যা নাকি অনেক সময়েই চোখ-ঠকান)—দেখে নিশ্চিত ভাবে ধরে নেন যে, সে যে কেবল বিপদ থেকেই মুক্ত হয়েছে তাই নয়, তার অসুখ এবারে 'একেবারেই' ভাল হয়ে গেছে। তাঁরা তখন চান যে, সে এখন লাফালাফি-ঝাঁপাঝাঁপি করুক, সকলের

সঙ্গে মিশে দল বেঁধে হল্লা করুক, আড্ডা দিক, প্রাণ হয়ে যাক একেবারে গড়ের মাঠ। তাঁরা চান—কাজকর্ম সে সুরু করে দিক পুরোদমে, পালন করুক সর্ববিধ সংসারধর্ম, সমাজে বাস করে সকলের সঙ্গে রক্ষা করুক বিভিন্ন সামাজিকতা। সে যখন চট্ করে এগুলিতে রাজী হয়না, সে যখন সুস্থ লোকদের নানা রকম প্রচণ্ড অস্থিরতাকে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এড়িয়ে চলতে, তখন কেউই তাকে দেখে না ক্ষমার চোখে। সে হয়তঃ একটা ভারী জিনিস তুলতে বা নামাতে অস্বীকার করে, সে হয়ত দুপুর বেলাকার বিশ্রামের অবহেলা করে তার তরুণী বৌদির সঙ্গে বসে বসে খোস-গল্প করতে সব সময় রাজী হয় না, সে হয়ত তার মেসো মশায়ের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে গ্রামোফোনে দম লাগাতে প্রচুর ইতস্তত করে, অনেক মিষ্টি অনুরোধ বা অভিমান সত্ত্বেও সে হয়ত তার বান্ধবীকে নিয়ে প্রতিদিন থিয়েটারে অথবা সিনেমায় যেতে প্রবল আপত্তি তোলে, খানিকক্ষণ বেড়িয়ে টেড়িয়ে এসে অথবা অন্য কোন পরিশ্রমের কাজ করবার পরে সে হয়ত ঘণ্টাখানেক কি আধ ঘণ্টা বিশ্রাম না নিয়ে খেতে চায় না, এক একদিন সে বিকেলের দিকে থার্মোমিটারটা মুখে গোঁজে বা পাল্‌স্‌টা হয়ত একটু টেপে, সর্দি-কাসির ভাব হলে সে হয়ত দু চার দিন একেবারেই বিছানা থেকে নড়তে চায়না—এগুলি তাঁদের মনে প্রচণ্ড বিরক্তির করে উদ্রেক। তাঁরা বিদ্রূপের সুরে বলেন: ওসব ম্যানিয়া, আর কিছু নয়। কখনো হয়ত করেন আরও কঠোর মন্তব্য; এমন একটা সুস্থ জোয়ান লোক, এরকম নড়তে-চড়তে চায়না, সব সময়ে 'কেমন-কেমন' করে—এটা তাঁদের মনে জাগিয়ে তোলে ঘৃণার ভাবও। কেউ মন্তব্য করেন—ওসব মনের ব্যাধি। কেউ বা বলেন—ওসব প্রেমের ব্যাধি! তাঁরা মনে করেন—আল্‌সেমি করে দিন কাটানর লোকটি পেয়েছে একটি ছুতো, তার

বিশ্রামকে বা শরীরের জন্যে অতিরিক্ত কোন যত্নকে তাঁরা বিবেচনা করেন হাস্যকর বলে, করেন ভ্রূকুটি এবং নিন্দা। সকলের সহানুভূতি সে একে একে থাকে হারাতে, এবং সকলের নানা ভুল-বোঝাবুঝির মাঝখানে তার অবস্থা দস্তুরমতন বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। বাইরের লোকে, এমন কি অনেক অজ্ঞ চিকিৎসকও এই ব্যাধির সূচনা থেকে আগাগোড়া এটাকে "মানসিক" আখ্যা দিয়ে (যখন রোগীর প্রচুর যত্ন এবং চিকিৎসা দরকার) রোগীর অবস্থা যে কি রকম নিদারুণ ভাবে শোচনীয় করে তুলতে পারেন, তা নিউ ইয়র্কের জাতীয় যক্ষ্মা নিবারণী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত Out-door Life Journal নামক পত্রিকায় A. M. P. বলে একজন রোগী নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপূর্ণ "From the Frying Pan of T. B. into the Fire of Neurasthenia" নামক প্রবন্ধে এমন ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পড়লে শিউরে উঠতে হয়।

আরেকদল রোগীর, খুব সম্ভবতঃ অধিকাংশের, বিপদ আসে আরেক দিক থেকে। স্যানাটোরিয়াম-প্রত্যাগত রোগী হামেশাই এক শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসেন—যারা নাকি তাঁকে শেয়াল-কুকুরের চাইতেও বেশি হীন করে দেখবে এবং তাঁকে এড়ানর জন্যে তারা কোনরকম চেষ্টারই ত্রুটি করবেনা। টি. বি. হওয়ার দরুন সমাজে তাঁকে সাজতে হল একঘরে! কত আত্মীয় স্বজনের দ্বার যে এই রোগীর কাছে চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে তা বলবার নয়। এঁরা শুধু একটা কথা জানেন যে, এই ব্যাধিটা ভীষণ রকমের একটা ছোঁয়াচে ব্যাধি এবং হয়ত বা এই রোগীর চোখে চোখ পড়বা-মাত্রই এই ব্যাধি এসে দেহে আশ্রয় নেয়। স্যানাটোরিয়ামে যারা যায়নি তারা বরঞ্চ কতক ভাল; কিন্তু স্যানাটোরিয়াম-ফেরতা রোগী মানে একেবারে দাগী রোগী ("দাগী" চোর বলে না? সেই রকম)—এবং সে রোগীকে ঘরে ঢুকতে দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত নয়, তাকে আদর-আপ্যায়ন করা তো দূরে

যাক! স্যানাটোরিয়াম-ফেরতার চলাফেরাকে যে তাঁরা কি ভীষণ সংশয়ের চোখে দেখেন, তার সংস্পর্শে আসতে তাঁরা ভীষণ সঙ্কুচিত হয়ে যে কি রকম কানা-ঘুষো সুরু করেন তার বহু দৃষ্টান্ত আছে। রোগী অনেক সময়েই বিড়ম্বিত হবেন—বিনা কারণে এবং বিনা বিচারে। যখন অসুখ "arrested" হয়ে গিয়েছে, থুতুতে দোষ নাই, তখন রোগী যে আর infection ছড়ায় না, নিজের এবং অপরের যত্ন নেওয়া সম্বন্ধে স্যানাটেরিয়ামে সে বিশেষ ভাবে যা শিক্ষা করেছিল তা যে সে মেনে চলে, তার প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, শিক্ষা, বুকের অবস্থা···যাই হোক না কেন, এঁরা সে সব কিছুই দেখবেন না, শুনবেন না, এমন কি বুঝতেও চেষ্টা করবেন না। একথা অবিশ্যি খুবই সত্যি যে, প্রত্যেক স্যানাটোরিয়াম-ফেরতা রোগীই একই রকম বিবেচক এবং বুদ্ধিমান নয় এবং এটা অবশ্যই মানতে হবে যে এমন বাস্তবিকই অনেক রোগী আছে যাদের থুতুতে দোষ আছে অথচ অন্য সবাইকে নিরাপদ রাখতে তারা কোন রকম সহযোগিতাই করবেনা এবং কোন রকম কথায় বা উপদেশে কর্ণপাত না করে তারা ইচ্ছে করে এবং অত্যন্ত অসতর্ক ভাবে infection ছড়াবে। কিন্তু তাদের সঙ্গে সঙ্গে সবাইকেই ভীতিপ্রদ বলে বিবেচনা করা কতদূর যুক্তিযুক্ত? সর্বসাধারণের এটা জানবার দরকার যে, যেসব যক্ষ্মারোগীর থুতুতে যক্ষ্মাজীবাণু থাকে এবং তারা যখন কেশে যেখানে সেখানে গয়ের নিক্ষেপ করে এবং সর্বদা অত্যন্ত অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, তারাই হয় ঐ ব্যাধি-বিস্তারের জন্যে দায়ী। কিন্তু যে সব রোগী বিশেষ কোন পাত্রে থুতু ফেলে, সেই থুতু যথারীতি নষ্ট করে ফেলে এবং সব সময়ে অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তাদের থেকে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা নাই কিছুমাত্র। একজন রোগী যখন জোরে হাঁচে বা কাশে তখন ফুস্ফুসের গভীর তলদেশ থেকে নাক বা মুখ দিয়ে ছিটকে আসা জীবাণুপূর্ণ থুতুর কণা নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে কোন সুস্থ লোক টি. বি.

দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে, কিন্তু যখন রোগী স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস চালনা করে, তখন তার ব্যাধি যথেষ্ট দূর অগ্রসর হলেও, দেখা গিয়েছে তার পরিত্যক্ত প্রশ্বাসে টি. বি.র "জন্তু" নিক্‌লায় না। এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা না করে টি. বি.-রোগীর নাম শুনেই তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠাটাকে হাস্যকর ছাড়া আর কিছুই বলা চলেনা—বিশেষ করে উপযুক্ত চিকিৎসার পরে যখন তার রোগ নিষ্ক্রিয়, এবং থুতু অণুবীক্ষণের পরীক্ষায় জীবাণুশূন্য হয়ে যায়। উনুন থেকে ঘরে আগুন লাগবার সম্ভাবনা যতখানি, বাস্তবিক একজন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বুদ্ধিমান রোগী থেকে একজন সুস্থ লোকের যক্ষ্মাক্রান্ত হবার সম্ভাবনাও ততখানিই। অসতর্ক না হলে উনুনের আগুনে কখনই রান্নাঘর পোড়ে না; ঠিক সেই রকম নিতান্ত অসতর্ক না হলে কোন রোগী দ্বারা অপরের দেহে কখনই ব্যাধি-বিস্তার ঘটে না। অধিকাংশ স্যানাটোরিয়াম-প্রত্যাগত রোগী এই জন্যেই সর্বদা নিরাপদ যে, তারা এই ব্যাধি সংক্রান্ত নানা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করেছে, থুতু সম্বন্ধে যে যে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন—তা তারা উত্তমরূপ আয়ত্ত করেছে এবং স্যানাটোরিয়াম-জীবন তাদের ভিতরে জন্মিয়ে দিয়েছে একটি গুরুতর রকমের দায়িত্ব-বোধ। তারা তাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব অথবা সমাজের কোন লোকের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে—তা তারা কল্পনাও করতে পারে না। তা ছাড়া স্যানাটোরিয়াম হাঁসপাতালে থাকবার ফলে তাদের অভ্যাসটাই এমন অনেক সময় দাঁড়িয়ে যায় যে, যেখানে সেখানে থুতু ফেলতে অথবা নিজেরা কোনরকম নোংরা হয়ে থাকতে সর্বদাই তারা কুণ্ঠিত হয়। অবিশ্যি আমি আগেই বলেছি—একথা আমি কিছুতেই বলতে চাইনা যে, স্যানাটোরিয়াম হাঁসপাতালের বা বাইরের কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকা সব রোগীই এক ধাঁচের, সব রোগীই উপযুক্ত বিবেচনা-শক্তি এবং দায়িত্ব-জ্ঞান সম্পন্ন; কিন্তু তাদের ভিতরকার অন্ততঃ

কতকগুলি রোগীও যে এগুলি অন্যান্য অনেক রোগীর চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে অর্জন করে থাকে, একথা অস্বীকার করবার জো নাই।

যাই হোক, অভিজ্ঞতার ফলে এটা বোঝা গিয়েছে যে একজন রোগী সম্বন্ধে সাধারণের অজ্ঞতা বহুরকমেই আত্মপ্রকাশ করে থাকে এবং এই রকম পারিপার্শ্বিকের মাঝখানে চিকিৎসার সুফল নষ্ট ক'রে রোগীর নতুন করে গড়ে ওঠা স্বাস্থ্যের পুনরায় ভেঙ্গে পড়া কিছুই বিচিত্র নয়! রোগী কতজনকে তাঁর অবস্থা বোঝাবেন? কতজনের কাছে বকে বকে কতজনকে তিনি আলোকিত করতে পারবেন? কখনো বা তিনি এমন মজার লোকও দেখতে পাবেন যারা এদিকে বলবে যে তাঁর অসুখটা একটা ম্যানিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু তাদের সঙ্গে তিনি একটু মিশবার চেষ্টা করবামাত্র তাঁকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলতে কোন চেষ্টারই কসুর করবেনা। অর্থাৎ নিজেদের মাঝখানে তারা তাঁকে ফিরেও নিতে চাইবেনা, অথচ তিনি তাদের মাঝখানে ফিরে আসছেন না অথবা তাদের সঙ্গে সাধারণ সামাজিক জীবের মতন খাপ খাওয়াতে পারছেন না বলে তাঁকে বিদ্রূপ করতেও ছাড়বেনা! যাই হোক, রোগীকে বহু সময়েই এই দেখে বিস্মিত হতে হবে যে, তাঁর সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মনে যে কত অদ্ভুত এবং বীভৎস ধারণা আছে—অথচ তারা তাদের অজ্ঞতা চায়না স্বীকার করতে। কত ভাবে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে, কিন্তু নিজের দিকে চেয়ে তাঁকে সংযত হতেই হবে—উত্তেজিত হলে চলবেনা। নিজের অবস্থা বোঝানর চেষ্টায় অহরহ তাঁর যে বিড়ম্বনা ঘটবে, তাতে মুষড়ে না পড়বার মতন সংসাহস তাঁর অন্তরে রাখতেই হবে।

কখনো কখনো অবিশ্যি রোগী নিজের দোষেও নিজের ক্ষতি করে বসেন। বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় স্যানাটোরিয়াম, হাঁসপাতালে দীর্ঘদিন আটকে থাকাটা তাঁর মনের উপর একটি বিরুদ্ধ ক্রিয়া করে এবং এ সব জায়গা থেকে বেরুনর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সুস্থ লোকেদের

সঙ্গে মহোৎসাহে স্বাভাবিক জীবন যাপন করবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা জন্মে তার মনে—এই জীবনের পরিশ্রম এবং উত্তেজনার পরিণামের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না রেখে। স্যানাটোরিয়ামের বা হাঁসপাতালের এক-ঘেয়ে আবহাওয়া থেকে যেই নাকি রোগী পা বাড়ান বাইরের মনোহর, কর্মব্যস্ত জগতে—অমনি সব সংযম আরম্ভ করেন তিনি হারাতে। কিছুমাত্র বিচিত্র নয় যে, সব কিছু অতিরিক্ত রকম উপভোগ করতে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতেই ডেকে আনেন তিনি নিজের ধ্বংস—শীগ্‌গীরই হোক বা একটু দেরিতেই হোক। কিন্তু বার বার যদি তাঁকে অসুস্থ হতে হয় তবে নানা দুর্গতি উঠবে তাঁর কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে—এবং প্রত্যেকটি "relapse" তাঁর উপর অধিকতর শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং আর্থিক ক্ষতির ছাপ যাবে রেখে। স্যানাটোরিয়ামে যে ভয়ানক রকম কড়া-কড়ির ভিতর দিয়ে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন, স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরোন মাত্র অনেক রোগী আর্থিক অবস্থাঘটিত কারণেও (পূর্বে যার উল্লেখ একবার করেছি) সেই কড়াকড়িগুলির প্রতি উদাসীন হতে সুরু করেন—যেগুলি নাকি তাঁর কঠোর ভাবে মেনে চলবার দরকার—স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরোবার পরে বহুকাল অবধি। পরিবার প্রতিপালনের গুরু দায়িত্ব এই সময় এসে পড়তে পারে তাঁর উপর, অথবা তাঁর নিজের ব্যবস্থাও নির্ভর করতে পারে তাঁর নিজেরই পরিশ্রমের উপর—যা নাকি তাঁর ভাল থাকবার পক্ষে এখন অনুকূল না হওয়াই সম্ভব।

এবারে এই প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাক। সুস্থ হয়ে উঠবার পর রোগীর নানা প্রকার ভাবনার ভিতরে অন্যতম প্রধান ভাবনা যে বিষয়ে এসে জোটে, সেটি হচ্ছে তাঁর কাজ-কর্ম সম্বন্ধে। যাঁর অর্থের কোনই অপ্রতুল নাই এবং খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ, নভেল-নাটক নিয়ে যতকাল খুশি কাটাতে যাঁর কোন অসুবিধা নাই, তাঁর কথা আপাততঃ

এখানে আমি বাদ দিচ্ছি। কিন্তু যাঁর অবস্থা সে রকম নয়, সুস্থ হবার পর কাজ না করলে যাঁর চলবে না, সেই রকম রোগীই সমস্থাস্থল এবং অবস্থাক্রমে সেই রকম রোগীর সংখ্যাই সকল দেশেই পূর্বোক্তদের চাইতে বহুগুণে বেশি।

কোন্ রোগী যে কি কাজের এবং কতখানি কাজের উপযুক্ত হবেন, তা তাঁর বুকের অবস্থাই যে সর্বদা নির্দেশ করে দেবে—একথা বলাই বাহুল্য। চিকিৎসার অব্যবহিত পরে রোগীর নিজের জন্য এমন কোন কাজ বেছে নেওয়াই ভাল বা নিজের কাজকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে নেওয়াই ভাল যাতে নাকি তাঁর খাটুনিটা অতিরিক্ত বা অনিয়মিত না হয়ে পড়ে। যে কাজে অতিরিক্ত রকম শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম নাই অথবা মুক্ত এবং বিশুদ্ধ আলো-বাতাসে থাকবার পক্ষে যে কাজ বিঘ্নের মতন এসে দাঁড়াবেনা, রোগী সে রকম সমস্ত কাজেরই উপযুক্ত হতে পারেন, কিন্তু কাজে ঢুকবার পরে প্রথম প্রথম রোগীকে যে কত সতর্ক হয়ে থাকবার দরকার হয়, তা বলবার নয়; কারণ কিছুকাল কাজ করবার পরেই শরীর আবার খারাপ হতে সুরু করেছে, অথবা কমে-যাওয়া-রোগ আবার বেশ ভাল মতন বেড়ে পড়েছে—এমন ঘটনা অহরহই ঘটছে।

কিন্তু একজন সুবিখ্যাত যক্ষ্মাবিদ্ চিকিৎসক এই কথা বলছেন যে অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় যে "relapse"টা কাজের দরুন যতটা ঘটে, তার চেয়ে বেশি ঘটে দিনের কাজের শেষে খেলাধূলো আর আমোদ-প্রমোদের দ্বারা। এই চিকিৎসকের কথাটি প্রত্যেক রোগীর খেয়াল রাখবার দরকার। যে সব রোগী কাজ-কর্ম সুরু করবেন, কাজ-কর্মের সময়টুকু বাদে দিনের অন্য অংশ সম্পূর্ণ বিশ্রামে অতিবাহিত করবার পক্ষে কোনও বিঘ্ন না ঘটে, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন। রবিবার অথবা এ রকম অন্য কোন ছুটির দিনের সদ্ব্যবহার সর্বদাই সম্পূর্ণ বিশ্রাম দ্বারা করতে হবে। রোগী কিছুতেই একজন বিজ্ঞ চিকিৎসকের এই কথা না ভোলেন যে, একজন

আরোগ্যলাভকারী রোগী হয় কাজ করতে পারেন, না হয় খেলতে পারেন; কিন্তু দুটো একসঙ্গে করতে পারেন না!

অসুস্থ হবার আগে যাঁরা লেখা সংক্রান্ত কাজ করতেন, স্যানাটোরিয়ামে থাকতে থাকতেই স্যানাটোরিয়াম থেকে ছুটি পাবার কিছুদিন আগে থেকে তাদের অল্পে অল্পে খানিকটা করে লেখা অভ্যাস করা উচিত। অসুস্থ হয়ে যারা ছুটি নিয়ে হাঁসপাতালে এসেছিলেন ব্যাধির চিকিৎসার জন্যে, এবং হাসপাতাল ছাড়বার ঠিক পরেই যাঁদের কাজে গিয়ে ভর্তি হতে হবে, তাঁদের পক্ষে ত এটা করা খুবই উচিত। স্যানাটোরিয়ামে সাধারণতঃ "walking exercise" ই দেওয়া হয়। হয় ত রোগী দু আড়াই মাইল হাঁটতে কোনই অসুবিধা বোধ করেন না এবং শরীরও তাঁর বেশ ভালই থাকে। কিন্তু আপিসে গিয়ে যখন কয়েক ঘণ্টা তাঁকে লেখার কাজ করতে হবে, তখন শরীর চট করে খারাপ হতে সুরু করবে। হাঁটা-চলা এবং লেখাপড়া এদুটো এক ধরনের পরিশ্রম নয়। যে ধরনের কাজ রোগীকে ভবিষ্যতে করতে হবে, চিকিৎসা দ্বারা ক্রমে সুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে দশ-পনের মিনিট থেকে সুরু করে ক্রমে সময় বাড়িয়ে সেই কাজটা খানিকটা অভ্যাস করে গেলে শেষে অতটা বেগ পেতে হয় না।

এখানে এই বিষয়টি একটু ভাল করে বোঝাতে চাই যে, বিশ্রামের অবস্থা থেকে শ্রমের অবস্থায় ফিরে যাবার সময়ে রোগীকে সব সময়েই ধাপে ধাপে এবং একটা নির্ধারিত সময়ের ভিতর দিয়ে নিয়মিত ভাবে অগ্রসর হতে হবে। এটা বেশ ভাল রকম সহ্য হয়ে যাবার পরে শ্রমের সময়ের বা পরিমাণের কিছুটা এদিক ওদিক হলে, এবং সাধারণ জীবন যাপন করবার কালে তা হবেই, শরীর আর ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। শ্রম আরম্ভ করবার সময়ে যদি সেটা যখন তখন যেভাবে সেভাবে করতে থাকা যায় সেটার ফলও খারাপ হবে এবং সেটা উপযুক্ত পরীক্ষাও হবে না।

রোগটা যখন 'টি. বি.'—

অনেক রোগী দীর্ঘকাল বিশ্রাম নেবার ফলে এবং নিষ্কর্মা হয়ে থাকবার ফলে খানিকটা কর্ম-পরাঙ্মুখ হয়ে ওঠেন—এমন কি অনেক সময়ে দস্তুরমতন কুঁড়ে হয়ে যান। আবার কেউ কেউ বা অসুখের প্রকৃতি বুঝতে পেরে অথবা দীর্ঘকাল নানা রকম বাধা-নিষেধের ডোরে বাঁধা থাকার ফলে হয়ে ওঠেন খানিকটা ভীতু। মনে যেন থাকে যে, উচ্ছৃঙ্খলতা ও কর্মানুরক্তি এক জিনিস নয় এবং সতর্কতা ও ভীরুতাও এক জিনিস নয়। রোগীকে কাজ করতে হবে, কিন্তু কোনরকম মাত্রা ছাড়ান বাড়াবাড়ি নিষেধ; রোগীকে নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সর্ববিধ যত্ন নিতে হবে, কিন্তু তাই বলে সত্যিকারের "ম্যানিয়া"তে সেটা গিয়ে না দাঁড়ায়—তা খেয়াল রাখতে হবে। "বিশ্রামের" সঙ্গে যেন "কুঁড়েমির" কেউ খিচুড়ি না করে ফেলেন। নিজের সীমা মেনে নিয়ে আপন কাজে রোগীকে লিপ্ত থাকতে হবে এবং শরীরের যত্ন ও কাজ দুটোই একসঙ্গে বেশ বিবেচনা করে চালাতে হবে। রোগী পূর্বে যে কাজ করতেন, তা যদি অতিরিক্ত শ্রমসাধ্য হয় এবং যে পারি-পার্শ্বিকের ভিতরে কাজ করতেন, তা যদি তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে কোনভাবেই অনুকূল না হয়, অথবা যে কাজের জন্যে তাঁকে হয়ত এই ব্যাধিগ্রস্ত হতে হয়েছিল, সে কাজে আর তাঁর ফিরে যাওয়া সঙ্গত নয়। অর্থ উপার্জন কিছু কম হয় সেও ভাল, তবুও এমন কাজ নিজের জন্যে বেছে নিতে হবে, যাতে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ আর কোন মতেই না ঘটতে পারে।

যে সব জিনিস নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে এবং ফুসফুসে প্রবেশ লাভ করে নিশ্বাসের সঙ্গে, সে সব জিনিসের কাজ ক্ষয়-রোগীর পক্ষে ভাল নয়। ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি শান দেওয়া বা তৈরি করা, চীনেমাটির বাসন প্রস্তুত করা, সোনা, কয়লা, অভ্র—এসবের খনিতে কাজ করা, চুন বা সুরকির গুদামে, ধুলো-ধোঁয়াময় মুক্ত-বায়ুহীন অন্ধকার কোন ফ্যাক্টরিতে কাজ করা, পাটের আঁশ ছাড়ান, তুলো ধোনা,

পাট বা শনের গুদামে, চাউলের কলে কাজ করা, সহরের রাস্তা, হাঁসপাতাল, আপিস ইত্যাদি ঝাঁট দেওয়ার কাজ করা, অনেক সময় দরজীগিরি বা তাঁতের কাজ—ইত্যাদি টি-বি রোগীর পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। মুক্ত-বায়ু-শূন্য এবং অন্ধকার ঘরে চব্বিশ ঘণ্টা বসে বসে ষ্টেশন-মাস্টারি বা ছাপাখানার কম্পোজিটারি বা কেরানীগিরি, ইত্যাদিও সমর্থনযোগ্য নয়।

অনেক ডাক্তারের মতে সুস্থ হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর একটা কিছু কাজ নিয়ে থাকা খুবই উচিত, যাঁদের সঙ্গতি আছে তাঁদেরও। নিষ্কর্মা অবস্থায় থাকবার ফলে মনে আসে নানারকম খাম-খেয়ালির ভাব—"অলস মস্তিষ্ক"টা ক্রমে পরিণত হয় শয়তানের কারখানায়। এবং নিজেকে সুস্থ করে তুলবার পথে সে অবস্থাটা খুব অনুকূল নয়। কোন ডাক্তার কর্মক্ষম টি-বি রোগীদের সম্বন্ধে এমন কথাই বলেছেন যে বেতন না নিয়ে কাজ করাও ভাল তবুও একেবারে নিষ্কর্মা থাকা উচিত নয়। T. B. সংক্রান্ত একখানি বইতে একজন ডাক্তার লিখেছেন যে, তাঁর স্যানাটোরিয়ামের একজন রোগিণী—যাকে নাকি অত্যন্ত দীর্ঘকাল যাবৎ সম্পূর্ণ বিশ্রামের অবস্থায় রাখতে হয়েছিল—ক্রমে ক্রমে পড়েছিল বড় বেশি রকম মন-মরা হয়ে। দিনরাত কি সব দুশ্চিন্তা করত, নানারকম স্নায়বিক বিপর্যয়ও এসে দিয়েছিল দেখা। এই অবস্থায় ডাক্তার তাকে একটু একটু করে এটা-ওটা-সেটা হালকা কাজ করবার অনুমতি দিলেন। ক্রমে ক্রমে কাজে সে এমনি রস পেয়ে গেল, আর অল্প দিনের ভিতরেই তার শরীর-মনের এত উন্নতি সাধিত হল যে, সবাই আশ্চর্য বোধ না করে পারেনি। জনৈক সুবিখ্যাত যক্ষ্মা-তত্ত্ববিদ্‌ও বলছেন যে নিয়মিত একটা কাজের ভিতর না থাকলে শারীরিক ক্রিয়ার কতকগুলি অবনতি পরিলক্ষিত হয়—এবং সেটা সাধারণ ভাবে সকলের বেলায় যেমন, যক্ষ্মারোগীর বেলাতেও তেমন। যে সব রোগী বেশ একটা নিয়মের ভিতর

দিয়ে শারীরিক শ্রম-ঘটিত কাজ আরম্ভ করে চলতে থাকে তারা শীগগীরই বুঝতে পারে যে তাদের দৈহিক বল আস্তে আস্তে কেমন বেশ ফিরে আসছে এবং তাদের এই বুঝতে পারাটার সঙ্গে থাকে আরেকটি মনোরম চেতনা— যা নাকি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে একটা নিয়মিত শারীরিক ক্রিয়ার সঙ্গে এবং দৈনিক কর্মপদ্ধতির ভিতরে শরীরকে খাপ খাইয়ে নেবার সঙ্গে। এবং একথা অস্বীকার করা যায় না যে, রোগীর উপর এই রকমের দৈনিক কর্মপদ্ধতি একটা বিশেষ রকম অনুকূল নৈতিক এবং মানসিক ক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

এই প্রসঙ্গে সাধারণভাবে সকলে জেনে বোধ হয় আমোদ পাবেন— পৃথিবীর বহু বড়লোক, বহু বিখ্যাত লোক, বহু কর্মী, গুণী লোক যক্ষ্মাগ্রস্ত ছিলেন। যক্ষ্মারোগীদের অনেককে একটু বেশি আবেগ-প্রবণ এবং মনীষাসম্পন্ন বলে দেখা গিয়েছে এবং অনেকে যক্ষ্মারোগের সঙ্গে প্রতিভার নিকট সম্পর্ক দেখিয়েছেন।

শুধু এক সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকেই বেছে নেওয়া এই নামের তালিকাটি থেকেই দেখা যাবে যে এই ব্যাধি এবং সৃষ্টি-প্রতিভা ও সেদিক থেকে পূর্ণতা-প্রাপ্তি কেমন পাশাপাশি চলেছে।

Milton, Pope, Shelley, Hood, Keats, Elizabeth Barrett Browning, Francis Thompson, Goethe, Schiller, Moliere, Channings, Merimee, Thoreau, Descartes, Locke, Kant, Spinoza, Beaumont, Samuel Johnson, Sterne, De-Quincey, Scott, Jane Austen, Charlotte, Emily এবং Ann Bronte, Stevenson, Balzac, Voltaire, Rousseau, Washington Irving, Hawthorne, Gibson, Kingsley, Ruskin, Emerson, Cardinal

Manning, Lanier, Marie Bashkirtseff, Robert Southey, Westcott, Georges de Guein, David Gray, Amiel, John R. Green, Robert Pollok, Hannah More, James Ryder Randall, N. P. Willis, John Addington Symonds, Stephen Crane, Katherine Mansfield, Paul Lawrence Dunber, এবং Eugene O' Neill.

এই তালিকার সঙ্গে Cicero, Demosthenes, Galen, Marcus Aurelius, Edgar Allan Poe, Chekov, Dostoevskie, Chopin, Maxim Gorky—ইত্যাদির নামও যুক্ত হতে পারে।

পাঠক পাঠিকা জেনে বোধ হয় আমোদ পাবেন যে গর্কীর দেহে টি-বির উৎপত্তির কাহিনী তাঁর নিজের রচিত কাহিনীগুলির চেয়েও রোমাঞ্চকর। অনেক বছর আগে তিনি Nigni Novgorod গভর্ন-মেণ্টের অধীন এক ক্ষুদ্র গ্রামে এসেছিলেন—এক ভবঘুরের বেশে। একদিন তিনি দেখতে পেলেন একখানা গাড়ির চারধার ঘিরে কতকগুলি গ্রাম্য লোক জটলা করছে। সেই গাড়ির সঙ্গে মাথার চুল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে একজন স্ত্রীলোককে। ঐ অবস্থায় তাকে হেঁচ্‌ড়ে টেনে নেওয়া হচ্ছে গ্রামের রাস্তাগুলিতে। কোন নারী ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধিনী হলে তার প্রতি ছিল এই সুপরিচিত শাস্তির ব্যবস্থা। এই বীভৎস দৃশ্যে গর্কীর হৃদয় হয়ে উঠল আন্দোলিত, তিনি লোকগুলিকে থামতে বললেন। যখন তারা অস্বীকার করল, তিনি চালাতে থাকলেন তাদের উপর ঘুষি। ক্রুদ্ধ গ্রামবাসী তাঁকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে ফেলে গেল চলে। তাঁর একটি দিককার বুককে তারা ভীষণভাবে জখম করে দিয়েছিল। সেই দিককার ফুস্‌ফুসেই যক্ষ্মা করল আত্মপ্রকাশ। বহু বছর তিনি কাটিয়েছেন মাত্র একটি ফুস্‌ফুস্‌ নিয়ে। কয়েক বছর আগে

যখন তাঁর মৃত্যু হল, সেই গ্রামেরই সমস্ত লোকে মিলে একখানা এরোপ্লেন ভাড়া করে চল্লিশ বছর আগেকার উক্ত ঘটনা যারা চাক্ষুষ দেখেছিল এমন দুইটি ব্যক্তিসহ একদল প্রতিনিধিকে পাঠাল—গর্কীর মৃতদেহের সামনে অনুতাপ জানিয়ে আসবার জন্যে !

এলিজাবেথ ব্যারেট্ ব্রাউনিং গুরুতর শারীরিক অক্ষমতা নিয়ে শুধু যে অবিরত লেখায় এবং পড়ায় অত্যদ্ভুত মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাই নয়, এবং প্রতিভাশালিনী কবি বলেই যে তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাই নয়, দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর যক্ষ্মারোগকে শরীরে বহন করে—এবং এই অবস্থায়ই প্রেমের গাঢ় পরিণতির ফলে কবি রবার্ট ব্রাউনিংকে বিবাহ করে—সাংসারিক দিক থেকেও তিনি পত্নী ও মাতৃরূপে নিজেকে সুন্দর করে তুলেছিলেন ফুটিয়ে।

ডস্টয়েভ্স্কি আজীবন যুদ্ধ করে গেছেন বিপুল দারিদ্র্যের সঙ্গে, আর এই দুরন্ত যক্ষ্মারোগের সঙ্গে। রাশিয়ায় বিপ্লবের আগুন উঠল জ্বলে, তাতে যোগ দিলেন ডস্টয়েভ্স্কি। সাইবেরিয়ায় হল তাঁর নির্বাসন। সেখানে তাঁর শারীরিক কষ্ট উঠেছিল চরমে। কিন্তু তাঁর মনের জোর ছিল অসাধারণ, তেজ ছিল তাঁর দুর্দমনীয়। আগেই তিনি বই রচনা করতে সুরু করেছিলেন, কারাগার থেকে বেরিয়েও আরও মরিয়া হয়ে লাগলেন সেই কাজে—একদিকে ক্ষুধার তাড়না, আরেক দিকে পাওনাদারদের তাগিদে উন্মাদ-প্রায় হয়ে। বিয়েও তিনি করেছিলেন দুবার। প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর জীবন বিষময় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরে যাঁকে বিয়ে করেন তাঁর দ্বারা তাঁর অনেক সহায়তা হয়েছিল। শেষের দিকে আর্থিক স্বচ্ছলতা তাঁর এসেছিল ; এবং সমগ্র পৃথিবীতে অসামান্য খ্যাতির মাঝখানে করতে পেরেছিলেন তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত। ভীষণ রকম রক্তবমি করে একদিন তিনি শয্যা নিলেন, এবং সেই-ই হল তাঁর শেষ শয্যা নেওয়া।

—রোগটা যখন 'টি. বি.'

জার্মানির অমর নাট্যকার জন ফ্রেডরিক শিলারও ছিলেন দীর্ঘকাল যক্ষ্মাগ্রস্ত। নাটক রচনায়, পত্রিকা পরিচালনায় তিনি করতেন কঠিন পরিশ্রম। বিদ্যা, জ্ঞান, অর্থ উপার্জনের জন্যে তিনি করেছিলেন কঠোর সংগ্রাম, অবস্থার ভ্রূকুটির প্রতি ছিল তাঁর অসীম উপেক্ষা। তিনি বিবাহ করেছিলেন এবং হয়েছিলেন সন্তানেরও জনক।

ইংল্যাণ্ডের কবি জন কীটস্‌ও পড়েছিলেন এই ব্যাধির কবলে এবং অল্প বয়সেই হয় তাঁর জীবনান্ত। তাঁর মা এবং ভাইয়ের মৃত্যুও এই ব্যাধিতেই হয়। কিন্তু কীটস্‌এর ক্ষণস্থায়ী জীবনেই তাঁর প্রতিভা উঠেছিল বিকশিত হয়ে; তিনি জগৎ-কবি-সভার মাঝখানে গ্রহণ করেছিলেন একটি শ্রেষ্ঠ আসন!

কেউ কেউ এমন কথাই বলেছেন যে, অনেক চিকিৎসকের মতে যক্ষ্মাব্যাধি মনে একটি প্রেরণা আনে, এবং এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত না হলে খুব সম্ভবতঃ Edgar Allan Poe এবং Robert Louis Stevenson তাঁদের অপূর্ব, বিখ্যাত পুস্তকগুলি মোটে রচনা করতেই পারতেন না!

(Stevensonএর স্ত্রী ছিলেন বড় বুদ্ধিমতী এবং স্বামী সম্বন্ধে সতর্কতাও ছিল তাঁর প্রচুর। একবার তিনি কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করলেন যে Stevensonকে যারা দেখতে আসেন তাঁদের কারুর সর্দি-জাতীয় কোন ছোঁয়াচে অসুখ থাকলে তাঁর স্বামীরও সেই উপদ্রব এসে জোটে। একদিন তিনি দেখলেন যখন তাঁর স্বামীর চিকিৎসক ঘরে এসে ঢুকবেন তখন তিনি হাঁচছেন এবং তাঁর নিজেরই সর্দি করেছে। দেখবামাত্র মিসেস্ স্টিভেন্‌সন্ চিকিৎসককে কিছুতেই আর তাঁর কৃতী, সুবিখ্যাত রোগীর কক্ষে দিলেন না প্রবেশ করতে!)

কেউ বলছেন যে, বেশ ভাল করে গুছিয়েই একথা বলা যেতে পারে যে যক্ষ্মার বিষ নিশ্চিতভাবেই একটা মানসিক সজীবতার সৃষ্টি করে এবং

মস্তিষ্কশালী ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তির এই প্রকারের উত্তেজনা এমন একটি জিনিসের জন্ম দান করে যা হয়ে থাকে একেবারে অভিনব, অপূর্ব। যদি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এটা নিঃসন্দেহরূপে কখনো প্রমাণিত হয় যে, যক্ষ্মার মতন ভয়ঙ্কর ব্যাধি মানব-প্রতিভার উচ্চতম দানের কাজে সুনির্দিষ্টরূপে সহায়ক হয়ে থাকে তা হলে আমাদের সামনে এই অদ্ভুত সমস্যা এসে দাঁড়াবে যে, সঙ্গীত বা সাহিত্য জগতের কতকগুলি প্রতিভার বিস্ময়কর সৃষ্টিকে হত্যা করে এই ব্যাধিকে নির্মূল করবার চেষ্টায় আমরা সত্যিই লাভবান হব কিনা!

(যতদূর মনে পড়ছে, জার্মানির শ্রেষ্ঠ সুর-শিল্পী বিঠোফেনও ছিলেন একজন যক্ষ্মারোগী)।

সাহিত্যে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান "নোবেল পুরস্কার" প্রাপ্ত Eugene O' Neill এর ভবিষ্যৎও গড়ে উঠেছিল যখন তিনি একটি T. B. স্যানাটোরিয়ামে ছিলেন চিকিৎসার্থে। তিনি নোবেল প্রাইজ পাবার পরে তাঁর সম্বন্ধে বেরিয়েছিল যে তাঁর স্বাস্থ্য, যা নাকি কোনকালেই সে রকম মজবুত ছিল না, এক সময়ে ভেঙ্গে পড়ে পথ করে দিল জ্বর এবং যক্ষ্মার। ইচ্ছার ঘোরতর বিরুদ্ধে তাঁকে যেতে হল একটা স্যান.টোরিয়ামে এবং যক্ষ্মা-ব্যাধির সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে থাকতে হল সেখানে ছমাস। বাধ্য হয়ে এই যে তাঁকে বিশ্রাম নিতে হল—ছদ্মবেশে এটা এল তাঁর জীবনে আশীর্বাদের মত। তিনি ভীষণ রকম পড়তে সুরু করে দিলেন—একধার থেকে একেবারে লোভীর মত। এবং অবশেষে স্থির করলেন তিনি হবেন একজন নাট্যকার!……

প্রকৃতপক্ষে যক্ষ্মাব্যাধির ফলে এই অবসরের সুযোগে অনেক ব্যক্তির ভিতরেই যে প্রতিভা এবং সামর্থ্য আবিষ্কার করা গেছে—তা আগে থাকতে হয়ত কল্পনাই করা যায়নি! এই সব রোগী তাদের জীবনকে দেখেছে একটি নতুন দৃষ্টি দিয়ে; এবং যখন তাদের সুস্থ বন্ধু-বান্ধবেরা এখানে-ওখানে

বাজে দৌড়োদৌড়ি করে অকারণ বহু সময়, সুযোগ এবং শক্তির অপব্যয় করেছে তখন তারা করেছে তাদের শক্তিকে সাবধানে রক্ষা এবং নিয়ন্ত্রিত। যক্ষ্মা দ্বারা আক্রান্ত হবার পরে অনেক রোগীই নিজেদের মনে করে অসহায় বলে এবং হয়ে ওঠে দুঃখবাদী ; কিন্তু অন্য অনেকে এদের দলে না ভিড়ে নিজেরা চেষ্টা করেছে প্রফুল্ল থাকতে এবং নিজেদের ভিতর খুঁজে পেয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা! হোমার বলেছেন—বিশ্রামটাও অতিরিক্ত হলে পরে সেটা একটা বেদনাদায়ক ব্যাপার হয়ে ওঠে। অনেক রোগীই হোমারের পক্ষ সমর্থন ক'রে নিজেদের অসুস্থ অবস্থার মুণ্ডপাতই দিন রাত করবে। কিন্তু অনেক রোগীই ইচ্ছা করলে নানাভাবে এই সময়টার সদ্ব্যবহার করতে পারেন। জীবনের ব্যস্ততার মাঝখানে চারিপাশের অনেক জিনিসই তাঁরা লক্ষ্য না করে চলে গেছেন, কিন্তু এই অবসরের মুহূর্তে তারই কোনটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে—হয়ত সামান্য একটি জিনিসের ভিতর দিয়েই তাঁরা সহসা পেতে পারেন একটি বৃহত্তর রহস্যের সন্ধান—যা নাকি তাঁদের চালিত করতে পারে একটি নতুন আবিষ্কারের পথে!

এমন কোন কোন রোগীর কথা জানা গেছে, যারা অসুস্থতার সময়ে মাসিক পত্র, দৈনিক পত্র বা অন্যান্য নানা কাগজ বা বই থেকে অনেক প্যারাগ্রাফ বা ছবি কেটে কেটে সংগ্রহ করেছে বা কোন কোন বিষয়ের নোট্ নিয়েছে। অবশেষে একটু একটু করে ভাল হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংগ্রহকে তারা নানা বিচিত্র উপায়ে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছে। কেউ কেউ বা তাদের এমন অবস্থারই মাঝখানে অর্জিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নিয়ে এমন কিছু গড়ে তোলবার দেখছে স্বপ্ন, যা নাকি মানব-কল্যাণে ভবিষ্যতের দরবারে একটি স্থায়ী আসনে হবে প্রতিষ্ঠিত!

অনেক মনোসমীক্ষণবিদ্-যক্ষ্মাবিশেষজ্ঞ যক্ষ্মারোগীর মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলিকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ বলছেন যে অধিকাংশ

রোগটা যখন 'টি. বি'—

যক্ষ্মারোগীর ভিতরে নিজেদের অত্যন্ত হীন বলে ভাববার একটা প্রবণতা দেখা যায় এবং এই হীনতাটাকে ঢাকবার জন্যে এবং নিজেদের ক্ষতিগুলিকে পূরণ করে নেবার জন্যে তারা অতিরিক্ত রকম চেষ্টা এবং কাজ আরম্ভ করে দেয়। পৃথিবীর বহু বিখ্যাত মানুষের ভিতরে যক্ষ্মা রোগের আধিক্য বিশেষ ভাবেই দেখা যায়। Spinoza, Nadson, Gorki, Chateaubriand, Mozart, Rueckert, Schiller, Goethe, Novalis, Voltaire, Kant, Chopin, Keats—প্রভৃতি সবাই ছিলেন যক্ষ্মাগ্রস্ত; কে জানে এই সব বহুবিখ্যাত ব্যক্তিগণের অসামান্য প্রতিভা নিজেদের হীনতার চেতনাকে অতিরিক্ত চাপা দেবার প্রতিক্রিয়ারই পরিণাম কিনা! কেউ কেউ বলছেন যে অনেক রোগীর ভিতর বেজায় রকম একটা ফূর্তিবাজ হবার এবং জীবনটাকে বেশ সহজ ভাবে নিয়ে সবার সঙ্গে মিলে আনন্দ উপভোগ করবার যে প্রবল প্রচেষ্টা দেখা যায় সেটাও আর কিছুই নয়, সেটা শুধু তাদের অবচেতন মনের একটা গভীর নিরাশা এবং আত্মহত্যার প্রবৃত্তিকে আপ্রাণ চেষ্টায় দমন করবার চেষ্টারই একটা অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়া মাত্র! যক্ষ্মাগ্রস্তদের ভিতরে বহু বড় বড় চিকিৎসকও আছেন—ফিরিস্তি বাড়াবার আর প্রয়োজন দেখিনা। অনন্যসাধারণ কর্মী এঁদের সকলেই। স্টেথোস্কোপের আবিষ্কর্তা Laennec স্বয়ং ছিলেন যক্ষ্মাগ্রস্ত। যক্ষ্মাজীবাণুর সন্ধানদাতা Robert Koch ও ছিলেন তাই! অ্যামেরিকায় স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসার প্রবর্তক, য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্স্এর ন্যাশ্নাল টিউবারকিউলোসিস্ অ্যাসোসিয়েশানের সর্বপ্রথম সভাপতি, প্রত্যেক অ্যামেরিকানের কাছে অমর এবং চিরস্মরণীয় পরলোকগত ডাক্তার লিভিংষ্টোন ট্রুডো যক্ষ্মাগ্রস্ত অবস্থায় এমন কথাই লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনীতে :(আমার অনুবাদ): "যক্ষ্মা-ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম আমাকে এমন সব অভিজ্ঞতা এনে দিয়েছে এবং আমার ভিতর এমন সব স্মৃতি রেখে গিয়েছে, যা অন্য কোন প্রকারেই আমি কোন দিন

লাভ করতে পারতাম না এবং যা নাকি আমি Indies এর সমস্ত ধন-সম্পদের সঙ্গেও বিনিময় করতে প্রস্তুত নই!" (এবং বর্তমানেও এই অ্যাসোসিয়েশানের কয়েক জন সুবিখ্যাত যক্ষ্মাবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এক কালে নিজেরাই এই রোগগ্রস্ত ছিলেন!)

যে সব কথা লেখা গেল এগুলির নিশ্চয়ই একটা মূল্য আছে এবং এই ব্যাধির এই বিশেষ দিকটা নিশ্চয়ই আমাদের যথেষ্ট চিন্তার খোরাক জোগাতে পারে। যাঁদের কথা উল্লেখ করা গেল এঁদের জীবন থেকে (এবং আমাদের জানা স্বদেশ এবং বিদেশের আরও অনেক অপেক্ষাকৃত অল্প-বিখ্যাত, মৃত বা জীবিত, এবং জীবনের বিভিন্ন পথে কর্মনিরত ব্যক্তিগণের অথবা যক্ষ্মাগ্রস্ত অন্যান্য অবিখ্যাত সাধারণ সংসারী ব্যক্তিগণের জীবন থেকে) আমরা এটা অবশ্য বুঝতে পারি যে যক্ষ্মা মাত্রেই যে জীবকে অকর্মণ্য ক'রে ফেলে তা ঠিক নয়, এবং পৃথিবীর বহুলোক যক্ষ্মাগ্রস্ত হয়েও গুরু কার্য সম্পন্ন করে গেছেন। এমন কি তাঁদের অনেকেরই সংবাদ হয়ত আমরা রাখিনা—যাঁরা এই রোগের কবলে পড়েও কিছুমাত্র না দমে এবং এই রোগের ভ্রূকুটিকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে তাঁদের অপূর্ব কীর্তি দ্বারা মরণকে গিয়েছেন জয় করে। কিন্তু তত্রাচ এঁদের জীবন সব সময়ে যে সাধারণ লোকের মনে তেমন আশা এনে দেয়না এটা স্বীকার না করে উপায় নাই। আমাদের সমস্ত সমস্যাটাকে সব দিক থেকে একত্র করে দেখতে হবে এবং তা নিয়ে আলোচনা করতে হবে নানা ভাবে। দুঃখের সঙ্গে একথা বলতেই হবে যে, মুষ্টিমেয় যে কয়েকটি যক্ষ্মারোগী এমন কর্মময় জীবন যাপন করে গেছেন, চিন্তা-জগতে যাঁদের দান অসামান্য এবং যাঁরা চিরকালের জন্যে হয়ে রয়েছেন জগদ্‌বরেণ্য, তাঁদের তুলনায় শোচনীয় ভাবে অক্ষম, অসহায় এবং নিরুপায় হয়ে ও চির-ব্যর্থতার বোঝা মাথায় নিয়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর বহুজনের দেহে এই ব্যাধির বিষ সঞ্চারিত করে দিয়ে যে সব যক্ষ্মারোগী অকালে শুকিয়ে ঝরে

গেছে, তাদের সংখ্যা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি। এক ধরনের মুষ্টিমেয় জনকতক লোকের দিকে তাকিয়ে অবস্থা বিশেষে সাময়িক একরকমের সান্ত্বনা হয়ত পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা দিয়ে আসল সমস্যাকে কোন মতেই উপেক্ষা করা চলেনা। এ ছাড়া, যে বিখ্যাত ব্যক্তিগণের উল্লেখ এই মাত্র করা হয়েছে এঁদের বোধ হয় কেউই যক্ষ্মা থেকে নিষ্কৃতি পাননি—চিরজীবনই ব্যাধির সঙ্গে যুদ্ধ করে গেছেন এবং বহু জ্বালা ভোগ করে গেছেন। এঁদের প্রত্যেকেই নিজের ব্যাধির অবস্থাটাকে বেশ আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতে পেরেছিলেন কিনা অথবা সব রকম অবস্থাতেই সকলের কাছেই এই ব্যাধিটি সব দিকে সব সময়ে সুবিধাজনক ছিল কিনা এ বিষয়ে আমাদের গুরুতর সন্দেহ রয়েছে। এঁদের আমি "মরণজয়ী" বলতে পারি, কিন্তু "যক্ষ্মাজয়ী" বলতে পারিনা কোনমতেই, এবং মনে হয় যক্ষ্মাগ্রস্ত না হয়েই এঁদের বড় হওয়াটা সকলের কাছেই অধিকতর বাঞ্ছনীয় হত।

এবারে বুকের টি-বির চিকিৎসায় "Climate" সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলা যাক। আমরা জানি, এই বিষয়টি নিয়ে অনেকের মনে অনেক রকমের ধারণা আছে।

জনৈক যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞ বলছেন :

"সভ্যতার আদিমযুগ হইতেই যক্ষ্মারোগ বর্ত্তমান। হয়ত পুরাকালে রোগের মাত্রা এত অধিক ছিল না। রোগী বেশী বয়সে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইত—বেশী বয়সের ব্যাধি হঠাৎ প্রাণঘাতী হইত না।

"সেই সময় হইতেই স্থান পরিবর্ত্তন চলিয়া আসিতেছে এবং সে ধারণা আজও অবিকৃত অবস্থায় চলিতেছে। প্রাচীন গ্রীসের যক্ষ্মারোগীরা মনে করিত ঈজিপ্টে প্রস্থান করিলে রোগমুক্ত হইব। ঈজিপ্টের লোকদের ধারণা ছিল—গ্রীসই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যকর স্থান—যক্ষ্মারোগ নিরাময় করিতে হইলে সেইখানেই যাওয়া প্রয়োজন। দূর প্রদেশের একটা মোহ

আছে এবং দূরে থাকিতে পারিলে রোগমুক্ত হওয়া যাইবে, এ ধারণা অন্য ব্যাধি সম্বন্ধেও ঘটে তবে যক্ষ্মারোগে বিশেষ করিয়া এ ধারণা প্রচলিত।"

বাস্তবিক, জনসাধারণের শতকরা নিরেনব্বই জন লোকের মনেই এই ধারণা আছে যে, যক্ষ্মারোগীর পক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট জল-হাওয়াযুক্ত স্থান অত্যাবশ্যক এবং তার চিকিৎসা যে সাধারণ রকমের একটা "climate"এ হতে পারে অনেকে একথা শুনেই নাক সেঁট্কান! তাঁদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে যে, টি-বি হলেই "চেঞ্জে" চলে যেতে হবে খুব ভাল একটা জায়গায়। এবং ক্লাইমেটকে তারা "পূজো" করবার যোগ্য বলেই মনে করেন। অধিকাংশ ডাক্তারও বুক পরীক্ষা করে দোষ দেখবামাত্র এ যাবৎকাল ফট্ করে এই কথাই বলে আসছিলেন—যান চলে মশাই দেওঘর, মধুপুর, সিমলে অথবা পুরী। যেন যক্ষ্মারোগীর পক্ষে সবচেয়ে এইটাই আগে কর্ত্তব্য—আর সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে; এবং সচরাচর এই-ই দেখা গিয়েছে যে জমান টাকা না থাকলে ভূসম্পত্তি বিক্রি করে, গয়না বন্ধক দিয়ে অথবা বিভিন্ন বীভৎস উপায়ে টাকা ধার করতে হলেও তাই করে রোগী চলে গেছেন দেওঘর, মধুপুর, সিমলে অথবা পুরী! কিন্তু একজন টি-বি রোগীর চিকিৎসা বা একটি স্যানাটোরিয়াম নির্ম্মাণ একেবারে "স্পেশাল" রকমের কোন ক্লাইমেটেই করতে হবে—এ মত আজকাল একেবারে উল্টে গেছে। বস্তুতঃ যে কোন "climate"-এই রোগীর উন্নতি হতে পারে যদি নাকি সম্পূর্ণ বিশ্রাম, পুষ্টিকর খাদ্য, আরাম, মনের পরিমিত শান্তি, যথোপযুক্ত চিকিৎসক এবং চিকিৎসা—ইত্যাদির অভাব না ঘটে এবং অন্যান্য অবশ্য-পালনীয় নিয়মগুলির প্রতি সে কখনো অবহেলা প্রদর্শন না করে। প্রকৃতপক্ষে টি-বির চিকিৎসায় "climate"এর প্রয়োজন শতকরা পাঁচভাগের বেশি নয়—আর খুব বেশি হলেও বড় জোর দশ ভাগ। যাঁরা এই অসুখ থেকে ভাল হবার জন্যে অন্যান্য সমস্ত বিষয়গুলিকে উপেক্ষা ক'রে শুধু "climate" ধরে করেন

টানাটানি, তাঁরা যেন মনে রাখেন যে তা দ্বারা তারা অল্পের মোহে ভূমাকে দিচ্ছেন বিসর্জন এবং করছেন মারাত্মক রকমের একটা ভুল। বাস্তবিক-পক্ষে রোগী পাহাড়ে থাকুন, সমতল প্রদেশে থাকুন, বা যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকুন, আসল চিকিৎসা কোথাও তার ঠেকে থাকবে না। হাওয়ায় প্রচুর পরিমাণে "Ozone" থাকবার দরুন সমুদ্রের ধারে থাকা বিশেষ উপকারী, বহুর মনে আছে এই ধারণা। কিন্তু এটা জানা গিয়েছে যে, "Ozone"-এর টি-বি সারাবার আদপেই কোন ক্ষমতা নাই। এই রোগের কোন কোন অবস্থায় সমুদ্রবায়ু রোগীর উন্নতির পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল বলেও অনেক চিকিৎসক মন্তব্য করেছেন।

"Ozone" এর আলোচনা করতে গিয়ে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করছি। যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় অক্সিজেনের মূল্য এবং উপকারিতার উপর বহু যক্ষ্মা-চিকিৎসক দীর্ঘকাল ধরে বিশেষ জোর দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আসলে দেখা গিয়েছে যে যক্ষ্মারোগীর সাধারণ স্বাস্থ্যের একটুখানি উন্নতি-বিধান করা ছাড়া এই ব্যাধিকে সারাবার বিশিষ্ট কোন ক্ষমতা অক্সিজেনের কিছুমাত্র নাই। অধিকন্তু এও অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে অক্সিজেন-সঞ্চালন বেশি হবার দরুন ফুসফুসের "টিস্যু"গুলির ভিতরে অবস্থিত নির্জীব যক্ষ্মাজীবাণুগুলি বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং আপনাদিগকে বর্ধিত করবার সুযোগ পেয়েছে। এটা সুপ্রমাণিত হয়েছে যে, এই জীবাণু-গুলির পক্ষে বাঁচবার এবং শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে অক্সিজেনের অবশ্য প্রয়োজন—অক্সিজেন ছাড়া এদের জীবন চলেনা। কাজেই সম্পূর্ণ শয্যা-বিশ্রাম দ্বারা অথবা আধুনিক অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা ফুসফুসের পতন ঘটিয়ে এই রোগের চিকিৎসা, অন্যান্য কারণ বাদেও এইজন্যেও একটি যুক্তিসঙ্গত ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত যে, এই সব প্রক্রিয়া দ্বারা ফুসফুসে অক্সিজেন-সরবরাহকে অনেক কমান বা রুদ্ধ করা যায়।

কেউ আবার অতিরিক্ত শুকনো, খট্‌খটে আবহাওয়ার খোঁজে পাগল হয়ে ফেরেন। কিন্তু আমেরিকার Saranac বা Adirondacks এর স্যানাটোরিয়ামগুলির চিকিৎসকেরা দেখতে পেয়েছেন যে, সেখানকার মেঘলা, কুয়াসাচ্ছন্ন, বরফ এবং বৃষ্টিভরা, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেও রোগীদের উন্নতি অন্য কোন জায়গায় স্থাপিত কোন স্যানাটোরিয়ামের রোগীদের চেয়েই কম সন্তোষজনক নয়। একজন বিশিষ্ট আমেরিকান যক্ষ্মারোগী যা বলছেন এখানে তার অনুবাদ করে দিচ্ছি: "Connecticut Climate—যেখানে নাকি আমি ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠছি—কোনক্রমেই অনবদ্য নয়। এখানকার আবহাওয়াটা কিরকম যেন খেয়ালী আর পরিবর্তনশীল, গরমের দিনে বিশ্রী গরম এবং স্যাঁতসেঁতে, এবং চারিদিকে কেমন একটা বদ্ধ, গুমোট ভাব। শীতের দিনগুলোও বড় ঠাণ্ডা আর চট্‌চটে রকমের। যে স্যানাটোরিয়ামে এখন আমি "পড়ুয়া" হয়ে রয়েছি এটি যখন প্রথম স্থাপিত হয়েছিল (এই স্টেট্‌এ এইটিই সর্বপ্রথম স্যানাটোরিয়াম) লোকে এই বলে নাসিকাকুঞ্চন করেছিল যে এমন "Climate" এও আবার T. B. ভাল হতে পারে! অথচ, এখানে রোগীদের আরোগ্যলাভের অনুপাত অনেক উচ্চ-প্রচারিত স্থানের অনুপাতেরই সমান—যদি তাদের অনেকগুলিরই চাইতে বেশি না-ও হয়! গত ৩১ বছর ধরে এই স্যানাটোরিয়ামে যত রোগীর চিকিৎসা হয়েছে, তাদের শতকরা ৬৪ জনই আজও বেঁচে আছে—যা নাকি একটা বিশিষ্টরকমের রেকর্ড। অবিশ্যি একথা সত্যি হতে পারে যে অনেক ক্ষেত্রে যখন রোগীর অপর কোন উপসর্গ (যথা হাঁপানি)—থাকে, তখন তার পক্ষে একটা ঠাণ্ডা রকমের শুষ্ক, অচঞ্চল ক্লাইমেট্‌ই ভাল হতে পারে; কিন্তু যক্ষ্মা-রোগীর পক্ষে শুকনো, খট্‌খটে হাওয়া বা পার্বত্য উচ্চতার চাইতে যেটার মূল্য অনেক বেশি তা হচ্ছে প্রত্যেক রোগীকে আলাদা ভাবে বিচার করে তার অবস্থা এবং প্রয়োজনানুযায়ী বুদ্ধি, বিবেচনা এবং কৌশলের সঙ্গে তাকে নাড়াচাড়া করা।"...

রোগটা যখন টি. বি.'—

এই আবহাওয়াতে রোগী সুস্থ হতে পারে আর এই আবহাওয়াতে পারেনা, অথবা টি-বির চিকিৎসার জন্যে এই আবহাওয়াটা ওই আবহাওয়াটার পাশে দাঁড়াতেই পারেনা—এ সব বলা ভুল। যে কোন আবহাওয়াতেই রোগীর উন্নতি বা অবনতি ঘটতে পারে। অন্য সব যদি সম্পূর্ণরূপে অনুকূল হয়, তবে রোগী সব চেয়ে খারাপ "Climate"-এও সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন, এবং অন্য বিষয়গুলি যদি সম্পূর্ণরূপে প্রতিকূল হয়, তবে সর্বোত্তম "Climate"-এও রোগীর সুস্থ হবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

অবিশ্যি স্থান-পরিবর্তনের যে একেবারেই কোন মূল্য নাই একথা স্বীকার করেন না কেউই। অনেক সময়ে নতুন জায়গার নতুন দৃশ্য, নতুন পারিপার্শ্বিক অবস্থা মনের উপরে যথেষ্ট অনুকূল ক্রিয়া করে। একথা সত্যিই অস্বীকার করা যায়না—এমন কতকগুলি climate আছে যা শরীরকে বাস্তবিকই বেশ ঝরঝরে করে। প্রকৃত কোন স্বাস্থ্যকর স্থানকে কেউ যে খাট করে দেখবে তা ঠিক নয় এবং রোগী এমন জায়গায় সব দিকে সুবিধাজনক ভাবে থাকবার ব্যবস্থা করতে পারলে তাঁকে নিরুৎসাহ করবারও অন্য ভাবে কিছুই নাই। একটা গরম, স্যাঁতসেঁতে ধরনের আবহাওয়ায় অনেকে যে শরীরটাকে বড় বিশ্রী বোধ করে এ কথা মিথ্যা নয়। যে সব জায়গায় দিনগুলো অনবরত মেঘলা থাকে এবং বৃষ্টি-বাদলাও থাকে লেগে সর্বক্ষণ, সে সব স্থানও অনেকের কাছে প্রীতিকর না হওয়া স্বাভাবিক—যখন নাকি দিনের পর দিন তাকে ঘরের ভিতর এক বৈচিত্র্যহীন জীবন যাপন করতে হয়! চারিদিক বেশ রোদে ভরা, শুকনো, ঠাণ্ডা—অথচ স্যাঁতসেঁতে নয়, মুক্ত বায়ু সেবনে কোন অসুবিধা নাই—এমন একটি জায়গায় থাকা রোগী নিশ্চয়ই পছন্দ করবে এবং এরকম একটা মনোহর আবহাওয়ার ভিতর থেকে টি-বির সঙ্গে লড়াই করাটাও তার পক্ষে কম কষ্টকর হবে। শীতল, শুষ্ক-হাওয়াযুক্ত পাহাড়িয়া স্থানের গুণ এই যে সেখানে চর্মের তাপ এবং জলীয়তা দূর হয়ে

শরীরের বেশ একটা ঝরঝরে ভাব হয় এবং যক্ষ্মারোগে শরীরকে রক্ষা করবার কাজে অতি প্রয়োজনীয় "Lymphocyte" cell গুলির সংখ্যা রক্তে বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া সমতল প্রদেশের অনেক স্থান ধূলি, ধোঁয়া দ্বারা দূষিত—কিন্তু পাহাড়ে প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্যালোক পাওয়া সম্ভব।

কিন্তু রোগী যখনই "Change" এ যাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠবেন, অথবা যখনই একজন ডাক্তার তাঁকে "চেঞ্জে" এ যাবার উপদেশ দেবেন, তখনই রোগী এই বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভেবে দেখবেন: দু বছর বা এক বছর "Change"এ থাকবার টাকা তাঁর অনায়াসে সংগ্রহ করা সম্ভব কিনা; যেখানে তিনি যেতে চান, সেখানে পুষ্টিকর, বিশুদ্ধ এবং রকমারি খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের পক্ষে কোন অসুবিধা হতে পারে কিনা; সেখানে তাঁর পরিচযার কোনপ্রকার ত্রুটি হওয়া সম্ভব কিনা; এই ব্যাধি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সন্ধান—যাঁর অধীনে তিনি নিজেকে নিরাপদে রাখতে পারেন—সেখানে মিলবে কিনা; সেখানে বাসাবাটি উপযুক্তরূপ মিলবে কিনা; বাইরের কাজকর্ম করে দেবার জন্যে বিশ্বাসী এবং নির্ভরযোগ্য কোন ব্যক্তিকে সঙ্গে নেওয়া সম্ভব হবে কিনা; নিজের স্থান এবং নিজের লোকদের থেকে দূরে থেকে সাংসারিক কোন দুশ্চিন্তায় অথবা প্রিয়জনদের বিরহে অথবা অন্য কোনভাবে সর্বদা তাঁকে কাতর থাকতে অথবা মনের বহুরকম অশান্তি নিয়ে থাকতে হবে কিনা। যদি রোগী মনে করেন যে, এগুলির উত্তর তিনি সন্তোষজনক ভাবে পাচ্ছেন না, তা হলে তিনি কোন "আদর্শ"-স্থানীয় প্রদেশে "চেঞ্জে" যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ করে বাড়ীতে নিশ্চিন্ত মনে চিকিৎসা চালাতে পারেন—বাড়ীতেই তিনি ভাল হবেন। বস্তুতঃ রোগীর আর্থিক অবস্থা এবং অন্যান্য বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ লক্ষ্য না রেখে তাকে ভাল, ব্যয়-বহুল কোন স্থানে চলে যেতে বলা কোন চিকিৎসকের পক্ষেও নিতান্ত অবিবেচনার কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। ভাল

"climate"এ দু-চার দিন থাকলে কিছুই লাভ নাই ; এবং এই রোগে বায়ু পরিবর্তনের পূর্ণ ফল লাভ করতে হলে দীর্ঘকালব্যাপী যে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন, ক'জনের পক্ষে তা সম্ভব হয়ে ওঠে ? কিছুদিনের জন্যে চেঞ্জে গিয়ে কতকগুলি অসুবিধার ভিতর সেখানে থেকে অর্থদণ্ড দিয়ে বেশি অসুখ নিয়ে ফিরে আসায় লাভ আছে কি ? অবিশ্যি যাঁরা প্রচুর অর্থব্যয় করতে সক্ষম এবং যাঁদের পক্ষে চেঞ্জে গিয়ে নিজেদের সর্ববিধ আরামের মধ্যে রাখা এবং চিকিৎসার সর্ববিধ উপযুক্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব—তাঁরা চেঞ্জে যেতে পারেন, আপত্তি নাই ; কিন্তু যে রোগী প্রচুর অর্থব্যয় করে "ভাল" কোন স্থানে যাবার সামর্থ্য রাখেন না তিনি যে কোন জায়গাতেই নিরাপদে থাকতে পারেন—যদি নাকি জায়গাটিতে ধুলো-ধোঁয়ার উৎপাত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির প্রকোপ না থাকে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা অন্য কোনভাবে অস্বাস্থ্যকর, অপরিচ্ছন্ন না হয় ; এবং স্যানাটোরিয়াম বা হাসপাতালে যেতে হলে এই ধরনের জায়গায় যে সব টি-বি স্যানাটোরিয়াম বা হাসপাতাল স্থাপিত, সেখানে ইতস্তত না করে চলে যেতে পারেন। ভাল একটা "climate"-এ যাওয়া মাত্র রোগী সুস্থ হবেন—এ-রকম ম্যাজিক টি. বি.তে ঘটে না ! "Climate"—তা সে যত নাম-করাই হোক—সম্বন্ধে শুধু একথাই বলা যায় যে হলে ভাল, না হলে ক্ষতি নাই এবং রোগীর এই ভেবেও আফসোস করবার দরকার নাই যে তিনি এমনতর একটি স্থানে বাস করবার সুবিধা করে উঠতে পারছেন না। চিকিৎসার অপর অঙ্গগুলি সম্পূর্ণরূপে অপরিহার্য এবং দেখতে হবে সেগুলি বজায় থাকছে কি না।

সব বিষয় বিবেচনা করে রোগী যদি আদৌ চেঞ্জে যান, যেখানে তাঁর মন ভাল থাকবে—কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সেখানেই তিনি যেতে পারেন। সাধারণভাবে এই উপদেশ সচরাচর রোগীকে দেওয়া যেতে পারে যে, অপেক্ষাকৃত শুকনো জায়গাই তাঁর পক্ষে ভাল। তবে কেউ বা

পাহাড় ভালবাসেন—যেমন সিমলা, দার্জিলিং, শিলং ইত্যাদি। কেউ হাজারিবাগ, দেওঘর, গিরিডি, মধুপুর ধরনের জায়গা হয়ত পছন্দ করবেন। কারুর বা পুরী, ওয়াল্টেয়ার লাগবে ভাল। কিন্তু এই প্রশ্ন সব সময়েই ওঠে যে, এই সব জায়গায় গিয়ে কেবল পাইন গাছের আর সমুদ্দ্রের "হাওয়া" খেলেই তো চলবে না! চিকিৎসার যে আরও অসংখ্য অঙ্গ আছে! সব জায়গায় রোগী এমন চিকিৎসক কোথায় পাবেন—"Who understands Tuberculosis"? খালি দেশ-বিদেশের হাওয়া খেলেই বুক ভাল হবে না—যে সব কারণে বুক খারাপ হয়েছে তা উত্তমরূপে জানবার প্রয়োজন, তার জন্যে নানারকম ব্যবস্থারও প্রয়োজন। একটি সাধিত হল, অপর দশটিতে থেকে গেল ত্রুটি—তা হলে তো চলবে না! প্রতি পদে পদে প্রয়োজন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শের এবং কার্যকরী চিকিৎসা-পদ্ধতির!

কেউ কেউ এমন মত প্রকাশ করছেন যে, রোগীর যে "Climate"এ সর্বদা অথবা অধিকাংশ সময় ভবিষ্যতে থাকতে হবে, তাঁর চিকিৎসা এবং আরোগ্যলাভ ঐ "Climate"-এই হওয়া উচিত। কেউ বা বলছেন, যে রকম "Climate"এ থেকে রোগী সুস্থ হলেন, রোগীর উচিত সেই "Climate"এই পরে থাকতে চেষ্টা করা। এতে আরোগ্যটা অধিকতর স্থায়ী হবে।

অনেকের মনেই এই ধারণা আছে যে, ভাল "Climate" থেকে খারাপ "Climate"এ ফিরে আসবার দরুনই রোগী আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন একবার ভাল হয়ে, এবং তাঁরা বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে রোগীকে উপদেশ দেন—বাপু হে, বাংলা দেশে আর তোমার পোষাবে না, ওই পশ্চিম-টশ্চিমের ওদিকেই তোমাকে বাকি জীবন কাটাতে হবে। তাঁরা খালি শিখে রেখেছেন "পশ্চিম" আর "চেঞ্জ"—রোগী আর কি করছে না করছে অথবা কি

ভাবে তাকে থাকতে হচ্ছে না হচ্ছে, সেদিকে চোখ একেবারে বন্ধ করে রেখে। রোগীকে নিতান্তই এক ভাগাড়ে গিয়ে পড়ে থাকতে নিশ্চয়ই কেউ উপদেশ দেবেন না; কিন্তু যেখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁর পক্ষে সর্ববিষয়েই অনুকূল, শুধু "Climate"-টাই অপেক্ষাকৃত যা কিছু একটু খারাপ—সেখানে রোগী নিশ্চিন্ত মনেই থাকতে পারেন। নানা মুনির নানা মত আছে, কিন্তু রোগী এইটেই অধিকাংশ সময়ে দেখতে পাবেন যে, তাঁর অসুখ বৃদ্ধির জন্যে "Climate" কদাচিৎই দায়ী হয়—যখন নাকি অপর সব দিকগুলি তাঁর ভাল ভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে।

যাই হোক, শুধুই "Climate"এর মোহে যেন রোগী স্থান হতে স্থানান্তরে কখনই ছুটোছুটি না করে বেড়ান, এবং যে অর্থ অন্যান্য লাভ-জনক উপায়ে তিনি ব্যয় করতে পারতেন সেই অর্থকে শুধু "Climate"-এর পাদমূলেই অকারণে বিসর্জন না দেন।

গরম দেশে গ্রীষ্মকালে রোগীর বিশ্রাম নেবার বড়ই কষ্ট হয়। পাল্‌স্‌, টেম্পারেচার অনেক সময় বেড়ে যেতে চায়, রাত্তিরে ঘুমও হয়ত ভাল হতে চায় না। ওজনও এই সময়ে বাড়তে চায় না। যে সব জায়গা বেশ ঠাণ্ডা, অতিরিক্ত গরমের সময়ে সে রকম কোন জায়গায় গিয়ে রোগী থাকতে পারেন। কিন্তু এক উঁচু পাহাড় ছাড়া আমাদের দেশে সব স্বাস্থ্যকর জায়গাগুলিতেই বড় বেশি গরম—গ্রীষ্মকালে। বেশি জ্বরবিশিষ্ট বা রক্তবমনকারী রোগীর পক্ষে উঁচু পাহাড় ভাল নয়—এই ধারণা বহুর মনে আছে। কিন্তু বহু বিশেষজ্ঞের মতে এটা সমর্থন-যোগ্য নয়। পেটের গোলযোগ, বহুমূত্র, হার্ট বা কিড্‌নীর ব্যাধিযুক্ত রোগীর পক্ষেও উঁচু পাহাড় সুবিধাজনক নয়, এ রকম মত আছে। রোগীর বয়স, রোগের প্রকৃতি, বিস্তৃতি, আনুসঙ্গিক রোগ এবং শরীরের অন্যান্য যন্ত্রাদির অবস্থা বিবেচনা করে

সুচিকিৎসকই পরামর্শ দিতে পারেন—কোথাকার জলবায়ু কোন্ রোগীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। আবার সব রকম রোগীই যে স্থান পরিবর্তন পছন্দ করে তাও নয়। এমন অনেক "নার্ভাস্" রোগী আছে যাদের স্থান পরিবর্তন সম্বন্ধে বিশেষ একটা ভয়ের ভাব থাকে। কাজেই রোগীর ব্যক্তিগত প্রকৃতির প্রতিও লক্ষ্য রাখা দরকার যে সেদিক থেকে স্থান পরিবর্তন তার পক্ষে ক্ষতিকর হবে কি না। সমুদ্রতীরে সব সময়েই প্রায় ঝড়ের মত হাওয়া বইতে থাকে। এই সব স্থানে যদি কোন রোগী থেকে থাকেন, তবে এই ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা সোজা এসে গায়ে না লাগে সে বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন। যে সব জায়গার জলে পেট ভাল থাকে এবং ক্ষুধা বাড়ে, সে সব জায়গা নির্বাচন করাও রোগীর পক্ষে মন্দ নয়।

আর, নতুন কোন আবহাওয়ায় গিয়ে প্রথম কিছুকাল রোগীর বেশ সতর্কভাবে থাকা উচিত—যতদিন পর্যন্ত না তার সেটা বেশ সহ্য হয়ে আসে। একটা জলবায়ু থেকে সম্পূর্ণ অন্য রকম জলবায়ুতে এসে সেটার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শরীরের একটু শক্তির (resistance) প্রয়োজন। নতুন স্থানে এসে অন্ততঃ প্রথম দু তিন সপ্তাহকাল একেবারে চুপচাপ থেকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের ত্রুটি কোনমতেই ঠিক নয়—বুকের অবস্থা বেশ ভাল হলেও। পাহাড়ে ঠাণ্ডা লেগে যাবার ভয় বড় বেশি ; গায়ে যেন সর্বদা বেশ গরম জামা-কাপড় থাকে। তাই বলে ঘরের এক কোণে আগুন জ্বালিয়ে দরজা জানালা একেবারে বন্ধ করে "আরামে" ঘুমুবার দুর্বুদ্ধি রোগীর যেন না হয়। ঘরের অগ্নি-রক্ষার স্থানকে ব্যবহার করতে হলেও উপযুক্ত বায়ু-চলাচল যাতে ঘরের ভিতরে হয় তার ব্যবস্থা রাখতে হবে—হাজার শীত থাকলেও। নিজেকে রক্ষা করতে হবে উপযুক্ত শীত-বস্ত্র দ্বারা ; দরজা জানালা বন্ধ করে নয়।

রোগটা যখন 'টি. বি.'—

যদি কোন রোগী একটা নতুন জায়গা দেখবার জন্যে একেবারে বদ্ধ-পরিকরই হন অথবা একটা ভাল "climate"এ চেষ্টা করবার জন্যে একেবারে কৃতসঙ্কল্প হন, তবে একটা নিয়মিত চিকিৎসা সুসঙ্গত ভাবে শেষ করেই যেন তা করেন। স্যানাটোরিয়াম দ্বারাই অনেক সময় তাঁর সব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। "Climate" যদিও যক্ষ্মার চিকিৎসায় "অমোঘ ঔষধ" গোছের কিছুই নয়, তা হলেও এটা অবিশ্যি সবাই মানছেন যে সাধারণ ভাবে এর একটা প্রভাব যক্ষ্মারোগীর উপর আছে। সুপ্রসিদ্ধ একজন যক্ষ্মাবিশেষজ্ঞের মত এখানে অনুবাদ করে উদ্ধৃত করে দিয়ে এই অধ্যায়টি শেষ করছি :

"ক্লাইমেটের পক্ষে এবং বিপক্ষে সব কিছু বলা হয়ে যাবার পর সাধারণ জ্ঞান দ্বারা এটা মেনে নেওয়া যেতে পারে যে, যক্ষ্মার চিকিৎসায় এর কিছু স্থান আছে। যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় climateএর প্রাধান্যকে কিছুতেই স্বীকার করবার দরকার নাই; কিন্তু এটার সামান্য কিছু উপকারও যদি থেকে থাকে তবে তা থেকে কোন রোগীকে বঞ্চিত করা উচিত নয়—যদি নাকি সে তার আরোগ্যলাভের জন্যে অপরাপর অত্যাবশ্যক বস্তুগুলির সঙ্গে এটিকে সংযুক্ত করতে পারে"।......

—৮—

এই ব্যাধি সংক্রান্ত নতুন বিষয় এই অধ্যায়ে লিখতে চেষ্টা করবার প্রারম্ভে এই কথা মনে আসছে যে, এই রোগের স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসাই কি একমাত্র চিকিৎসা ? অন্য কোন পন্থা কি এ ছাড়া আর নাই ?

বাস্তবিক, যখনই টি-বি হবে তখনই স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসার অথবা যিনি স্যানাটোরিয়ামের নিয়মে বাইরে থেকে চিকিৎসা করেন এমন কোন চিকিৎসকের পিছন পিছনই ছুটতে হবে কিনা অথবা অন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করাও একই রকম, অথবা অধিকতর সঙ্গত হবে কিনা—সেটা নিয়ে গোলোক-ধাঁধায় পড়া বিচিত্র নয়।

এই রোগের স্যানাটোরিয়াম পদ্ধতিতে চিকিৎসাই "একমাত্র চিকিৎসা" এবং নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—এটা হয়ত সত্যি হতেও পারে হয়ত নাও হতে পারে। কতজনের কথা কানে আসে—কেউ সেরেছে কবিরাজীতে, কেউ হোমিওপ্যাথীতে, কেউ কোন এক ভৈরবী ঠাক্রুনের টোট্কায়, কেউ দৈনিক অথবা মাসিকের কোন এক পাতার সচিত্র, সাড়ম্বর বিজ্ঞাপনের এক আদি এবং অকৃত্রিম টনিকে, কেউ স্বপ্নাদ্য মাতুলি ধারণ করে, কেউ বাবা তারকনাথের সামনে হত্যে দিয়ে, কেউ বা তর্কপঞ্চানন অথবা বিদ্যেবাগীশ মশায়-কৃত উনপঞ্চাশ টাকা সওয়া পাঁচ আনা খরচের এক বিপুল শান্তি-স্বস্ত্যয়নের জোরে।

তবে অনেক রকম চিকিৎসা বা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের অনেক রকম সন্দেহ আসবারই যেমন কারণ আছে অনেক, তেমনি অন্য সর্বপ্রকার চিকিৎসার চাইতে স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসায় এবং অন্য সর্বপ্রকার চিকিৎসকদের চাইতে স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের

উপরে আমাদের শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস থাকবার কারণও আছে অনেক। একথা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে বলা যেতে পারে যে, সব চাইতে বেশি সংখ্যক লোকের সব চাইতে বেশি উপকার একমাত্র স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসা দ্বারাই সাধিত হয়েছে এবং আমাদের এই প্রতীতি দৃঢ়ভাবেই জন্মেছে যে, অন্য 'সব রকম' চিকিৎসকদের চাইতে এই রোগ নির্ণয়ের দিক দিয়ে হোক, চিকিৎসার দিক দিয়ে হোক—অনেক অধিক কৃতকার্যতা লাভ করেছেন স্যানাটোরিয়াম-পন্থী চিকিৎসকগণ। রোগীর আরোগ্যলাভের ব্যাপারেও এঁদের মতামতের উপর যতখানি নির্ভর করা চলে, এতখানি অপর কারুর মতামতেরই উপর করা চলে না এবং অনেক সময়েই এঁদের মতামত যতখানি সুযুক্তিপূর্ণ, এতখানি অপর কারুরই নয়। বহু সুধী চিকিৎসক এবং বৈজ্ঞানিকের অসংখ্য বিষয়ে গভীর গবেষণাপ্রসূত অসংখ্য আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনা স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসার ক্ষেত্রে যত কাজে লাগান হয়েছে এমন আর কোনটাতেই হয়নি।

যদিও কোনরকম চিকিৎসা-প্রণালীর উপর বিদ্রূপের কটাক্ষ্যপাত করা ঠিক না হতে পারে, কিন্তু টি-বি থেকে ভাল হবার সোজা পথ সত্যি সত্যিই যে ক'টা আছে, তা বিচার করবার বিষয়। আমরা যখন কোন টি-বি রোগীর সম্বন্ধে জানতে পাই যে, তিনি একেবারে ভালভাবে সেরে গিয়েছেন তখন অবিশ্যি তাঁর সেই "সারা"টার উপরেই আমাদের মূল্য দেবার চেষ্টা বেশি হয়—সারবার "উপায়"টা তাঁর যা-ই হয়ে থাকুক না কেন, এবং অ্যালোপ্যাথী, হোমোপ্যাথী, হাইড্রোপ্যাথী, ক্রোমোপ্যাথী, হেকিমী, কবচ, তাবিজ, তেল-পড়া, জল-পড়া, ফুস্‌মন্তর, অবধৌতিক—আছে অবিশ্যি অনেক কিছুই; কিন্তু কোন্‌টা যে সত্যি করে কতটুকু কার্যকরী, এবং কোন্‌টার আসল মূল্য যে কতখানি, সেটা যাচাই করে নেবার মতন শিক্ষা এবং ধৈর্য্য আছে ক'জনের? নিরাময় হবার জন্যে

রোগী যে পথই বেছে নিন না কেন, তাঁকে শুধু একটি কথা বলবার আছে। তিনি যেন কখনই আত্মপ্রতারণা না করেন। তিনি যে ধরনের চিকিৎসকের কাছেই যান না কেন, তাঁর মতামতকে তাঁর কঠোরভাবে নিতে হবে যাচাই করে। রোগ-নির্ণয় সঠিক ভাবে হল কিনা, চিকিৎসা-প্রণালীর ভিতরে সব দিকে বেশ সঙ্গতি থাকছে কিনা, বুকের উন্নতি যথেষ্ট সুস্পষ্ট কিনা, এগুলির প্রতি বুদ্ধিমান রোগীর তীব্রভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। হাতুড়ে এবং অসাধু লোকের অভাব নাই, তারা চারিদিকে রয়েছে ওৎ পেতে বসে। এদের হাত থেকে রোগীর নিজেকে বাঁচাতে হবে। নিজের অসুস্থ জীবনে যে সময়েই তাঁর যে খটকা উপস্থিত হবে, তা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই যেন তিনি সন্তুষ্ট না থাকেন এবং যে-সে লোকের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে, এবং নিশ্চিন্ত মনে একটি গুরুতর ব্যাধি নিয়ে ছেলেখেলা করতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে না আনেন।

মাসিক বা দৈনিকের পাতা খুললেই আজকাল যক্ষ্মারোগের অসংখ্য অব্যর্থ মহৌষধের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। যে কোন রোগীকে অথবা রোগীর আত্মীয়স্বজনকে এই সব মহৌষধ সম্বন্ধে বিশেষভাবে হুশিয়ার করে দেবার প্রয়োজন আছে। যে ওষুধের গ্যারান্টির জোর যত বেশি, রোগী যেন মনে রাখেন যে, সেই ওষুধ অনেক সময়ে ঠিক ততখানিই বাজে এবং সে সব ওষুধ ব্যবহার করে শুধু যে কিছুমাত্র ফল হবে না এবং বৃথা কতকগুলি পয়সা নষ্ট হবে তাই নয়, অনেক সময় হয়ত একটা অনিষ্টও ঘটে যেতে পারে।

যক্ষ্মারোগী তাঁর অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়স্বজনের মুখে মেলাই "দৈব" এবং পেটেণ্ট্ ওষুধের খবর পাবেন অনেক সময়ে; এবং সে সব ব্যবহার করবার জন্যে উপদ্রুত হবেন। বহু শিক্ষিত এবং বিবেচক লোককেও অনেক সময় এই সব তথাকথিত "দৈব" এবং অসার পেটেণ্ট্ ওষুধের মোহে

পড়তে এবং অযথা সময়ক্ষেপ করতে হয়। এ সব সম্বন্ধে বিস্তারিত কোন মন্তব্য আর না করে এইটুকু শুধু বলতে চাই যে, স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসাটা আগে করে নিয়ে তারপরে ফলাফল দেখে যেন রোগী অপর যা হয় করেন। সারাটাই অবিশ্যি হল আসল—যিনি যেভাবে পারেন আপত্তি নাই; কিন্তু রোগী নিজের গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে যেন সর্বদা থাকেন সচেতন এবং অগ্রসর হন যেন সব দিক বুঝে এবং বিচার করে।

হঠাৎ এক এক সময়ে আমরা অবিশ্যি কোন কোন ওষুধ বা কোন কোন চিকিৎসা-পদ্ধতি ক্ষেত্র বিশেষে কোন কোন রোগীকে ভাল করেছে —এটা দেখতে পাই বা জানতে পাই; কিন্তু সময়ের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এগুলির কোন্‌টা যে কতদিন টিকবে সেটা দেখবার বিষয়। এগুলি যেন অনেকটা আগাছার মত জন্মায়, মহীরুহের মহত্ত্ব এদের কোথায়?

স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসাটা অ্যালোপ্যাথিক লাইনে হলেও এর একটা সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে এবং যে কোন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার এই লাইনের চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। এই রোগে স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসার যত দোষ-ত্রুটিই থাক এবং এখনও তার অবস্থা যত অপরিণতই হোক—আমি আমার কথার পুনরাবৃত্তি করে বলব যে, এই চিকিৎসাই বর্তমানে নিঃসন্দেহরূপে সাধন করছে "Greatest good to the greatest number"—অর্থাৎ প্রচুরতম রোগীর প্রভূততম হিত এবং বিশেষভাবে আশা করা যায় যে, সুদূর ভবিষ্যতেও সে তাই-ই করবে—এই ক্ষেত্রের মনীষিগণের অশ্রান্ত গবেষণা এবং একাগ্র চেষ্টার ফলে। অস্ত্র-চিকিৎসাদির কথা যা বলেছি তার ভিতরকার কোন কোনটি যথেষ্ট কার্যকরী হলেও কোন কোনটির প্রয়োগ এখনো অতিশয় বিপজ্জনক এবং রোগীর পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক। এখনো প্রাথমিক এবং পরীক্ষামূলক অবস্থাই সেগুলির উত্তীর্ণ হয়নি। এখনো সেগুলির সৃষ্ট নানাবিধ উপসর্গ নিয়ে বিশেষজ্ঞেরা চিন্তান্বিত।

সব চিকিৎসা সবার ক্ষেত্রে বহু কারণে চলেও না। কিন্তু আমরা সবাই-ই সেই দিনের স্বপ্ন দেখি যেদিন এই রোগের চিকিৎসা সব দিকে হবে নিখুঁত এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের ভিতর সর্বাঙ্গীণ সুস্থতা-বিধান দ্বারা সর্বশ্রেণীর রোগীদের এবং তাদের প্রিয়জনদের করবে আনন্দিত।

চিকিৎসক আক্ষেপ করে বলছেন: (আমার অনুবাদ): "রোগীরা—তা'দিগকে কি শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল এবং কি যে তাদের ভুগতে হয়েছে—এটা পরে এত চট্ করে ভুলে যায় যে চিকিৎসকেরা বিস্মিত না হয়ে পারেন না। রোগ আবার বেড়ে পড়লে তার প্রায়শ্চিত্ত বড় কঠিন মূল্যে হয়।"

কিন্তু এখানে চিন্তাশীল চিকিৎসকের কর্তব্য—রোগীর সমস্ত দুর্বলতা এবং মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলির সঙ্গে সহানুভূতিপূর্ণভাবে পরিচিত হওয়া; এটা তাঁকে ভেবে দেখতে হবে রোগীদের এই দুর্বল স্মরণশক্তির মূলে কি থাকতে পারে। 'Relapse' এর শাস্তি যে বড় কঠিন তা তারা ভুলে যায় এমন কতকগুলি বিচিত্র অবস্থার ভিতর দিয়ে যেসব অবস্থার কাছে কতকগুলি গালভরা উপদেশের কোনই মূল্য নাই এবং যার কাছে নাকি সমস্ত পরিণাম-চিন্তা অগ্রাহ্য হয়ে যায়!

যাক।

এখন আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই, এ নিয়ে এ যাবৎকাল যে কত রকম মতেরই সৃষ্টি হয়েছে তার অন্ত নাই। বিষয়টির গুরুত্ব যথেষ্ট এবং এ সম্বন্ধে কোনরকম বিকৃত বা ভ্রান্ত ধারণা রোগী অথবা সর্বসাধারণের মনে থাকা আদৌ ঠিক নয়। বিষয়টি হচ্ছে, যক্ষ্মাপীড়িতের পক্ষে বিবাহ করা কতদূর সমীচীন। একথা বলা হয়েছে যে যুবক-যুবতীদের ভিতরেই এই রোগের প্রসার সব চেয়ে বেশি। এখন এই সব যুবক-যুবতীদের ভিতর হয়ত অধিকাংশই অবিবাহিত এবং যক্ষ্মাক্রান্ত হবার পরে বিবাহের কল্পনা নিশ্চয়ই অধিকাংশের মনেই একটি বিচিত্র সমস্যার সৃষ্টি

করেছে। তারপরে যারা আগে থেকেই অবিশ্যি বিবাহিত, অসুস্থতা ঘটবার পরে দাম্পত্যজীবন যাপন নিয়ে তাদেরও দুর্ভাবনাগ্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক।

বস্তুতঃ রোগ যখন সক্রিয় অবস্থায় থাকে অথবা শরীর যখন দুর্বল থাকে এবং রোগী যখন নিয়মিত চিকিৎসাধীন থাকে, তখন বিবাহের কথা ওঠেই না (অবিশ্যি সেই সব ঘটনা বাদ দিয়ে যেখানে স্বার্থশূন্য প্রেম এবং অকৃত্রিম, শঙ্কাহীন নিষ্ঠা অন্য সব কিছু অতিক্রম করে গেছে—এবং বিরল হলেও যার দৃষ্টান্ত আছে)। কিন্তু ক্রমান্বয়ে শরীর সুস্থ এবং সবল হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর মস্তিষ্কে যখন জাগতে থাকে এই সব কল্পনা, তখন দুটি জিনিস রোগীকে প্রথমেই চিন্তা করতে হবে :—(১) বুকের অবস্থা কি রকম। একথা বলেছি যে, অনেক সময় রোগীর সাময়িক উন্নতি হয় ; অথবা বুকের একটু উন্নতি হবার সঙ্গে সঙ্গেই রোগীর বাইরের চেহারা অনেক সময়েই বেশ ভাল হয় এবং তিনি শরীরটাকে বেশই "ভাল" বোধ করতে থাকেন—যদিও বুকের দোষ তখনো কাটে না। কাজেই এসবের উপর নির্ভর না করে আসল ফুসফুসটির অবস্থা কি রকম, সে সম্বন্ধে সেই চিকিৎসকের মতামত বিশেষ ভাবে নিতে হবে যিনি নাকি রোগীকে তাঁর নিয়মিত চিকিৎসাধীনে পূর্বে রেখেছিলেন এবং যিনি নাকি রোগীর বিবাহ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করবার অগে তার বুকে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে, তার শারীরিক অন্যান্য অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করে, এক্স্-রে ফটো, থুতু, রক্ত ইত্যাদি উত্তমরূপে পরীক্ষা করে তার সম্পূর্ণ অবস্থা অবগত হয়ে নেবেন। স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসা দ্বারা রোগ ভালরকম "গ্রেপ্তার" হবার পরে দুটি কি তিনটি বছরের মধ্যে রোগীর বিয়ে-পাগলা হয়ে না ওঠাই ভাল—এ সময়ে তাঁর পক্ষে আত্মসংযমই প্রশস্ত। এই সময়টা যদি রোগী খুব ভালভাবে থাকেন, কোন রকম উপসর্গ আর না আসে, তখন চিকিৎসকের উপদেশ নিয়ে তিনি বিবাহ করতে সক্ষম হতে নিশ্চয়ই পারেন—অবিশ্যি এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশে তাঁর

পাত্রী (বা পাত্র) মেলা যদি কঠিন হয়ে না পড়ে—বিশেষ করে পূর্বের ব্যাধি সম্বন্ধে সরল-স্বীকৃতির ফলে। রোগীর দ্বিতীয় চিন্তার বিষয় হচ্ছে তাঁর আর্থিক অবস্থা। (অথবা তিনি যাঁকে বিবাহ করবেন—তাঁর ?) আমাদের নানারকম অশান্তি, নানা মানসিক দুশ্চিন্তা, নানা দুঃখ ইত্যাদির মূলে রয়েছে গুরুতর আর্থিক অস্বচ্ছলতা। রোগীর আর্থিক অবস্থা যদি শোচনীয় হয়, তবে তাঁর বিবাহিত জীবন যে বিড়ম্বিত হয়ে উঠবে এবং তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে যে ক্ষতির কারণ হবে, তাতে সন্দেহ নাই। অর্থের দিক দিয়ে রোগীর বিশেষ কোন ভাবনা যদি না থাকে তবে তাঁর বিবাহ না করবার পক্ষে কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

এখন এই সব কথা সচরাচরই উঠে থাকে :

(১) যৌন-সংসর্গ হেতু পুরুষ এবং নারী উভয়েরই শরীর দুর্বল হয় এবং রোগ তাতে পুনরায় শক্তিলাভ করতে পারে।

(২) যক্ষ্মাগ্রস্তা নারীর ক্ষেত্রে বিপদ আরও অধিক এই জন্যে যে তাকে গর্ভধারণ করতে হয়।

(৩) যক্ষ্মাগ্রস্ত পিতামাতার সন্তানেরও ঐ রোগপ্রবণতা থাকে, এই সব দুর্বল সন্তান-সন্ততি সমাজ-শরীরকে দুর্বল করে।

(৪) বিবাহিত জীবনে সর্বদাই আসে নানারকম সাংসারিক ঝঞ্ঝাট। অর্থ থাকলেও সবসময়ে অশান্তি, দুশ্চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না, এবং অপ্রত্যাশিতভাবে এমন সব উপদ্রব অনেক সময় এসে জোটে—যা নাকি স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত হানিকর।

(৫) এই অসুখের যা রীতি, তাতে মনে সর্বদাই থাকে একটা ভয় ; কখন কোন্ কারণে কি আবার হয়ে পড়ে কিছুই বলা যায় না। বিয়ে করে মিছিমিছি আরেকজনের জীবনটা নষ্ট করা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। এত বেশি ঝুঁকি নেওয়া কোনমতেই চলে না। এ ছাড়া আরও

রোগটা যখন 'টি. বি.'—

একটা ভয় আছে—একজনের দেহ থেকে আরেকজনের দেহে রোগ-সংক্রমণের।

আচ্ছা এবারে দেখা যাক এগুলি নিয়ে কি ভাবে কি আলোচনা করা যেতে পারে।

(১) যৌন-সংসর্গ পুরুষ বা নারীর পক্ষে হানিকর, একথা কোন শারীরতত্ত্ববিদ্ বা মনস্তত্ত্ববিদ্ই স্বীকার করবেন না—বরং তাঁরা উল্টোটাই বলবেন—যৌন-সংসর্গের প্রয়োজনীয়তা যে কোন স্বাভাবিক লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষেই স্বীকার্য। (এবং একজন সুস্থ যক্ষ্মারোগীকে 'অস্বাভাবিক' বলবারও কোনই হেতু নাই)। এ সম্বন্ধে নানারকম চিত্তাকর্ষক আলোচনা নানা দিক থেকে করা যেতে পারে, কিন্তু আপাততঃ আমি তা থেকে বিরত হলাম। প্রকৃতপক্ষে যৌন-সংসর্গ শরীরের ক্ষতিবিধান করে তখনই —যখন নাকি তা ক্রমাগত যেতে থাকে মাত্রা ছাড়িয়ে এবং একজন যক্ষ্মারোগীর ভয় থাকা উচিত ঠিক সেইখানেই। যে কোন কাজেই যেমন তার নিজের সীমা সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে, তেমনি এ কাজেও। যে কোন কাজে উচ্ছৃঙ্খলতা দ্বারা সে যেমন নিজের বিপদ ডেকে আনতে পারে, ঠিক তেমনি এ কাজেও। যে কোন কাজে উত্তেজিত এবং পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বার দরুন সে যেমন নিজের বুককে জখম করতে পারে, তেমনি এ কাজেও। কাজেই যৌন-চর্চা করতে হবে একটা শান্ত এবং সংযত ভাব নিয়ে এবং সর্বপ্রকার "বাড়াবাড়ি" সম্বন্ধেই রোগীকে থাকতে হবে সতর্ক। তবে "বাড়াবাড়ি" কথাটার কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই এবং প্রত্যেকের পক্ষে একই নিয়ম খাটবে না। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ বিচার হবে। নইলে কেবল "যৌন-সংসর্গ"ই শরীরকে ধ্বংস করে একথা ভাবা একান্ত ভুল। এ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় খোলাখুলিভাবে অন্ধ-সংস্কার-মুক্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করলে সুফলই পাওয়া যায় এবং

নিজের অবিবেচনাপ্রসূত ভুলের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আর, অনেকে হয়ত একথাটা জানেনও না যে, কোন কোন মনোসমীক্ষণবিদের মতে অতিরিক্ত যৌন-সংযম অথবা অতৃপ্ত যৌনাকাঙ্ক্ষা কতকগুলি অবস্থার ভিতর দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে দেহকে টি. বি. রোগ-প্রবণ করে তুলতে গৌণভাবে সহায়তাই করে থাকে !

একটি বিষয়ের এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যৌন-তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের জ্ঞান এত কম যে তা বলবার নয়। লোকে বিবাহই করে মাত্র, অন্যান্য নিকৃষ্ট জীবের মত সন্তান-সন্ততিও উৎপাদন করে থাকে, কিন্তু যৌন-জীবন সম্বন্ধে তাদের অধিকাংশের অজ্ঞতা এত অধিক এবং বিবাহিত জীবনকে কি করে মধুর ও সুন্দর ভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে তাদের চিন্তাশীলতা এত কম যে তার দরুন যে সব সমস্যার উদ্ভব হয় তার প্রতিবিধান সহজে সম্ভব হয় না।

(২) যক্ষ্মাগ্রস্তা নারীর পক্ষে গর্ভধারণ যে অধিকাংশ সময়ে বিপদযুক্ত এটা অনেক বিশেষজ্ঞই বলছেন। কিন্তু সে বিপদটা গর্ভ-বহন কালে নয়, সেটা প্রসবের সময়ে এবং প্রসবের পরে। সেই সময়েই এই বিপদ সচরাচর গুরুতর আকার ধারণ করে। বরং গর্ভ যতদিন থাকে, ততদিন পর্যন্ত অনেক যক্ষ্মাগ্রস্তা নারীর স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতিই পরিলক্ষিত হয়েছে; কিন্তু প্রসবের পরেই তাদের শরীর ভেঙে পড়ে। মোটের উপর বুকে যদি দোষ খুব বেশি না থাকে, সেই দোষ উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা বেশ ভালভাবে সেরে যাবার পরে যদি নারী গর্ভিণী হয়ে থাকে, এবং তার স্বাস্থ্যের সাধারণ অবস্থা যদি বরাবর ভাল থেকে থাকে তবে দুটি একটি সন্তানের জননী হবার পক্ষে তার বাধা না থাকাই সম্ভব এবং এই সন্তান প্রসবের ফলে সে কাতর হয়ে না-ও পড়তে পারে। কিন্তু পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ বা সন্তান-প্রসবকে একেবারেই নিরাপদ বলা চলেনা।

যাই হোক, এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে—প্রয়োজন অনুযায়ী Birth-Control অর্থাৎ জন্মনিয়ন্ত্রণ। স্বামী এবং স্ত্রী কৃত্রিম এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে সন্তান-জন্মরোধ করবার প্রক্রিয়াগুলি উত্তমরূপে জানবার জন্যে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কেতাব পড়ে নেবেন। এ সব ক্ষেত্রে যাঁরা জন্ম-শাসনের বিষয় চিন্তা না করবেন, তাঁদের সম্পূর্ণরূপে অশিক্ষিত, কুরুচি-সম্পন্ন এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন আখ্যায়ই শুধু অভিহিত করা যেতে পারে।

যক্ষ্মারোগের দিক থেকে গর্ভাবস্থাকে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন আলোয় বিচার করেছেন এবং বিষয়টি নিয়ে বহু মতদ্বৈধ বর্তমান। অনেকে অবিশ্যি এটা নিয়ে বেশ নিরাশার বাণীই শুনিয়েছেন—তাঁদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী। আবার কেউ কেউ বা অতটা হতাশ হবার কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁরা জিনিসটিকে উৎসাহের দৃষ্টি দিয়েই দেখছেন এবং এসম্বন্ধে আশা-পূর্ণ মতামত প্রচার করছেন। এই সব অভিজ্ঞেরা এই মত প্রকাশ করছেন যে এই বিষয়ে যদি ধাত্রীবিদ্যাবিশারদগণ এবং যক্ষ্মাতত্ত্ববিদ্‌গণ একযোগে—পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করেন তবে যে এসব ক্ষেত্রে অনেক বেশি সুফল পাওয়া যাবে তাই নয়, অধিকন্তু এমন অনেক জীবন রক্ষা পাবে যা নাকি অন্যথায় নষ্ট হয়ে যেত।

জনৈক বিশেষজ্ঞের মত আমি এখানে অনুবাদ করে দিচ্ছি—যা থেকে তাঁর বক্তব্যটি সুপরিস্ফুট হবে :

"গর্ভবতী অথবা গর্ভবতী হবার অবস্থা যার আসন্ন এমন কোন যক্ষ্মাক্রান্তা নারীর ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কর্তব্য এই যে, যদি সে গর্ভবতী হয়ে থাকে তবে তার অসুখের চিকিৎসা সুষ্ঠুরূপে চালিয়ে যেতে হবে, আর যদি সে গর্ভ-বতী না হয়ে থাকে তবে চিকিৎসা দ্বারা সম্পূর্ণ উপকার না পাওয়া পর্যন্ত গর্ভ স্থগিত রাখতে হবে। কতিপয় ক্ষেত্রে চিরকালের জন্যেই গর্ভ-সঞ্চার বন্ধ রাখতে হতে পারে। যতদূর অবধি অবস্থায় কুলোয়—সক্রিয় ব্যাধিগ্রস্তা

গর্ভবতী স্ত্রীলোককে স্যানাটোরিয়ামের নিয়মে রাখতে হবে। অবিশ্যি ভিন্ন ভিন্ন রোগিণীকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিচার করতে হবে এবং সব চেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে যে, যক্ষ্মার ক্ষতটা কি শ্রেণীর এবং সেটার বৃদ্ধি পাবার প্রবণতাটা কি রকম। খুব সহজভাবে যাতে প্রসব হয়ে যায় তার ব্যবস্থা করা উচিত এবং শিশুকে স্তন্যপান করতে না দিয়ে দূরে সরান উচিত। গর্ভকে নষ্ট করে ফেলবার প্রয়োজন খুব কদাচিৎই ঘটে থাকে। যে সব নিয়মের কথা বলা হল এগুলি যদি পালন করে চলা যায় তবে টি-বি-গ্রস্তা গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে একটা হতাশ-দৃষ্টি নিয়ে থাকবার কোন কারণ থাকতে পারেনা।"

তবে কোন কোন চিকিৎসক যক্ষ্মাগ্রস্তা নারীর গর্ভগ্রহণকে এখনো কিছুতেই পুরোপুরি সমর্থন করে উঠতে পারছেন না এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আপত্তিই করছেন। একটি সুদীর্ঘ রচনার ভিতর অনেক কথাই বলে জনৈক চিকিৎসক একটি স্থানে বলছেন : (আমার অনুবাদ) :

"স্ত্রীলোকটির আর্থিক অবস্থা, তার সামাজিক জীবন, এ বিশ্বাস তার উপর রাখা যেতে পারে কিনা যে তাকে যে সব উপদেশ দেওয়া হবে সেগুলি সে যথাযথরূপে পালন করে চলবে, বুকের ক্ষতটির জাতি এবং প্রকৃতি কি রকম—সক্রিয় না নিষ্ক্রিয়, ক্ষুদ্র না বিস্তৃত, প্রাথমিক অবস্থায় না আধিক্যের অবস্থায় * * *—ইত্যাদি অনেক বিষয়ই বিবেচনা করতে হবে। কোন একটা মতামত নির্ধারিত করতে এত সব চেষ্টা সত্ত্বেও এটা আগে থেকে বলা বড়ই শক্ত যে একটি যক্ষ্মাক্রান্তা গর্ভবতী নারীর অবস্থা শেষ পর্যন্ত কি গিয়ে দাঁড়াবে। * * *"

গর্ভকে নষ্ট করবার চেষ্টাও সব সময়ে ঠিক নয়, কারণ গর্ভাবস্থা একটু এগিয়ে গেলে সে চেষ্টায় যে বিপদ আসতে পারে, পূর্ণ গর্ভান্তে প্রসবের সময়ে তার চেয়ে বেশি বিপদ রোগিণীর আসে না, এইটাই অভিজ্ঞগণের মত। এক

কথায়, জননী হবার ইচ্ছা মাত্রেই বিশেষজ্ঞের নির্দেশ বা অনুমতির যে রকম প্রয়োজন, গর্ভাবস্থায় যে কোন ব্যবস্থা সম্বন্ধেও তার তেমনই প্রয়োজন।

(৩) যক্ষ্মারোগে বংশানুক্রমিকতা সম্বন্ধে এবং যক্ষ্মাগ্রস্ত পিতামাতার সন্তানের লালন-পালন সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে কিছু আলোচনা আমি করেছি। সেই অধ্যায়েই এর উত্তর পাওয়া যাবে। এই পয়েন্ট্ দ্বারা বিবাহকে সমর্থন না করবার কোন হেতু নাই।

(৪) বিবাহিত জীবনে সর্বদাই কি কেবল নানারকম ঝঞ্ঝাটই আসে? নানারকম অশান্তি এবং দুশ্চিন্তার বোঝাই কি বিবাহিত জীবনের সবটুকু? বিবাহিত জীবনকে যারা শুধু একটা স্থূল এবং বিকৃত দৃষ্টি দিয়ে দেখে তারা কোনমতেই পারে না সফলতার সঙ্গে এ জীবন যাপন করতে। বিবাহ তার সমস্ত মধুরতাকে উদ্ঘাটন করে শুধু তারই কাছে—যার আছে একটি মার্জিত রুচি এবং কিছু সৌন্দর্যবোধ। স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরের প্রতি যদি বিশ্বস্ত হয়, যদি তারা স্বার্থ-শূন্য, সেবাপরায়ণ প্রকৃতির হয়, এবং প্রেমের জন্য যদি তারা যে কোন প্রকার ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত থাকে তবে তারা সব কিছুই ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখবে, এবং সেই সব ভয়ানক রকম মানসিক বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতাও তাদের হবে না—যা নাকি অসুন্দর বিবাহের একটা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ এবং যা নাকি স্বাস্থ্যের পক্ষে নিশ্চিতরূপে হানিকর। একথা বলেছি যে, অধিকাংশ সময়ে অর্থাভাবই আমাদের বহু অশান্তি এবং দুশ্চিন্তার মূল কারণ। কিন্তু রোগীর নিজের যদি আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকে, অথবা সম্পূর্ণ বেকার না থেকে তিনি যদি এমন একটি কাজের সুবিধা করতে পারেন যার দ্বারা তাঁর অর্থাগম হবে এবং তাঁর হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি যদি মৃত হয়ে না গিয়ে থাকে, তবে বিবাহিত জীবন যে তাঁর শুধু সুখের হবে তাই নয়, সুস্থ থাকবার পক্ষে তা তাঁর সম্পূর্ণরূপে

সহায়ক হবে। অবিবাহিতের চাইতে বিবাহিতরা এই রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অধিকতর সততা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে করে থাকেন বলে আমাদের বিশ্বাস এবং এ সম্বন্ধে প্রমাণও আছে। বিবাহিত রোগীদের সাধনার ভিতরে অনেক সময়ে বেশি নিষ্ঠা থাকবার কারণ আর কিছুই নয়—তারা তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন। উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব মনে এলে তাদের চলেনা, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা এবং কর্তব্যপরায়ণতা হৃদয়ে রাখতে হয় তাদের অক্ষুণ্ণ। (এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে—অবিশ্বাসী এবং নির্মম প্রকৃতির স্বামী বা স্ত্রীর কথা এখানে আমি তুলছিনা)।

জনৈক মরমী যক্ষ্মাবিশেষজ্ঞের একখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক থেকে কয়েকটি সুন্দর লাইনের অনুবাদ করে এখানে আমি তুলে না দিয়ে পারলাম না :

"বিবাহ সহানুভূতির, স্নেহ এবং ভালবাসার, আনন্দ এবং সুখের সমস্ত কোমল আবেগকে জাগিয়ে তোলে, রোগীকে জীবনের একটা উদ্দেশ্য, বাঁচবার একটা অবলম্বন এনে দেয় এবং সবগুলি মিলে তার মনের কতকগুলি বিশিষ্ট সম্পদ এবং শক্তিকে তোলে ফুটিয়ে—যা দিয়ে তার স্বাস্থ্য ওঠে গড়ে। প্রেম এমন একটি সক্রিয় শক্তি যা নাকি জীবনকে সমৃদ্ধ করে এবং সব রকম পরীক্ষায় এবং আকস্মিক প্রয়োজনে মানুষকে উন্নীত করে।"

যক্ষ্মারোগীর বিবাহ, পিতৃত্ব, মাতৃত্ব-সম্বন্ধে এই চমৎকার কথা কয়েকটি বলে এই বিশেষজ্ঞটি তাঁর গ্রন্থখানি শেষ করেছেন : (আমার অনুবাদ) :

"পার্থিব বিজ্ঞতা এবং স্বার্থের চোখে যক্ষ্মারোগীর পক্ষে এসব নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়; কিন্তু প্রেম দেবে যক্ষ্মারোগীকে প্রত্যেক মানবীয় আত্মীয়তার ক্ষেত্রে সত্য পথে চলবার সৎসাহস, সহ্যশক্তি এবং জ্ঞান, এবং প্রিয়জনের ভাগ্যে দুঃখ বহন করে আনবার আগে করবে আত্মবিসর্জন। কারণ সে জানে যে একটি শস্যের কণা মাটিতে পড়ে যে ধ্বংস হয় সে শুধু আবার বাঁচবার জন্যেই এবং মৃত্যু বিলীন হয়ে চলেছে একটি বৃহত্তর জীবন

এবং জয়ের ভিতরে!"—(মনে রাখতে হবে এই চিকিৎসকটি কেবল "প্রকৃত" ভালবাসারই উল্লেখ করছেন; তার অসংখ্য প্রকার "মেকী" সংস্করণের নয়!)

(৫) যক্ষ্মারোগীকে এসব ক্ষেত্রে খানিকটা ঝুঁকি নিয়ে চলতেই হবে। যে কোন কাজে কিছুটা ঝুঁকি ঘাড়ে নেবার সাহস যদি না থাকে তা হলে যক্ষ্মারোগী ত দূরের কথা—সুস্থ লোকেরই কখনো চলে কি? সুখ, দুঃখ, বিপদ, আপদ, উন্নতি, অবনতি—কার জীবনে কখন কি রকম আসবে বলা চলেনা। সুস্থ যক্ষ্মারোগীর নিজেকে নিয়ে নিরর্থক একটা কোন হৈ চৈ-এর সৃষ্টি করবার বিশেষ কারণ থাকতে পারে না। শরীরের উপযুক্ত যত্ন নেবার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা নিজের আয়ত্তে যথাসম্ভব এনে রোগীকে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করে যেতে হবে। সম্পূর্ণ সুস্থ লোকই হোন আর একজন 'সুস্থ' যক্ষ্মারোগীই হোন, কারুর ক্ষেত্রেই, ঝুঁকি না নিলেই জিততে হবে এবং ঝুঁকি নিলেই ঠকতে হবে, একথা সত্য নয়। কার জীবন যে কোন্ পথে সার্থক হয়ে উঠবে, একথা আগে থেকে কেউই বলতে পারে না—তা সে লোকটির জীবন-ধারা যেমনই হোক না কেন বা সে যে শ্রেণীভুক্তই হোক না কেন। জীবনের যে কোন পথে যক্ষ্মারোগীর ভীরু হবার কোনই মানে হয় না। এ বিষয়ে তাকে সাহায্য করবার জন্যে মূর্খতা ত্যাগ করে সমাজকেও সুবিবেচনার সঙ্গে আসতে হবে এগিয়ে।

স্বামী অথবা স্ত্রী—যিনিই যক্ষ্মাক্রান্ত হোন না কেন, একে অপরকে সংক্রামিত করতে পারে একত্র থাকবার ফলে—এ ভয়টাকেও অনেক সময় একটু অতিরঞ্জিতই করে তোলা হয়। স্বামী এবং স্ত্রী যদি নির্বোধ না হন, এবং গভীর একটা স্নেহ ও সহানুভূতির ভাব নিয়ে রোগ-নিবারণী ব্যাপারে পরস্পরের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেন তা হলে পরস্পরের কাছে পরস্পরের নিরাপদে থাকা কিছুমাত্র কঠিন হবে না। অসুখ যদি 'ভাল'ভাবে 'ভাল'

হয়ে যায় এবং থুতু যদি আর না আসে, অথবা এলেও তাতে যদি যক্ষ্মাজীবাণু বর্তমান না থাকে তা হলে আর সংক্রমণের ভয় কি? একথা অবিশ্যি অস্বীকার করবার উপায় নাই যে, স্বাভাবিক স্বাস্থ্য বজায় থাকলে স্বামী-স্ত্রী তাদের বিবাহিত জীবনকে যতখানি হুটোপাটি করে উপভোগ করতে পারে, এমন অবস্থায় ঠিক অতটা হয়ত নিশ্চয়ই সম্ভব নয়, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর ভিতর প্রীতি, অনুরাগের শিথিলতা যদি না ঘটে, তাদের ভালবাসা যদি একটু উন্নত ধরনের হয়, ও তাতে প্রকৃত উদারতা, গভীরতা এবং আন্তরিকতা থাকে, তবে পৃথিবীতে এমন কিছুই নাই যা নাকি তাদের পরস্পরের কাছে পরস্পরের নিরাপদে থাকা কোনপ্রকারে অসম্ভব করে তুলতে পারে অথবা সত্যি করে তা'দিগকে কোনভাবে অসুখী করতে পারে।

"কামসূত্রে" বাৎস্যায়ন যে রকম বলেছেন এবারে আমিও সে রকম বলতে চাই—এতগুলি অধ্যায় তো সবাই পড়লেন, এখন বিবাহিত জীবনে কখন কোন্ বিষয়ে কি রকম সাবধানতা অবলম্বন করবার দরকার, বুদ্ধিমান রোগী অথবা রোগীণী মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে বের করতে থাকুন।···Good luck··· !

কিছুদিন আগে ইংল্যাণ্ডের জাতীয় যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত কোন পত্রিকার একটি সংখ্যায় জনৈক বিশেষজ্ঞের লেখা অতি মনোরম একটি কথোপকথন বেরিয়েছে, যা এখানে যদি আমি অনুবাদ করে দিই, সবাই পাঠ করে বেশ আমোদ এবং শিক্ষা পাবেন। কথোপকথনটির নামকরণ হচ্ছে :

"ডাক্তারবাবু, আমি কি বিয়ে করতে পারি?"

তারপরে আসল অংশ হল সুরু :

"পুরুষ রোগী। ডাক্তার বাবু, আমি কি বিয়ে করতে পারি?

স্যানাটোরিয়াম ডাক্তার। তুমি যখন আরোগ্য লাভ করেছ, তখন কেন পারবে না?

রোগটা যখন 'টি. বি.'—

রোগী। কিন্তু আমার সন্তান-সন্ততিরাও কি এই ব্যাধিগ্রস্ত হবে না তা হলে?

ডাক্তার। না, তা হতে পারেনা। তা ছাড়া স্যানাটোরিয়ামে বাস করে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কোন শিক্ষা পাবার সুযোগ যাদের হয়নি তাদের চাইতে তোমার দ্বারা ব্যক্তিগত সংস্পর্শের ভিতর দিয়ে এই রোগ-সংক্রমণের সম্ভাবনা ঢের কম।

রোগী। বিবাহ করব বলে আমার সঙ্গে যার কথাবার্তা স্থির হয়েছে, তার পিতামাতার কি এ বিষয়ে আপত্তি করবার কোন অধিকার আছে?

ডাক্তার। আপত্তি করবার কোন অধিকারই নাই যদি না তুমি তোমার ভাবী বধূর কাছে তোমার স্বাস্থ্যের বিষয় গোপন রাখ, এবং যদি না আপত্তির অন্য কোন ক্ষেত্র থাকে। বিবাহটা তোমাদের দুজনের ব্যাপার।

রোগী। কিন্তু আমার উপার্জন-ক্ষমতার বিষয় কি বলতে চান? এই অসুস্থতা দ্বারা সেই ক্ষমতা কি আমার কমে যায়নি?

ডাক্তার। যদি কমে গিয়েও থাকে, আমি তোমায় বলেছি যে এসব অসুবিধাগুলি ধরে নিয়েই সাহসের সঙ্গে তুমি তাদের সম্মুখীন হবে।

রোগী। বিয়েটা কি আমার কিছু পিছিয়ে দেওয়া উচিত নয়?

ডাক্তার। আমি ধরে নিতে পারি যে তোমরা দুজনেই শীগ্‌গীর করে বিয়ে করবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছ। যদি তাই-ই হয়, তবে দেরি করবার কোনই কারণ নাই—অবিশ্যি এইটুকু যদি তুমি প্রথমে প্রমাণ করে দিতে পার যে স্যানাটোরিয়ামের বাইরে গিয়ে তুমি তোমার সুস্থতাটাকে বেশ বজায় রাখতে পারবে। কিন্তু এটি নিশ্চিতভাবে আগে জানবার দরকার যে, মেয়েটি তোমার সঙ্গে বেশ বুদ্ধিমতীর মত সহযোগিতা করবে। এর পরেও তোমাকে একটি শান্ত জীবন যাপন করেই চলতে হবে, ঠিক

সময় মতন খেতে হবে, রাত্রে সুনিদ্রার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং বেশ শান্তভাবেই সমস্ত সন্ধ্যাটা এবং সপ্তাহান্তে ছুটির দিনগুলি কাটাতে হবে। মেয়েটি তার স্বভাব দ্বারা এসব বিষয়ে তোমায় সাহায্যও করতে পারে অথবা এসব পালন করা তোমার পক্ষে কঠিনও করে তুলতে পারে।

রোগী। ওঃ, ডাক্তারবাবু, আমি তার উপর খুবই নির্ভর করতে পারি বলে মনে করি। দেখুন, সে নিজেই এক সময়ে রোগী হয়ে একটি স্যানাটোরিয়ামে ছিল। সে এখন বেশই ভাল হয়ে গিয়েছে। তার দেহে কি আমি পুনরায় কোন জীবাণু-সংক্রমণ ঘটাতে পারি—?

ডাক্তার। এখানে তুমি যা শিখেছ তা যদি ঠিক মেনে চল—না, তা হলে সে ভয় কিছুই নাই। বিশেষতঃ তোমার থুতুই যখন আর নাই—

* * * *

স্যানাটোরিয়াম ডাক্তার। তা হলে তুমি বিয়ে করতে চাইছ, কেমন তো? কিন্তু তুমি যাকে বিয়ে করতে চাও সেই ছেলেটি তোমার স্বাস্থ্যের যে গোলমাল হয়েছিল সে সম্বন্ধে সব কিছু জানে?

নারী-রোগী। হ্যাঁ, জানে বলেই মনে করি। কিন্তু এ নিয়ে তার কিছুমাত্র খুঁত্‌খুঁতি নাই।

ডাক্তার। বেশ; কিন্তু এটা কি সে বুঝতে পারে যে তোমার সম্বন্ধে কোনরকম খুঁত্‌খুঁতির ভাব না রাখাটা তাকে ক্রমাগতই বজায় রাখতে হবে? তুমি তাকে বল যে অন্ততঃ দু বছরের ভিতর তোমাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ বলে বিবেচনা করা যাবেনা এবং তাকে এ-ও বুঝিয়ে বল যে কি কি ভাবে তোমার নিজের যত্ন তোমাকে নিতে হবে।

রোগীণী। কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমি কি সন্তানের মা হতে পারি?

ডাক্তার। হ্যাঁ। কিন্তু ঠিক এখনই নয়। আমার সঙ্গে, অথবা তোমাদের গৃহ-চিকিৎসকের সঙ্গে পুনরায় এসে দেখা ক'রো—যদি নাকি

তুমি এবং তোমার ভাবী স্বামী বুঝতে না পার যে ঠিক কিভাবে উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

রোগিণী। গর্ভ কি খুব বিপজ্জনক? কতদিনের ভিতর আমি একটি শিশুকে পেতে পারি?

ডাক্তার। সাধারণতঃ গর্ভাবস্থাটা বিপজ্জনক নয়, কিন্তু ঠিক প্রসবের পর থেকেই বিপদের সম্ভাবনা। তোমার আরও দুটি বচ্ছর অপেক্ষা করা উচিত। তুমি আবার তখন এসে জিজ্ঞেস ক'রো, তখন আমরা দেখব যে তোমার অবস্থাটা ঠিক উপযুক্ত হয়েছে কিনা।

রোগিণী। আমি কি গৃহস্থালির কাজকর্ম করতে পারি?

ডাক্তার। হ্যাঁ, তবে রয়ে-সয়ে। নিজেকে কখনো পরিশ্রান্ত করে তুলোনা, যথাসময়ে নিয়ম-মত বিশ্রাম নেবে, এবং বেশি সময় যদি তোমাকে গৃহে আবদ্ধ থাকতে হয়, একথা ভুলোনা যে মুক্ত, বিশুদ্ধ বায়ু তোমার পক্ষে দরকার। কিন্তু তার জন্যে তুমি খোলা জানালার ধারে বসে বেশ কাটাতে পার, এবং তোমার যদি প্রচুর শারীরিক সামর্থ্য না থাকে, তা হলে ঘরের বাইরে গিয়ে হাঁটা-চলা করবার দরকার আছে একথা তোমার মনে করে কাজ নাই—যদি নাকি ঘরের ভিতরেই তুমি তোমার শক্তি খরচ করে ফেলে দাও।"...

* * * * * *

এবারে রোগীর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে আমার কয়েকটি বিষয় বলবার আছে।

এটা বোধ হয় আর বেশি কথা বলে বুঝাতে হবে না কাউকে যে, একজন টি. বি. রোগীর জীবন আগাগোড়া নানাদিক থেকে কতখানি বেদনায় পূর্ণ। অসুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার অবস্থা হয় ঠিক জল থেকে ডাঙায় টেনে তোলা মাছের মত এবং নানারকম যন্ত্রণাকর অভিজ্ঞতা তার মস্তিষ্ককে

অল্প সময়ের ভিতরেই বিকৃত করে তুলবার উপক্রম করে। চঞ্চলতা এবং উৎসাহভরা জীবন থেকে হঠাৎ তাকে এসে পড়তে হয় একটা স্তব্ধতার ভিতরে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাকে অবিলম্বে করে তোলে ম্রিয়মাণ। এই রোগের রোগী জীবন সম্বন্ধে প্রায়ই হতাশ হয় না, সে তার অসুস্থতা নিয়ে বিষণ্ণ থাকে না, মনে একটা খুশি এবং আশার ভাবই তার বেশি থাকে—অধিকাংশ সময়ে সাধারণ লোকের এসব ধারণা একটা মিথ্যা ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রোগের বিষের ক্রিয়ার জন্যে খারাপের দিকে যেতে থাকলেও কখনো কখনো সে মনে করে বটে যে সে উন্নতি লাভই করছে অথবা করবে—কিন্তু বেশি-সংখ্যক রোগীর পক্ষেই ঘটে ঘোরতর মানসিক অবসাদ।

তার বেদনা আরও সহস্রগুণ তীব্র হয়ে ওঠে, যখন সে কোনভাবে উপলব্ধি করতে পারে—তার আপন জন, তার প্রিয়জন তার প্রতি বিমুখ হয়েছে, তাকে একটা উৎপাতের মত বা তাকে ঘৃণা ও পরিত্যাগের যোগ্য বলে বিবেচনা করতে স্থরু করেছে, অথবা অন্য কোন প্রকারে তার সম্বন্ধে অমনোযোগী হয়ে উঠেছে। শারীরিক এবং মানসিক নানা যন্ত্রণায় ক্ষুব্ধ, দীর্ঘ ব্যাধি-জীবনে তার সমস্ত অন্তর একান্তভাবে ব্যাকুল হয়ে ওঠে সবার স্নেহ, মমতা, সহানুভূতি পাবার জন্যে; তার সমস্ত মন একান্তভাবে উন্মুখ হয়ে ওঠে সকলের কাছ থেকে আশা, উৎসাহ, শক্তি পাবার জন্যে; সকলের মাঝখানে সে কাতরভাবে খোঁজে একটু শাস্তি, একটু সান্ত্বনা। তার ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় নিয়ে সে খোঁজে একটি কোমল, সকরুণ চোখের দৃষ্টি, তপ্ত ললাটে একটি শান্ত, স্থগভীর স্নেহ-সিক্ত করস্পর্শ। এসব থেকে যদি সে বঞ্চিত হয়, তবে তার জীবন যে কতখানি তুর্বিষহ হয়ে ওঠে, এই তুরন্ত ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম করা তার পক্ষে যে কতখানি তুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, তা কি প্রকাশ করে বলতে পারা যায়? একজন চিকিৎসক (নিজেই টি-বি গ্রস্ত) তাঁর

রচিত টি-বি সম্বন্ধে সুন্দর একখানা গ্রন্থে সুস্পষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে এই কথা কয়েকটি লিখেছেন : (আমার অনুবাদ) :

"রোগের সঙ্গে সংগ্রামের দীর্ঘ, ক্লান্তিকর মুহূর্তগুলিতে স্ত্রী, ভগিনী, অথবা বন্ধুর পক্ষে সেবা এবং আত্মত্যাগের যে মহান সুযোগ আসে, সম্ভবতঃ এরকম আর তাদের জীবনে কখনই আসে না, এবং জীবনে অন্য কোন বিপদের সময়েই রোগীর কাছে একটি প্রকৃত সেবা এত অধিক সাহায্যজনক হয় না বা তার মূল্য তার কাছে এত বড় হয়ে ওঠে না।"

কলিকাতার একটি সুপরিচিত মাসিকপত্রের একজন ভূতপূর্ব সম্পাদক কলিকাতার উপকণ্ঠাবস্থিত যাদবপুর যক্ষ্মা-হাসপাতাল দেখে এসে ঐ হাসপাতাল সম্বন্ধে অন্য একটি সুপরিচিত মাসিকপত্রে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধটির একটি জায়গায় ছিল : "আমরা (আমি ও কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ সান্ন্যাল) যেদিন যাদবপুর দেখিতে গিয়াছিলাম, সেদিন দেখিলাম রোগীদের মধ্যে কেহ সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন, কেহ চিঠিপত্র লিখিতেছেন, কেহ গ্রামোফোন বাজাইতেছেন। কাহাকেও বিমর্ষ বা চিন্তাক্লিষ্ট দেখিলাম না। যে রোগ 'শিবের অসাধ্য' (শিব একজন বড়দরের চিকিৎসক, একথা বোধ করি আমার হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী পাঠক-পাঠিকার অজ্ঞাত নাই) বলিয়া কথিত, যে রোগের নাম শুনিলেই শোণিত জল হইয়া যায়, সেই রোগে আক্রান্ত হইয়াও যে রোগী প্রফুল্লমুখে বসিয়া গল্পগুজোব করে, আরোগ্য চিন্তা করে, ইহা দেখিয়াও সুখ! শুনিয়াও সুখ! "কেমন আছেন? শরীর ভালো বোধ করিতেছেন কি?" মাত্র এই দুটি প্রশ্নেই তাঁহাদের কত আনন্দ! "আমরা আপনাদের দেখিতে আসিয়াছি" —শুনিয়া সকলেরই মুখ অম্লান হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। * * আত্মীয়ের কথা বলি না, অনাত্মীয়ের ব্যবহারে আত্মীয়তার কণামাত্র অনুভব করিলে, এই রোগের তাপ অনেকখানি হ্রাস পায় বলিয়াই কথাটা এখানে বলিলাম।

—রোগটা যখন 'টি. বি.'

"একটি সুন্দরী নারী শয্যাপ্রান্তে বসিয়া সীবন করিতেছিলেন—শিল্প-কার্য্যটি দেখিবার মত, বোধ হইল, একখানি রেশমী টেব্‌ল ক্লথ। আমরা নিকটে যাইতেই শিল্পকার্য্য রাখিয়া দিয়া যুক্তকরে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন আছেন ?" উত্তর হইল, "অনেক ভাল।" বাড়ীর লোক রোজ আসে কিনা, বসিয়া গল্পগুজোব করে কিনা, জিজ্ঞাসা করায় মেয়েটি বঙ্গললনাসুলভ ব্রীড়ানম্রমুখে ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, আসে; ভাইয়েরা আসে, দেবর আসে। অর্থাৎ মনে হইল, 'একজন' ছাড়া সবাই আসে। বাহিরে আসিয়া যাহা শুনিলাম, তাহা যেমন মর্ম্মন্তুদ, তেমনই করুণ! সেকথা প্রকাশ করিয়া লাভ নাই, বরং ক্ষতির সম্ভাবন সমধিক।"

'অনাত্মীয়ের ব্যবহারে আত্মীয়তার কণামাত্র অনুভব করিলে' যদি এই রোগের তাপ অনেকখানি হ্রাস পায়, তাহলে আত্মীয়ের ব্যবহারে অনাত্মীয়তার কণামাত্র অনুভব করলে ঠিক সেই পরিমাণেই কি এই রোগের তাপ বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক নয়? প্রিয়জনদের সঙ্গলাভের জন্যে এই রোগী যে কি রকম আকুল হয়ে উঠতে পারে, প্রিয়জনদের বিচ্ছেদ-ব্যথা এই রোগীর বুকে কি রকম বাজতে পারে, এখানে তার আর একটু উল্লেখ আমি করছি। জনৈক বাঙ্গালী ভদ্রমহিলা কলিকাতার একটি বিশিষ্ট ইংরাজী দৈনিকে একটি চিঠি লেখেন—"TB. Sanatorium : Its Immediate Necessity in Bengal" এই শিরোনাম দিয়ে—মাদ্রাজের মদনপল্লী স্যানাটোরিয়াম থেকে। ইনি নিজেই একজন টি. বি. পেসেন্ট এবং উক্ত স্যানাটোরিয়ামে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বাঙ্গলার বাইরে অন্য কোন প্রদেশের কোন স্যানাটোরিয়ামে বিছানা পাওয়া নিয়ে, অনভ্যস্ত মুখে সেই প্রদেশের খাওয়া নিয়ে, ভিন্ন এবং দুর্বোধ্য ভাষা নিয়ে বাঙ্গালীদের যে কত রকম অসুবিধার ভিতরে অনেক সময় পড়তে হয়, এই মহিলাটি তাঁর চিঠিতে সে সবের

উল্লেখ করে এক জায়গায় এই মর্মান্তিক কথা কয়েকটি লিখছেন : (আমার অনুবাদ) :

"এসব অসুবিধা ছাড়াও তারা তাদের গৃহ থেকে হাজার মাইলের উপর দূরে হয় নির্বাসিত, যার দরুন আপন-জনের পক্ষে মাঝে মাঝে তাদের এসে দেখা অসম্ভব হয়ে ওঠে। অসহায় অবস্থায় রুগ্নশয্যায় শুয়ে গোঙাতে গোঙাতে যখন আমরা দেখতে পাই অন্য রোগীদের কাছে তাদের স্বামী, ভাই, বাবা, মা প্রভৃতি সবাই মাঝে মাঝে আসছেন এবং সেই রোগীদের মুখগুলি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, তখন আমাদের হৃদয় ব্যথায় বিদীর্ণ হয়ে যায়।"…

এসব থেকে সহজেই বুঝতে পারা যাবে, রোগীর প্রতি আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের কোনরকম উদাসীনতা তার প্রতি অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছুই নয় ; এবং সব সময়ে যদি একটা ভেঙ্গে-পড়া মনের অবস্থা নিয়ে সে থাকে তবে যুদ্ধে জয়ী হওয়া কখনই তার পক্ষে সম্ভব হবেনা। এটা সবার বুঝতে হবে যে, তাকে শীগ্‌গীর সুস্থ করে তুলতে হলে (তার সামান্য দোষ-ত্রুটি কিছু থাকলেও তা উপেক্ষা করে) তাকে সব রকম স্নেহ-মমতা, সহানুভূতি দিয়ে সর্বদা এমন ভাবে রাখতে হবে আচ্ছন্ন করে, যাতে নাকি নিজের ব্যথা-বেদনা নিয়ে এতটুকু ম্রিয়মাণ হয়ে থাকবার সুযোগ সে কখনো না পায়। কাছে না থেকে সে যদি দূরে থাকে, একলা কোন এক ভিন্ন দেশের হাসপাতালে পড়ে, তবে তাকে এমন চিঠি-পত্র লিখতে হবে যা নাকি তার প্রতি অসীম স্নেহ, আশা, সান্ত্বনা, উৎসাহের বাণীতে থাকবে পূর্ণ। পৃথিবীটা যেন তার কাছে না হয় "hominibus plenum, amicis vacuum"—মানুষে ভরা কিন্তু আত্মীয়-বন্ধু-হীন! একজন টি. বি. রোগী যে কতখানি অভিমানী হতে পারে এবং তাদের সঙ্গে যে কত সাবধানে এবং কত বুঝে চলতে হয়, টি. বি. থেকে বর্তমানে সুস্থ একটি যুবকের কাছে তাঁর একটি টি. বি. বান্ধবীর লেখা কয়েকটি পত্রাংশ

থেকে সকলে তা উপলব্ধি করতে পারবেন। কলকাতায় মেডিকেল কলেজে পাঠ্যাবস্থায় ঐ মেয়েটির অসুস্থতা ঘটে। তাঁর একখানা পত্রাংশ ঃ

"* * * এবারে আমার এখানে আসার কথা লিখি। অক্ষম হ'য়ে অন্যের কাছ থেকে টাকা নিয়ে জীবন কাটাচ্ছি, এইটাই যেন মনকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। ভাবছিলাম কি করে নিজের ভরণ-পোষণ চালাই। আপনার লোকের কাছ থেকে টাকা নিতে সুস্থ লোকের হয়তো মনে কোন ভাবান্তর হয় না। কারণ সে জানে একদিন সে নিজের পায়ে দাঁড়াবে, কিম্বা হয়তো যা' নিচ্ছে তা' একদিন ফিরিয়ে দিতে পারবে। আমার সে আশা নেই—কাজেই যদিও দিদি আমার সব অভাব পূরণ করে, আমি তা' নিতে কুণ্ঠিত হই। লোকে বলে কুণ্ঠিত হবার কোন কারণ নেই, কারণ যে দিচ্ছে সে সন্তুষ্ট মনে দিচ্ছে। আমার মন তাতে সান্ত্বনা পায় না—আমি ভাবি আমার এত নেবার অধিকার নেই। মনে যখন এই সব নিয়ে অত্যন্ত অশান্তি আরম্ভ হ'লো—একদিন এখানকার ডাক্তারকে একটা চিঠি লিখলাম আমায় এরা ল্যাবরেটারীতে কাজ দিতে পারে কি না, কারণ এর আগে একবার এখানকার ডাক্তার আমায় কাজ করবার জন্যে ডেকেছিলেন। * * এখানকার ডাক্তার আমায় আসতে লিখলেন। * * এরা মিশনারী, টি. বি. পেসেণ্টদের জন্যে এদের দয়ামায়া আছে। শরীর খারাপ হ'লেই বিশ্রাম ক'রতে দেবে। আমি স্বাস্থ্য ফিরে পাবার আশায় এখানে আসিনি, একটু যদি স্বাবলম্বী হ'তে পারি, এই আশায় এসেছি। বুঝেছি ডাকলে মরণ আসে না, যতক্ষণ না তার নিজের খেয়াল হবে। কবে তার খেয়াল হবে সেই আশায় কতদিন ব'সে থাকবো? এতদিনও ঠিক বুঝতে পারিনি, কিন্তু ক্রমেই বুঝতে পারছি এখন কেবল দেহের ঠাট বজায় রেখে বেঁচে থাকা, সামর্থ্য একবিন্দু নেই। এই রকম জায়গা ছাড়া এ অবস্থায় আর কোথাও আমার কাজ করা অসম্ভব। নেবেও না কেউ।

তা না হলে আর এই সামান্য ক'টা টাকার উপর নির্ভর করে এতদূর আসি? ভাগ্যের পরিহাস দেখেছ? হাসি পায়, না? এতদূরে আসবার আর একটা কারণ, পাঁচমাস অনবরত বাড়ীতে থেকে বুঝতে পেরেছি, যে রকম mentality হয়েছে—সুস্থলোকের সঙ্গে (সে আপনার লোকই হোক, পরই হোক) মানিয়ে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমিও তাদের বুঝতে পারব না, আর তারাও আমার temper সহ্য করতে পারবে না। আমারই মত যারা হতভাগ্য তাদের মধ্যেই আমার বাকি জীবনটা কাটাতে হবে * *"

অপর একখানি পত্রাংশ:

"* * জানো, আমি যতদূর দেখলাম—এ জীবনে তো অনেক T. B. Patientই দেখলাম—more or less সকলেরই (with average intelligence) মনের অবস্থা একই। প্রথম একটি কিম্বা বড় জোর দুটি বছর তাদের মনে আশা থাকে যে হয়ত ভাল হব, কিন্তু তারপরই এই ভাব। কেউ যদি T. B. Patientদের মনস্তত্ত্ব লিখতে বসে, তা হ'লে আলাদা আলাদা ক'রে একশটার কিম্বা হাজারটার মন বিশ্লেষণ করতে হবে না—গোটা চার পাঁচ দেখলেই কার্য্যসিদ্ধি হবে। তবে তাদের মধ্যে এই একটু তফাৎ যে কেউ বা খুব keenly feel করে আর কেউ বা বেপরোয়া। * * বাড়ীতে থাকতে যে তোমার আর একবিন্দু ইচ্ছে করছে না এ আমি খুব বুঝতে পারছি। * * ঐ তুমি যা বলেছো—আমাদের বোঝবার চেষ্টা কেউ করে না, আর বোঝবার চেষ্টা করে না ব'লেই আমাদের মনের বিদ্রোহভাবটা আরও জোরের সঙ্গে জাগিয়ে তোলে। বাড়ীতে দিদির কাছে যখন ছিলাম সামান্য বিষয় নিয়ে ভাই-বোনদের সঙ্গে খুটোহুটি বাধতো। ওরাও আমার ওপর অসন্তুষ্ট হতো, আমারও মন ভয়ানক খিঁচড়ে যেতো। আমায় তো দিদি একদিন পষ্টই ব'লে দিল, "নি···, তোর মনটা বড় নীচ হয়ে গেছে।" ওরা বলেই খালাস,

কিন্তু ঐ কথাটাই যে আমাদের মনকে কতখানি আঘাত দিতে পারে, সেটা ওরা কল্পনায়ও আনতে পারে না। দিন রাত মনের সঙ্গে আমাদের যে কতখানি যুদ্ধ করতে হয়, জয়ী হওয়া যে কত কঠিন—মাঝে মাঝে দুর্ব্বলতা যে কথার মধ্যে প্রকাশ পাবেই—এ কথা তারা বোঝে না। তারা আমাদের এই দুর্ব্বলতার ওপরে advantage নেয়। এবারে আমি সত্যই মনে মনে ঠিক করেছি যে ভাগ্য আমায় আবার আত্মীয়দের মধ্যে নিয়ে না গেলে নিজে যাবার চেষ্টা আর করবো না। তোমার জন্যে আমার বড় কষ্ট হয়, কতখানি অশান্তির মধ্য দিয়ে যে তোমার দিন কাটে তা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতে পারি। আমাদের মনের বোঝা কারুর কাছে নামাবার নয়। তুমি লিখেছ পথ খুঁজে নেবার চেষ্টায় আছ—কি চেষ্টা করছ আমায় জানাবে কি ? * * *"

আর একখানি পত্রাংশ ঃ

"* * তোমার মনের অবস্থা আমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছি। এত বড় আঘাতটা সহ্য করতে যে তোমার কতখানি আত্মবলি দিতে হচ্ছে সে যে আমি বুঝতে পারছি with every fibre of my life ! আমি মেয়েমানুষ, ভগবান হয়তো সহ্য করবার শক্তি আমায় অনেক বেশী দিয়েছেন। প্রথমে আমারও সমস্ত মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সময়ের দীর্ঘতা আমার সমস্ত বিদ্রোহী feelings-কে যেন একেবারে dull করে দিয়েছে। আমার মনে হয় আমি যেন সময়ের স্রোতে ভেসে চলেছি। না আছে আমার কোন আকাঙ্ক্ষা, না আছে আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার মত উৎসাহ বা শক্তি। কখনও কখনও মানুষের নিষ্ঠুরতা সুপ্ত feelingsগুলোকে জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করে ; কিন্তু ভাই, যুদ্ধ করবার ক্ষমতা তার একেবারে গেছে। তুমি এখনও নিজের অবস্থা মেনে ।নতে পারছো না, যতই তুমি বুঝ্তে পারছো তুমি নাচার—

ততই তোমার মন অক্ষমতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্ছে। লক্ষ্মীটি, আমাদের উপরে যে মহাশক্তি আছে তার বিপক্ষে যুদ্ধ করবার ক্ষমতা আমাদের কতটুকু? সে শক্তির তো একটুকু হ্রাস হবে না—কেবল তুমিই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠবে। Surrender ত একদিন করতে হবেই, ভাই! নিজের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেওয়া কি সব চেয়ে ভাল নয়? অবশ্য এটা যে কত কঠিন তা আমি খুব ভাল ক'রেই জানি, আমার নিজেরও যে খুব বড় রকমের অভিজ্ঞতা আছে! * * *"

একটি ক্ষুব্ধ এবং অসহায় অন্তরের ছবি এই কয়েকটি উদ্ধৃত অংশের ভিতরেই উত্তমরূপে প্রতিফলিত হয়েছে—আর অনাবশ্যক; এবং চিঠিগুলির এই সব অংশ নিয়ে অধিক আলোচনাও নিষ্প্রয়োজন। এখানে ছোট্ট একটি শুধু সংবাদ দিয়ে রাখতে পারি, যিনি এই চিঠিগুলি লিখেছিলেন, দীর্ঘ দশটি বছর ধরে বহু বিরুদ্ধ অবস্থার ভিতর দিয়ে এই ব্যাধির সঙ্গে আপ্রাণ সংগ্রামের পরে কিছুকাল হল তাঁর ব্যর্থ জীবনের সমস্ত ব্যথা, বেদনা, অভিযোগ, অভিমানের চির-অবসান ঘটেছে।

আমেরিকার জাতীয় যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতির অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি ডাঃ অ্যাল্‌ফ্রেড্‌ হেন্‌রি তাঁর অভিভাষণে বলেছিলেন যে, একজন লোককে যখন বলা হয় যে তার টি-বি হয়েছে এবং তাকে যখন বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে কর্মজগৎ এবং সব রকম আমোদ-প্রমোদ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে হাসপাতালে দীর্ঘকালের জন্যে বন্দী অবস্থায় এখন তাকে কিভাবে নিজের চিকিৎসা চালাতে হবে, তখন সেটা তার পক্ষে হয় একজন অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধানের চাইতেও বড় রকমের আঘাত। এই রোগের চিকিৎসা-সংক্রান্ত অন্য কথা বলে ডাঃ হেন্‌রি আফসোস করছেন: (আমার অনুবাদ):

"চিকিৎসার আরেকটি দিককে বড় শোচনীয় ভাবে অবহেলা করা হয়। আমি রোগীর উপযুক্ত মানসিক অবস্থার কথা বলছি। 'রোগে'র চিকিৎসা

করলেই কেবল হবে না, 'রোগী'র চিকিৎসাও করতে হবে। একটি অসুখ এসে লোকটিকে করেছে আক্রমণ, এবং সব অসুখের ভিতর এইটি এমন একটি অসুখ যাকে সর্বদা সে ভয় করে চলত। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অবসাদ, অস্থিরতা এবং বহু ক্ষেত্রে স্নায়বিক বিপর্যয় এসে দেয় দেখা—যা নাকি আগে থেকেই আটকান যেতে পারে। একটি স্যানাটোরিয়ামের অধ্যক্ষ-পদপ্রার্থী জনৈক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—প্রতিষ্ঠানটির কার্য-পরিচালনা ব্যাপারে তার কাছে কোন্ জিনিসটির গুরুত্ব সব চেয়ে বেশি ? তিনি উত্তর করলেন : "রোগীদিগকে সন্তুষ্ট এবং সুখী রাখা।"··· এই ব্যক্তিকেই নিয়োগ করে সুফল পাওয়া গেল। যে চিকিৎসক কৃতকাযতার সঙ্গে যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা করছেন —তিনি একটি নীতি এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখছেন, মানব-জীবন সম্বন্ধে পূর্ণ এবং প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান দিচ্ছেন, এবং এটা উপলব্ধি করেছেন যে মানুষটাই হচ্ছে আসল। অশান্তি, ভীতি এবং উদ্বেগ দ্বারা কোনই অনুকূল সাড়া পাওয়া যাবেনা ; কিন্তু আশা, স্থিরতা এবং আবেগের সংযমের স্থানই সুপ্রতিষ্ঠিত।"

অপর একজন চিন্তাশীল বিশেষজ্ঞও বলছেন : (আমার অনুবাদ) : "রোগীর মানসিক দিকটা হচ্ছে সমস্যাটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। * * * চিকিৎসা-বিদ্যার যেমন একটা বিজ্ঞানের দিক আছে, তেমনি আছে একটি শিল্পের দিকও। এবং এই শিল্প অভ্যাস করবার পক্ষে সব চাইতে গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয় হচ্ছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে কতকগুলি ব্যক্তিগত জিনিস—যার ক্ষেত্রে নাকি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ খাটে না। যে কোন দীর্ঘকালস্থায়ী ব্যাধি, বিশেষ করে টিউবারকুলোসিস্, এই শিল্প চর্চার সর্বোৎকৃষ্ট সুযোগ প্রদান করে। এই দীর্ঘকালস্থায়ী ব্যাধিতে যে কোন রোগী কেবল যে শারীরিক, তাই নয়, একটি গুরুতর মানসিক এবং ভাবাবেগের সমস্যার সম্মুখীন হয়। বেশির ভাগ সময়েই চিকিৎসকেরা এটা উপলব্ধি করতে পারেন না। নিজেদের রোগীদিগকে এই দিককার সমস্যা সম্বন্ধে উপযুক্ত সাহায্য করবার সুযোগ

আছে তাঁদের যথেষ্ট ; কিন্তু এই সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করবার উপযুক্ত শিক্ষা তাঁরা কমই পেয়েছেন। ব্যাধির চিকিৎসায় মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং ভাবাবেগিক বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়ার অর্থই হচ্ছে এই রোগীদের প্রয়োজনকে সোজাসুজিভাবে উপলব্ধি করা, এবং এটা উত্তমরূপে উপলব্ধি না করার দ্বারা চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর অক্ষমতাই শুধু বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। যদি ভবিষ্যতের চিকিৎসক নিজেকে এইদিকে ঠিকমতন গড়ে তুলতে চান, তাহলে আজকে যিনি ছাত্র, তাঁকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরেকার এই সব সমস্যা-গুলির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হতে হবে, এবং এই সব রোগীকে নাড়াচাড়া করবার পদ্ধতিগুলিকে আয়ত্ত করবার জন্যে অনেক অধিক চেষ্টা করতে হবে।"

যে সব চিকিৎসক কেবল একটা ধরা-বাঁধা নিয়মে নিজের কাজ সেরে চলেন এবং যাঁরা রোগীর মনের দিকটা নিয়ে কিছুমাত্র মাথা ঘামান না, উপরি-উদ্ধৃত অংশগুলি তাঁদের চোখ ফুটিয়ে দেবে এবং এটা শিখিয়ে দেবে যে রোগীর পক্ষে সাহস ও মনের প্রফুল্লতা এই রোগের চিকিৎসায় সব দিকে কতখানি সহায়ক হতে পারে। বাস্তবিক, শুধু আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের নয়, রোগীর চিকিৎসকেরও একটি বড় কর্তব্য রোগীর মনকে সব সময়ে হালকা এবং সুখী রাখতে চেষ্টা করা। এতে তাঁর "পদ-মর্যাদা" ক্ষুণ্ণ হবে না বরং তাঁর মহত্ত্বই প্রকাশ পাবে ; এবং লোকসানও তাঁর এতে এমন বিশেষ কিছু নাই। রোগীকে যাদের উপর সর্বদা নির্ভর করতে হবে— এমন যে কোন বন্ধু, আত্মীয় বা চিকিৎসকের প্রতিমুহূর্তে লক্ষ্য রাখা উচিত যে তাঁদের কোনপ্রকার কথায় বা ব্যবহারে তাকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ বা আহত না হতে হয়, যার নাকি নিজের ব্যাধি নিয়ে এমনিই নানাভাবে লজ্জা এবং সঙ্কোচের অন্ত নাই ; এবং এটাও লক্ষ্য রাখা উচিত যে, সে ব্যাধিমুক্ত হয়ে পুনরায় সুস্থ, সুন্দর, সবল, কর্মক্ষম অবস্থায় তাঁদের মাঝখানে আসবে ফিরে— এই সাহস এবং অভয় তাকে প্রদান করা হচ্ছে প্রতিমুহূর্তেই।

—৬—

ভারতবর্ষে কোথায় কোথায় কোন্ টি-বি স্যানাটোরিয়াম বা যক্ষ্মা-নিবাস আছে, এর খোঁজ অনেক সময়ে রোগীর পক্ষে পাওয়া মুস্কিল হয়ে পড়ে। এটা উপলব্ধি করে যতগুলি যক্ষ্মানিবাসের খোঁজ আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি তার একটা ফিরিস্তি এখানে দিয়ে গেলাম। সঙ্গে ঠিকানাও দেওয়া থাকল। এগুলির কোন্‌টায় কি রকমের ব্যবস্থা, কোন্‌টা কি রকম স্থানে অবস্থিত, কোন্‌টায় কত খরচা, কোন্‌টায় কি কি চিকিৎসা প্রচলিত—ইত্যাদি সংবাদ পূর্বে পত্রযোগে বা অন্য কোন সুবিধাজনক উপায়ে উত্তমরূপে গ্রহণ করে তবে রোগী যেটাতে হয় যেন যাওয়া ঠিক করেন—তাঁর প্রয়োজন, ইচ্ছা বা সামর্থ্য অনুযায়ী।

বাংলা ঃ

১। যাদবপুর টি. বি. হাসপাতাল, পোঃ যাদবপুর কলেজ, জেলা ২৪-পরগনা।

২। S. B. Dey টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, কার্সিয়াং।

৩। Clark টি. বি. হাসপাতাল, দার্জিলিং।

৪। লুইস্ জুবিলী স্যানিটারিয়াম, দার্জিলিং। (এটি টি. বি. স্যানাটোরিয়াম নয়, তবে একটি স্বতন্ত্র ওয়ার্ড আছে—সেখানে ৮ জন রোগীর থাকবার ব্যবস্থা আছে। থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা ভাল, কিন্তু চিকিৎসার কোন প্রকার ব্যবস্থাই নাই। যাঁরা অন্য হাসপাতাল বা স্যানাটোরিয়ামে থেকে বেশ সুস্থ হয়ে গেছেন, তাঁরা "চেঞ্জ" হিসাবে অথবা দার্জিলিঙ্ বেড়াতে গেলে এখানে থাকতে পারেন)।

৫। টি. বি. ওয়ার্ড, ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল, দার্জিলিং।

৬। টি. বি. ওয়ার্ড, কার্সিয়াং হাসপাতাল, দার্জিলিং।

রোগটা যখন 'টি. বি.'—

৭। Charteris হস্‌পিট্যাল, কালিম্পং।

৮। টি. বি. ওয়ার্ড, মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা।

৯। টি. বি. ওয়ার্ড, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা।

১০। The ন্যাশ্‌নাল্ ইন্‌ফারমারি, ১৮৯নং মানিকতলা মেইন্ রোড্, কলিকাতা।

১১। টি. বি. ওয়ার্ড, হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল, হাওড়া। (এটি বোধ হয় উঠে গেছে)।

এতদ্ভিন্ন কলিকাতার ক্যাম্বেল হাসপাতাল, ঢাকার মিট্‌ফোর্ড হাসপাতাল এবং মফঃস্বলের অন্যান্য কতকগুলি সদর হাসপাতালে কিছু বেড্ আছে।

মাদ্রাজ ঃ

১। গভর্নমেণ্ট টি. বি. হাসপাতাল, টেম্পল্ গার্ডেন্‌স্, পোঃ রয়াপেটা (Royapettah).

২। দি ইউনিয়ান্ মিশান্ টিউবারকিউলোসিস্ স্যানাটোরিয়াম, পোঃ Arogyavaram, (জেলা Chittoor), South India (সাউথ ইণ্ডিয়া)।

৩। গভর্নমেণ্ট টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, Tambaram.

৪। Visranthipuram টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, Rajahmundry, East গোদাবরি ডিস্‌ট্রিক্ট্।

৫। টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, Perundurai, Coimbatore ডিস্‌ট্রিক্ট্।

৬। শকুন্তলা মেমোরিয়াল টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, Guntur.

৭। কিং জর্জ হস্‌পিট্যাল্, Vizianagram.

বম্বে ঃ

১। Turner টি.বি. স্যানাটোরিয়াম, Bhai Wada Hill, Parel.

২। মারাঠা হস্‌পিট্যাল।

৩। দি হিন্দু স্যানাটোরিয়াম ফর্ টিউবারকিউলোসিস্, Karla.

৪। দি "Bel-Air" স্যানাটোরিয়াম ফর্ কন্‌সাম্‌টিভ্‌স্, "Dalkeith", Panchgani.

৫। দি Hill-side স্যানাটোরিয়াম, পোঃ Vengurla, জেলা Ratnagiri.

৬। Sir William Wanless টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, পোঃ Wanlesswadi, (near Miraj).

৭। দি মহারাষ্ট্র টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, Panchvati, নাসিক।

৮। Dr. বাহাদুরজী মেমোরিয়াল স্যানাটোরিয়াম, Deolali.

৯। দি Karnatak হেল্‌থ্ ইন্‌স্টিটিউট্ T. B. স্যানাটোরিয়াম, Hukeri Road, Belgaum.

১০। Sasoon হস্‌পিট্যাল্ টি. বি. ওয়ার্ড, পুনা City.

যুক্ত প্রদেশ (U. P.) ঃ

১। কিং এড্‌ওয়ার্ড VII টিউবারকিউলোসিস্ স্যানাটোরিয়াম, Bhowali, জেলা নাইনিতাল।

২। দি Hill-Crest স্যানাটোরিয়াম, Gethia (near নাইনিতাল), কুমায়ুন হিল্‌স্।

৩। দি টিউবারকিউলোসিস্ স্যানাটোরিয়াম, আলমোড়া।

৪। শ্রী Manglaprasad টিউবারকুলোসিস্ স্যানাটোরিয়াম, সারনাথ, (near Benares).

৫। T. B. হস্‌পিট্যাল, K. G. মেডিক্যাল কলেজ, লক্ষ্ণৌ।

৬। T. B. হস্‌পিট্যাল, এলাহাবাদ।

৭। T. B. স্যানাটোরিয়াম, Karelabagh, এলাহাবাদ।

৮। Pant's Home ফর্ কন্‌সাম্‌টিভ্‌স্, আলমোড়া।

রোগটা যখন 'টি. বি.'—

৯। পাইন্ হিল্ স্যানাটোরিয়াম, আলমোড়া।

পাঞ্জাব ঃ

১। কিং এডওয়ার্ড VII টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, পোঃ ধরমপোর, সিমলা হিল্স্।

২। Lady Irwin টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, পোঃ Jubar, Sanawar, কসৌলি হিল্স্।

৩। জুবিলী (মহম্মদ হোসেন) স্যানাটোরিয়াম, Samli.

৪। শ্রীমতী Gulabdevi টিউবারকুলোসিস্ হস্পিট্যাল, Model Town, লাহোর।

৫। Krishan Bhagawan স্যানাটোরিয়াম, মূলতান।

৬। McGuire টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, ধরমশালা।

৭। মেমোরিয়াল মিশন হস্পিট্যাল্, লুধিয়ানা।

৮। R. B. অমরনাথ টি. বি. ইন্স্টিটিউট্ এবং টি. বি. ওয়ার্ড, Mayo হস্পিট্যাল, লাহোর।

৯। K. G. Jubilee মেমোরিয়াল টি.বি. হস্পিট্যাল, রাওয়ালপিণ্ডি।

১০। রাজা (রানা ?) দুর্গা সিং টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, পোঃ ধরমপুর, রেলওয়ে স্টেশন, সিমলা হিল্স্ (অথবা Maudo Hills, near কসৌলি ??)।

১১। Gujjar-Mal Kesra Devi টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, অমৃতসর।

১২। Dr. Dharambir's টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, গোলাপবাগ, লাহোর।

১৩। Dr. Burman's টিউবারকুলোসিস্ স্যানাটোরিয়াম, (Jabli R. S.), পোঃ Dharampore, সিমলা হিল্স্।

১৪। Hardinge টি. বি. হস্‌পিট্যাল, পোঃ ধরমপোর, সিম্‌লা হিল্‌স্‌ (পাতিয়াল স্‌টেট্‌)।

মধ্য প্রদেশ (C. P.) ঃ

১। টিউবারকুলোসিস স্যানাটোরিয়াম, Pendra Road, জেলা বিলাসপুর।

বিহার ঃ

১। টিউবারকুলোসিস্‌ স্যানাটোরিয়াম, Itki, জেলা রাঁচি।

২। Dr. Gnanmuthu's স্যানাটোরিয়াম, "চারু-কোঠি," Morabadi Hills, রাঁচি।

৩। টি. বি. ওয়ার্ড, মেডিকেল কলেজ, পাটনা।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ঃ

১। টিউবারকুলোসিস্‌ স্যানাটোরিয়াম, Dadar.

২। Lady Reading হস্‌পিট্যাল্‌, পেশাওয়ার।

সিন্ধু ঃ

১। Parpati Awatsing টি-বি স্যানাটোরিয়াম, Jherrach, জেলা করাচি।

দিল্লী ঃ

১। Silver Jubilee টিউবারকিউলোসিস হস্‌পিট্যাল, Kingsway.

রাজপুতানা ঃ

১। Mary Wilson স্যানাটোরিয়াম, Tilaunia, (ভায়া Kishangarh), (near আজমীর)।

জম্মু এবং কাশ্মীর স্‌টেট্‌ ঃ

১। টিউবারকুলোসিস্‌ স্যানাটোরিয়াম, Tangmarg.

২। টি. বি. হাসপাতাল, শ্রীনগর।

৩। টি. বি. হাসপাতাল, জম্মু।

মাইসোর স্টেট্ ঃ

১। প্রিন্সেস্ Krishnarajammanni টি. বি. স্যানাটোরিয়াম।

২। Zenana Mission টিউবারকুলোসিস্ হস্পিট্যাল, বাঙ্গালোর।

পর্তুগীজ্ ভারত ঃ

১। Hospicio Sanatorio de S. Jose, Margao, Salsette, গোয়া।

কোলাপুর স্টেট্ ঃ

১। টিউবারকুলোসিস্ স্যানাটোরিয়াম, জয়সিংপুর।

ইন্দোর স্টেট্ ঃ

১। Shri Sawai Tukojirao স্যানাটোরিয়াম for টিউবারকুলোসিস্, Rao.

বিকানীর স্টেট ঃ

১। টিউবারকুলোসিস্ হস্পিট্যাল, বিকানীর।

বেলুচিস্থান ঃ

১। টিউবারকুলোসিস্ স্যানাটোরিয়াম, Quetta.

কসৌলির Pasteur Instituteকে একটি যক্ষ্মানিবাসে (চিকিৎসকদের শিক্ষাকেন্দ্রের আকারে) পরিণত করবার কথা হয়েছে। সিমলা পাহাড়ে "রানা দুর্গা সিং স্যানাটোরিয়াম" বলে একটি স্যানাটোরিয়ামের উল্লেখ করা হয়েছে। ধরমপুর কিং এড্ওয়ার্ড স্যানাটোরিয়ামের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ Dr. Nanavati ধরমপুরের কাছে নিজে একটা স্যানাটোরিয়াম খুলেছিলেন। সেটার ঠিকানা ছিল—"Dr. Nanavati's স্যানাটোরিয়াম, পোঃ ধরমপুর, সিমলা হিল্স্।" ডাঃ নানাভাতির স্যানাটোরিয়ামটাই "রানা দুর্গা সিং"

স্যানাটোরিয়াম কিনা, এই বিষয়ে আমার একটু খট্‌কা আছে। ধরমপুর কিং এড্‌ওয়ার্ড স্যানাটোরিয়াম থেকে এক মাইল দূরে "Arcadia" বলে একটি স্থানে কতকগুলি টি. বি. রোগীর থাকবার ব্যবস্থা আছে। এই সব রোগীরা তাঁদের চিকিৎসার জন্যে কিং এড্‌ওয়ার্ড স্যানাটোরিয়াম বা হার্ডিঞ্জ্‌ হস্‌পিট্যালের চিকিৎসকদের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করে থাকেন। এতদ্ভিন্ন হায়দ্রাবাদে রাজধানী থেকে আশি মাইল দূরে একটি বড় স্যানাটোরিয়াম তৈরি করবার জন্যে নিজাম উদ্যোগী হয়েছেন। কানপুরে একটি T. B. স্যানাটোরিয়ামের উল্লেখ কোথাও পেয়েছিলাম। কাথিয়াওয়াড়—গুজরাটের জামনগরে একটা নতুন স্যানাটোরিয়াম হয়েছে বোধ হয়। সিন্ধু প্রদেশে করাচি থেকে ১১ মাইল দূরে "মহারাজ দীপচাঁদ ওঝা টি. বি. স্যানাটোরিয়াম" বলে একটি যক্ষ্মানিবাস শীঘ্রই স্থাপিত হবার কথা। কাপূরথালায় কিছুদিন আগে "লেডী লিন্‌লিথ্‌গো টি. বি. হাসপাতাল"-এর ভিত্তি-স্থাপন হয়েছে। সম্প্রতি বরোদা স্টেটেও একটি টি-বি হাসপাতালের ভিত্তি-স্থাপন হল। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন রাঁচি সহরের ৮।১০ মাইল দূরে একটি টি-বি স্যানাটোরিয়াম স্থাপিত করছেন। যুক্ত-প্রদেশের সুলতানপুরে যক্ষ্মাগ্রস্ত কয়েদীদের চিকিৎসার জন্য একটি টিউবারকুলোসিস্‌ জেল আছে। এই ধরনের হাসপাতাল মাদ্রাজের Bellary নামক স্থানেও একটি আছে বলে শুনেছিলাম। মাদ্রাজ, বম্বে, বঙ্গদেশ, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, বিহার, আসাম, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, দিল্লী, আলওয়ার স্টেট্—প্রভৃতিতে যক্ষ্মাগ্রস্ত কয়েদীদের জন্যে কারাগারে রক্ষিত কতকগুলি বিছানা আছে। জয়পুর স্টেটে "King George V. T. B. Solarium" বলে যক্ষ্মাগ্রস্তদের একটি "Solarium" (সৌর-নিবাস) আছে। C. I. অর্থাৎ মধ্যভারতের "Dewas State Senior"-এ Sir James R. Roberts টি. বি. রোগীদের চিকিৎসা করেন ফুস্‌ফুসের

আক্রান্ত স্থানে কার্বলিক অ্যাসিড্, গ্লিসিরিন, নোভোকেইন্ ইত্যাদির এক সংমিশ্রণ ইঞ্জেক্‌শান্ দ্বারা। যে কোন অস্ত্রোপচার দ্বারা ফুস্‌ফুসের পতন ঘটিয়ে টি-বির চিকিৎসায় তিনি বিশ্বাস করেন না। ৬০।৬৫ বছর আগে Mosler বলে এক ব্যক্তি কার্বলিক বুকের ভিতর ইঞ্জেক্‌শান্ করে ফুস্‌ফুসের ক্ষত সারাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু জানা যায় যে তাঁর এ চেষ্টা সফল হয় নাই। James Robert-এর এই ইঞ্জেক্‌শান্ সম্বন্ধেও অনেক চিকিৎসক খুব আশান্বিত নন বলে জানি। কবিরাজী মতে পরিচালিত দুইটি টি. বি. হাসপাতালের কথা জানি, তার ঠিকানা:

১। দি যামিনীভূষণ টি-বি হাসপাতাল, পাতিপুকুর, পোঃ দম-দম, জেলা চব্বিশ-পরগনা।

২। দি মারোয়াড়ী টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, পোঃ Garkhal, Kasauli Hills, পাঞ্জাব।

খুব সম্ভবতঃ করাচিতেও একটি আয়ুর্বেদ-যক্ষ্মানিবাস স্থাপিত হয়েছে।

যেগুলির উল্লেখ করা গেল এসব ছাড়াও অন্যান্য মেডিকেল কলেজ বা স্কুল-হাসপাতালগুলিতে, এবং কতকগুলি জেনারেল বা সদর হাসপাতালে কতকগুলি "বেড্" যক্ষ্মারোগীদের জন্যে আছে।

কিন্তু একটি বিষয়ের উল্লেখ বিশেষভাবে এখানে করবার প্রয়োজন। এটা যেন প্রত্যেকে খুব ভাল করে মনে রাখেন যে, যদিও আমি অনেকগুলি স্যানাটোরিয়াম, হাসপাতাল, বা টি. বি. ওয়ার্ডেরই খবর দিলাম, কিন্তু এগুলির ভিতর অতি অল্প কয়েকটি স্যানাটোরিয়াম বাদে অপরগুলি নামে যক্ষ্মাচিকিৎসাগার বটে, কিন্তু কার্যতঃ প্রায় কিছুই নয়। বিশেষ দু'চারিটি বাদে অধিকাংশ সাধারণ হাসপাতালের টি. বি. ওয়ার্ডে চিকিৎসার ব্যবস্থা অতীব হাস্যকর বলেই জানি। স্যানাটোরিয়ামও যা আছে তারও অনেকগুলিতেই সর্বপ্রকার আধুনিক চিকিৎসার কিছুমাত্র প্রচলনই হয়নি। অস্ত্র-

চিকিৎসাদি তো খুব অল্প কয়েকটি স্থানেই করা হয়। আধুনিক চিকিৎসার যতটা উন্নতি হয়েছে তা দ্বারা বহু খারাপ রোগীরও প্রাণ রক্ষা সম্ভব হচ্ছে, কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ স্যানাটোরিয়াম, হাসপাতাল এদিক দিয়ে বহু পিছনেই পড়ে রয়েছে। কাজেই রোগীদেরও চিকিৎসা হয়না ভাল-ভাবে, কারুর কারুর যদি বা কিছু উন্নতি হয় তাও স্থায়ী হয়না। কতকগুলি স্বাস্থ্যনিবাসে এখনো এক্স্‌রে-টেক্স্‌রের ব্যবস্থা কিছুই নাই, কতকগুলির বোধ হয় কেবল দালান মাত্রই সার। T. B. বেশই একটা সেরে যাবার মতন রোগ হলেও এটা ভুললে চলবে না যে উপযুক্ত চিকিৎসা হলেই শুধু তা সারতে পারে—নতুবা নয়। কিন্তু চিকিৎসার ব্যবস্থার ভিতরেই যদি থেকে যায় প্রচুর ত্রুটি, তা হলে টি-বি রোগীর সুস্থতা কেমন করে আশা করা যায়? যাই হোক, সব সময়ে আমরা এই ইচ্ছাই করব, যাতে নাকি আমাদের দেশের সমস্ত যক্ষ্মা-হাসপাতাল বা স্যানাটোরিয়ামগুলির দ্রুত উন্নতি হয়, সেগুলিতে আধুনিক চিকিৎসা-প্রণালীর সর্ববিধ সুবন্দোবস্ত থাকে,এবং সেগুলির আভ্যন্ত-রীণ ব্যবস্থাও রোগীদের পক্ষে যাতে সব রকমে সন্তোষজনক হয়। ব্যাপক এবং সুসম্বদ্ধভাবে আমাদের দেশে যক্ষ্মানিবারণী আন্দোলন সবে মাত্র সুরু হয়েছে,কাজেই আমাদের ত্রুটিগুলি নিয়েই আমরা হতাশ হব না, সত্যিকারের কাজের ভিতর দিয়ে আগ্রহের সঙ্গে চলব শুধু আমরা এগিয়ে। এই ব্যাধির চিকিৎসা সম্বন্ধে ক্রমেই হবে অধিকতর জ্ঞানের বিস্তার, সুযোগ্য কর্মীদের তত্ত্বাবধানে আমাদের দেশের সমস্ত যক্ষ্মাপ্রতিষ্ঠানগুলি এমন ভাবে ক্রমেই গড়ে উঠবে যাতে করে আমাদের আর কোন অভিযোগ করবার থাকবে না অবকাশ এবং পীড়িতদের সুস্থতাবিধানের প্রয়াস সব দিকে দৃঢ়তর হবে, এই সব আশাই উৎসাহের সঙ্গে আমরা অন্তরে পোষণ করব।

স্যানাটোরিয়ামে রোগীদের বিশ্রাম এবং ব্যায়াম কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে তা এখানে বলছি।

রোগটা যখন 'টি. বি'.—

শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী রোগীদিগকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয় এবং এক এক দলকে এক এক রঙের চিহ্ন বা "ব্যাজ্" দেওয়া হয়। যে "ব্যাজে"র যে রকম অর্থ তা হচ্ছে এই :

বেগুনী রঙের ব্যাজ্ : রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করতে হবে; কোন কারণেই সে বিছানা থেকে উঠতে পারবে না।

হল্‌দে ব্যাজ্ : রোগী সব সময়ে বিছানাতেই থাকবে, কেবল প্রসাধন ইত্যাদির সময়ে এবং খাওয়ার সময়ে উঠতে পারবে।

পাতলা নীল ব্যাজ্ : বেশির ভাগ সময় রোগী বিছানাতেই কাটাবে। হলদে ব্যাজের রোগীরা যে সুবিধাটুকু পায় এসব সে পাবে, তা ছাড়া টাইম্-টেব্‌ল-এর নির্দিষ্ট সময়ে সে ওয়ার্ডের ভিতর পায়চারি করে বেড়াতে পারবে।

সবুজ ব্যাজ্ : টাইম্-টেব্‌লের নির্দেশ অনুযায়ী ২ ফার্লং অবধি রোগী বাইরে বেড়াতে পারবে। শ্রম-হীন ক্রীড়াদির সময় রোগী ওয়ার্ড ত্যাগ করতে পারবে না।

গাঢ় নীল ব্যাজ্ :—নির্ধারিত সময়ে রোগী বাইরে বেড়াতে পারবে, ২ ফার্লং এর উপর কিন্তু এক মাইলের নীচে।

লাল ব্যাজ্ : এক মাইল বা তার উর্ধ্বে রোগী বাইরে বেড়াতে পারবে।

টাইম-টেবল্‌গুলি হচ্ছে এই :

১

(বেগুনী, হলদে এবং ফিকে-নীল ব্যাজযুক্ত রোগীদের জন্যে)

সকাল ৬টা—টেম্পারেচার গ্রহণ (তবে আরও আগে জাগলে পরে ঠিক জাগবার সময়ে নিতে হবে)।

৬.১৫—মুখ ধোয়া ইত্যাদি প্রাতঃকৃত্য।

৭—সকাল বেলাকার খাবার।

৮—৯—"পাতলা-নীলে"র বেড়ান।

৯—টেম্পারেচার গ্রহণ।

১১—মধ্যাহ্ন ভোজন।

১১. ৩০—১২—"পাতলা-নীলে"র পায়চারি।

১২—টেম্পারেচার গ্রহণ।

১২—৩—সম্পূর্ণ বিশ্রাম। কথা বলাও নিষেধ।

৩—টেম্পারেচার গ্রহণ।

৪—বিকেলের খাবার।

৫—৬.২৫—"পাতলা-নীলে"র পায়চারি।

৬.২৫—টেম্পারেচার গ্রহণ।

৬.৩০—৭.৩০—বিশ্রাম।

৭. ৩০—নৈশ ভোজন।

৮. ৪৫—টেম্পারেচার গ্রহণ (ডাক্তার যদি বলেন)

রাত্রি ৯—শয়ন।

২

(সবুজ, গাঢ়নীল এবং এবং লাল ব্যাজযুক্ত রোগীদের জন্যে)

সকাল ৬টা—টেম্পারেচার গ্রহণ (আরও আগে জাগলে পরে জাগবার সময়ে)।

৬. ১৫—মুখ-হাত ধোয়া ইত্যাদি প্রাতঃকৃত্য।

৭—সকাল বেলাকার খাবার।

রোগটা যখন 'টি. বি'.—

৮.—৯—সবুজ ৮—৯.৩০—গাঢ়নীল ৮—১০—লাল	বেড়ান বা অন্য ব্যায়াম—যার যে রকম ব্যবস্থা থাকবে। বেড়িয়ে এসেই টেম্পারেচার নিতে হবে।
৯—১১—সবুজ ৯.৩০—১১—গাঢ়নীল ১০—১১—লাল	শয্যায় বিশ্রাম।

১১—মধ্যাহ্ন-ভোজন।

১১. ৩০—১—একটু আমোদ-প্রমোদ—অথচ পরিশ্রম না হয়।

১—৩—সম্পূর্ণ বিশ্রাম। লেখা, পড়া নিষেধ।

৩—টেম্পারেচার গ্রহণ।

৩. ১৫—৪—আমোদ-প্রমোদ—শ্রমহীন।

৪—বিকালের খাবার।

৪. ৪৫—৬. ২৫—লালের বেড়ান।

৪. ৪৫—৫. ১৫—গাঢ় নীলের বিশ্রাম; ৫. ১৫—৬. ২৫—বেড়ান।

৪. ৪৫—৫. ৪৫—সবুজের বিশ্রাম; ৫. ৪৫—৬. ২৫—বেড়ান।

৬. ২৫—টেম্পারেচার গ্রহণ।

৬. ৩০—৭. ৩০—বিশ্রাম; নীরবতা।

৭. ৩০—নৈশ ভোজন।

৮. ১৫—৮.৪৫—শ্রমবিহীন আমোদ-প্রমোদ।

৮. ৪৫—টেম্পারেচার গ্রহণ—ডাক্তারের ব্যবস্থা থাকলে।

রাত্রি ৯—শয়ন।

সব স্যানাটোরিয়ামেরই "ব্যাজ" বা "টাইম্-টেবল্" একেবারে একই প্রকারের নয়। ভিন্ন ভিন্ন স্যানাটোরিয়ামে একটু আধটু এদিক-ওদিক অদল-বদল এগুলির ভিতর থাকে, তবে আদত নিয়মগুলি সর্বত্রই প্রায় এক ধরনের।

স্যানাটোরিয়ামে রোগীদের সাধারণত: তিন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম স্টেজের রোগী বলা হয় তাদের, যাদের রোগ অল্প দূর এগিয়েছে। তাদের বলা হয় দ্বিতীয় স্টেজের—যাদের রোগ এগিয়েছে একটু বেশি দূর। আর, যাদের রোগ একেবারে অনেকখানি এগিয়ে গেছে, তাদের ফেলা হয় তৃতীয় স্টেজে। প্রত্যেক স্যানাটোরিয়ামেই, যাদের অসুখ অপেক্ষাকৃত কম—তাদের ভিতরেই চিকিৎসার ফলাফল সব চেয়ে বেশি সন্তোষজনক হয়েছে। অধিকাংশ রোগীই বুকের অতি খারাপ অবস্থা নিয়ে অবশেষে যান স্যানাটোরিয়ামে—যখন নাকি তাঁদের সুস্থ করে তোলা চিকিৎসকের অনেক সময়ে প্রায় সাধ্যাতীত হয়ে পড়ে। কাজেই অসুখ অল্প থাকতে থাকতেই স্যানাটোরিয়ামে যাবার প্রয়োজনীয়তা সকলেরই বিশেষরূপে উপলব্ধি করা উচিত। রোগীর পক্ষে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করবার প্রচেষ্টার অভাবের মূলে আমরা এই সব ব্যাপারগুলি দেখতে পাই : (১) যখন বাইরে কোন লক্ষণ প্রকাশ পায়না অথবা লক্ষণগুলি যদি তাকে একেবারে শয্যাশায়ী করে ফেলবার মত প্রবল না হয়, তবে তার পক্ষে বোঝাই দুষ্কর হতে পারে যে তার এমন একটি অসুস্থতা ঘটেছে। সে হয়ত এই সময় কোন যোগ্য চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করবারও প্রয়োজন বোধ করেনা। (আপাত-দৃষ্টিতে সুস্থ এমন বহুলোক অনেক সময় যক্ষ্মারোগের বাহন এবং সংক্রমণ-বিস্তারকারী হয়ে থাকে বলে বর্তমানে যক্ষ্মা-নিবারণী আন্দোলনের কর্মিগণ এই মত প্রকাশ করছেন যে কলেজ, আপিস, ফ্যাক্টরি—ইত্যাদিতে প্রবেশ করবার আগে রোগের লক্ষণ কারুর না থাকলেও প্রত্যেককে যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করান উচিত। তাঁরা এই মত প্রকাশ করছেন যে যারা একেবারে অসুস্থ তাদের নিয়ে থাকলেই চলবেনা, কোন পরিবারে একটি যক্ষ্মাগ্রস্ত দেখা দিলে সেই পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যই পরীক্ষা করতে হবে, এবং যাদের কেবল টিউবারকিউলিন টেস্ট্

পজিটিভ্ অথবা যারা কোন না কোন প্রকারে সক্রিয় ব্যাধিযুক্ত যে কোন যক্ষ্মারোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছে তাদের বুক মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করে—দরকার হলে X-ray তুলে—তাদের সদুপদেশ দিতে হবে। কোনরকম লক্ষণের প্রকাশ না করে অনেক সময়ে এই ব্যাধির পক্ষে যথেষ্ট দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব বলে যক্ষ্মানিবারণী সমিতির কর্তৃপক্ষগণ তাঁদের কাছে কবে রোগী আসবে এই অপেক্ষায় না থেকে রোগীকে সমাজ থেকে তাঁদের নিজেদের খুঁজে বের করা কর্তব্য বলে বিবেচনা করছেন, এবং এ বিষয়ে প্রত্যেক 'সুস্থ' লোকের সহযোগিতা তাঁরা চাইছেন)। (২) আরেক ধরনের রোগী আছে, অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে সতর্কতাসূচক বাণী শুনেও তারা প্রবলভাবে তাদের ব্যাধিকে অস্বীকার করে। তারা ভুলে যায় যে তাদের মতন অসংখ্য সুস্থ ব্যক্তিই এই ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের সাবধান করতে গেলে তারা ওঠে রুখে। আপন অজ্ঞতা নিয়ে তারা থাকে তুষ্ট এবং বাড়ীর অন্য সবার বা প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্যের মূল্যও তাদের কাছে কিছুই নাই! (৩) অনেক সময় রোগীর 'বিজ্ঞ' বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনই রোগীকে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে বারণ করেন এবং এই মন্তব্য করে থাকেন—এই সব চিকিৎসকেরা লম্বা 'বুজরুগ' ছাড়া আর কিছুই নয়। (৪) রোগী যখন নিজের অসুস্থতার বিষয় ভালরকম বুঝতে পারেও, আর্থিক দুরবস্থার জন্যও সে হয়ত নিজের সুব্যবস্থা করে উঠতে পারে না। তারপরে তার আরো ভয় আছে—অসুখের কথা প্রকাশ পেলে চাকুরিটি হয়ত তার যাবে; বাড়ীওয়ালা হয়ত দূর করে তাড়িয়ে দেবে; তার সন্তানটির বিবাহ-ব্যাপারে হয়ত বহু বিপর্যয় ঘটবে; নানাভাবে নানালোকের কাছে হয়ত তাকে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হতে হবে। সমাজ-চ্যুত হবার এবং স্বাধীনতা হারাবার ভয়ে করুণভাবে সে চেষ্টা করে নিজের ব্যাধিকে লুকোতে, ভীত হয়ে ওঠে পাছে বহু কষ্টে গড়ে-তোলা ছোট্ট সংসারটি তার

ভেঙে যায়! (৫) আবার আরেক ধরনের রোগী বা তার আত্মীয়-স্বজন আছে, তারা এই রকম বলে :—"আরে মশায়, অমুক রক্ত-ওঠা নিয়েই কত কাজ করে বেঁচে গেল আশি বচ্ছর! ও সব কিছু না—ভয় করলেই চেপে ধরে, ভয় না করলেই সব উড়ে যায়।"...এরা ব্যাধিকে মেনেও মানেনা, হাস্যকর কতকগুলি মতামত প্রকাশ করে এরা সাজে এক ধরনের অজ্ঞ বীরপুরুষ—যদিও সংশয়ের হাত থেকে সব সময়ে এরা নিস্তার পায় না। (৬) কেউ বা আগে থেকেই এই ব্যাধি চিকিৎসার অসাধ্য ভেবে সহজে কোন চেষ্টা করতে চায়না। বা মরিয়া হয়ে উঠে নিজের অযত্ন করে। (৭) রোগ অল্প থাকবার অবস্থায়ও স্যানাটোরিয়ামে যাবার চেষ্টা করলেই যে রোগী সেখানে একটা জায়গা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে তা না-ও হতে পারে। আমাদের দেশে রোগীর তুলনায় যে সামান্য ক'টি বিছানা (bed) স্যানাটোরিয়াম-গুলিতে আছে, তার একটি জোগাড় করতে অনেক সময়েই কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাসও (অবস্থা বিশেষে বছর খানেক বা তারও বেশি) কেটে যেতে পারে। আর, রোগীদের অনেক দিন ধরে রাখতে হয় বলেও বেড তাড়াতাড়ি খালি হতে চায় না। এই সময়টা রোগীর অসুখ হয়ত চিকিৎসার অভাবে ক্রমাগতই বেড়ে চলে, কখনো বা তার মৃত্যুও হয়—সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর আরো অনেককে সংক্রামিত করে।

এবারে আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষে টিউবারকুলোসিস্ ব্যাধিটি কি রকম সমস্যার আকারে দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

অত্যন্ত বেদনার সঙ্গেই ভারতের অন্ধকারময় চিত্রটির আবরণ আমাকে উন্মোচন করতে হল। এই ব্যাধিটি এতদ্দেশে যে রকম দ্রুত-পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে তাতে সমস্ত দেশটি এই ব্যাধির একটি "ডিপোতে" পরিণত হয়েছে—বলা যেতে পারে। প্রত্যেক প্রদেশে প্রতি বছরে এই ব্যাধি যে পরিমাণ লোকের জীবন হানি করে চলেছে, তার খবর নিলে দম আটকে

আসতে চাইবে। প্রত্যেক ব্যাধিগ্রস্তের সংবাদ কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি বা অন্য কোন স্বাস্থ্যসমিতিতে দিতে হবে—এমন কোন বাধ্যতামূলক আইন আমাদের দেশে নাই, কাজেই স্বাস্থ্য-কর্তৃপক্ষের পক্ষে এই ব্যাধিতে ঠিক কতজন ভুগছে এবং কতজন মরছে এ বিষয়ে যথাযথ খবর রাখা বা হিসাব-তালিকা তৈরি করা অনেক সময়েই অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রকৃত সমাজ এবং স্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তি জেনে হয়ত শিউরে উঠবেন যে যত লোকের সংবাদ পাওয়া যায় তার চেয়ে ঢের বেশি সংখ্যক লোক এই কুটিল ব্যাধিতে এই দেশে শোচনীয় ভাবে ভুগছে। এই রোগীদের সম্বন্ধে যে সব সংখ্যা এক এক স্থানের স্বাস্থ্য-কর্তৃপক্ষ এক এক সময়ে প্রকাশ করেন, তা কোনপ্রকারেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য নয়। আমরা বেশ ভালরকমই জানি যে এই ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হলে এদেশে খুব কম লোকই তা সহজে স্বীকার করতে চায়, এবং প্রকৃতপক্ষে অল্প সংখ্যক রোগীর সংবাদই স্বাস্থ্য-কর্তৃপক্ষের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। কাজেই যে সব বিবরণী তৈরি হয় তাও ভ্রান্তিপূর্ণ। পরিবারে কারুর যক্ষ্মা-ব্যাধি হয়েছে এটা গোপন রাখবার জন্যে বহু যক্ষ্মাজনিত মৃত্যুকে শ্বাসপ্রশ্বাস-ঘটিত অন্য কোন ব্যাধিতে মৃত্যু হয়েছে বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা বলছেন যে, ভারতবর্ষে এই ব্যাধির প্রসার যে কতখানি, সেটা সঠিক ভাবে বোঝাই যায় না। বাংলাদেশে মিউনিসিপ্যালিটির অধীন স্থানগুলিতে যদিও টি. বি "notifiable disease" (জ্ঞাপন-যোগ্য ব্যাধি) বলে কিছুকাল হল আইনতঃ পরিগণিত হয়েছে, কিন্তু খুব কম সংখ্যক চিকিৎসক বা স্বাস্থ্য-বিভাগের লোকেরাই ঠিকমতন এই ব্যাধিগ্রস্তগণের সকলের সংবাদ যথাস্থানে জানিয়ে থাকেন। আর পল্লী-অঞ্চল তো এই আইনের এলাকারই বাইরে এখনো! তারপরে, মফঃস্বলে বহু চিকিৎসক সঠিক ভাবে রোগ নির্ণয় করতে পারেনও না। এই ভাবেও আরো অনেক রোগীর খবরই বাদ যায়। অনেক স্থানে টি. বি. রোগীদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র

কোন রেকর্ড'ও রাখা হয় না। এবং ভারতবর্ষের বহু মিউনিসিপ্যালিটি বা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডেই এখনও টি. বি. 'notifiable' (জ্ঞাপন-যোগ্য) ব্যাধি বলেও পরিগণিত হয় না। যে সব স্থানে বা এটা 'notifiable', সেখানেও যে সংখ্যা উপস্থাপিত করা হয় সেগুলিকে বিশ্বাস করা যায় না। ভারতবর্ষে মৃত্যু সম্বন্ধে রিপোর্ট যা তৈরি হয় তা প্রায় সব সময়েই বাড়ীর কর্তার, বা ঝি-চাকরের (গ্রামে হলে বড়জোর অশিক্ষিত চৌকিদারের) প্রদত্ত সংবাদের উপর নির্ভর করে। এসব লোক যা বলে দেয়, তাই টুকে নিয়ে মৃত্যুর রেকর্ড প্রস্তুত করা হয়। বিশেষ কোন একটা প্রবল লক্ষণ দেখে অসুখটাকে আন্দাজী যা হয় একটা কিছু ধরে নেওয়া হয় এবং মৃত্যুর কারণও ধরে নেওয়া হয় তাকেই। কাসি যদি খুব বেশি থাকে—তবে সেটাকে রেকর্ড করা হয় নিউমোনিয়া অথবা ব্রঙ্কাইটিস বলে। যদি গায়ের তাপ খুব বেশি থাকে তবে সেটা গেল 'জ্বরের' মধ্যে—'ম্যালোয়ারি' বলেই হয়ত সেটাকে চালিয়ে নেওয়া হল। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন যে 'জ্বর' বলে যেগুলি চলে, তার শতকরা দশটিই এবং "বুকের দোষ" বলে অন্য নামে যেগুলি চলে তার শতকরা পঁচিশটিই যক্ষ্মা। এবং এরই পরিণাম হচ্ছে যে ঠিক খাঁটি অঙ্ক কোথাও মেলেনা, এবং কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যে সংবাদ প্রচার করা হয় তাতে আসল অবস্থাকে অনেকখানি কমিয়েই বলা থাকে।

ভারতবর্ষে এই ব্যাধিটি ঠিক কোন্ অবস্থায় এখন আছে সেটা বলা বড় শক্ত। বহু-ব্যাপক আকারে এই ব্যাধির চরম সীমায় ওঠার অবস্থাটাকে অধিকাংশ পাশ্চাত্য দেশগুলি অতিক্রম করে এসেছে বলে অনেকে বলছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে এই ব্যাধিটি চরম সীমায় এখনো মোটে নাকি ওঠেই নাই, উঠবার সবে নাকি হয়েছে সুরু। ইংল্যাণ্ডে এই ব্যাধির প্রকোপ চরমে উঠেছিল ১৮৩০ সালে। ভারতবাসীর দেহে যক্ষ্মা-সংক্রমণের অবস্থাটা, আফ্রিকাবাসীর দেহে যত অল্প পরিমাণ সংক্রমণ ঘটেছে এবং বিপুল শিল্প-

বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলিতে ও মহানগরীর বুকে অবিরত অবস্থানকারী ইয়োরোপ-বাসীদের দেহে যত অধিক পরিমাণ সংক্রমণ ঘটেছে, এই দুয়ের মাঝামাঝি বলে অনেকে বলছেন। এই মত কতটা ঠিক বা বেঠিক তা নিয়ে তর্ক না করে একথা অনায়াসে বলতে পারা যায় যে একটি ভয়াবহ সমস্যার আকারেই এই ব্যাধি বর্তমানে এদেশে আবির্ভূত হয়েছে। এবং শুধু সামান্য একটু আভাস এখানে যা দেব, তা থেকেই সকলে বিষয়টি কতকটা অন্ততঃ ধারণা করতে পারবেন।

বাংলার যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতির গণনা অনুসারে সমস্ত বাংলা দেশে দশ লক্ষ লোক এই ব্যাধিতে ভুগছে এবং মৃত্যু ঘটছে প্রতি বৎসর এক লক্ষ লোকের। শুধু কলকাতা সহরেই এই ব্যাধিগ্রস্তের সংখ্যা তিরিশ হাজার, এবং বাৎসরিক মৃত্যু সংখ্যা তিন হাজার। অভিজ্ঞের মতে কলকাতায় গ্রীষ্ম-মণ্ডলসংক্রান্ত অন্য যে কোন ব্যাধির চেয়ে যক্ষ্মা দ্বারা মৃত্যুর হারই বেশি। ব্যাধির ফলে সাময়িক অথবা স্থায়ী শারীরিক অক্ষমতার দরুন কর্মহীনতার জন্যে এই ব্যাধিগ্রস্তদের দ্বারা এক কলকাতাসহরই বছরে দশলক্ষ টাকার উপর এবং সমস্ত বাংলাদেশ দুই কোটি টাকার উপর হারায়—বিশেষজ্ঞ বলছেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলা দেশে এমন পরিবার খুব কমই আছে যেখানে অন্ততঃ একটি স্বামী, একটি স্ত্রী বা একটি শিশুও এই ব্যাধিতে প্রাণ হারায় নাই!

একই রকমে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশগুলির কথাও বলা চলে। নানা বিভাগ দ্বারা, নানা বিশেষজ্ঞ দ্বারা, নানা সময়ে প্রকাশিত নানা রিপোর্ট থেকে যে সব সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছি তা এই: ১৯১৪ সালে যুক্ত-প্রদেশে এই রোগীর সংখ্যা যেখানে ছিল ৮, ৬৮৯, সেখানে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৩৩ সালে হয়েছে ৩৮, ৪৩০। আমেদাবাদে দৈনিক ৬ জন লোক টি. বি.তে মরে, এবং প্রতিদিনকার রোগীর সংখ্যা সহরটিতে গড়ে

২০,০০০। বম্বে সহরে রোগীর সংখ্যা ১৯,০০০এর উপর, (একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে ২৫,০০০ থেকে ৩০,০০০) এবং একটি যেখানে মরছে সেখানে অন্তত: দশটি ভুগছে। সিন্ধু প্রদেশেও যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ১৯৩৬ সালে সিমলাতে অন্যান্য ব্যাধি দ্বারা যত লোক মরেছিল তার চাইতে অনেক বেশি মরেছিল টি. বি. দ্বারা। বাঙ্গালোরে জানা রোগীর সংখ্যাই ৬,০০০। এক বছরে ১৫০,০০০ লোক মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে টি. বি.তে মরে এবং একমাত্র মাদ্রাজ সহরেই বছরে টি. বি.র দরুন মৃত্যু-সংখ্যা হচ্ছে ২,০০০ (ভিন্ন রিপোর্টে দেখা যায় মাদ্রাজে ১৯৩৪ সালের মৃত্যু সংখ্যা ২,৩০০ ; ১৯৩৫ সালে ২,৪০০ ; ১৯৩৬-এও ২,৪০০)। উত্তর উড়িষ্যাতে যেখানে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা ছিল মোটে ৫১৭, ১৯৩৬ সালে সেই সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে যায়। আসামেও যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। ১৯৩৬ সালে দিল্লীতে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা যা ছিল, ১৯৩৭ সালে তা থেকে বেড়ে গিয়েছে। মাদ্রাজে ১৯৩৬ সালে ৭৫,২৭৯ জন যক্ষ্মারোগীর আবির্ভাব হয়েছিল চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে, মরেছিল ১,০১৭ জন। বাংলা দেশে ১৯৩৬ সালে চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে আবির্ভূত হয়েছিল ৪৩,৬৬৮জন রোগী এবং কলকাতা বাদে এই সব প্রতিষ্ঠানে ১৯৩১ সালে যেখানে মরেছিল ৯,৫৭৬,—১৯৩৬ সালে সেখানে মরে ১৩,৬৬৮ (ভিন্ন রিপোর্টে : ১৯৩৪-এ ১৪,৮০০ ; ১৯৩৫-এ ১৬,৫০০ ; ১৯৩৬-এ ১৫,৩০০)। যুক্ত-প্রদেশে (এলাহাবাদ এবং লক্ষ্মৌ বাদে) ১৯৩১ সালে যক্ষ্মারোগে মৃত্যু ছিল ৪,৫৪৯, এবং ১৯৩৫ সালে ৬,১৭৭ (ভিন্ন রিপোর্টে : ১৯৩৪-এ ৪,১০০ ; ১৯৩৫-এ ৭,৩০০ ; ১৯৩৬-এ ৬,২০০)। বম্বে প্রেসিডেন্সিতে (বম্বে বাদে) ১৯৩১ সালের সংখ্যা ছিল ২১,১২০ এবং অল্প কাল পরেই ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় ২২,৮৬৫-তে (ভিন্ন রিপোর্টে : ১৯৩৪-এ ২৩,২০০ ; ১৯৩৫-এ ২৩,৩০০ ; ১৯৩৬-এ

২৪,৬০০)। নাগপুরকে বাদ দিয়ে মধ্য প্রদেশে ১৯৩১ সালের মৃত্যু সংখ্যা ৮১৬ থেকে ১৯৩৪ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৩,৯৪৮-এ; (ভিন্ন রিপোর্টে রয়েছে: ১৯৩৪ সালে ৪,১০০; ১৯৩৫-এও তাই; ১৯৩৬-এ নাকি ২,৬০০)। কলকাতায় ১৯৩১ সালে যেখানে মরে ২,৬৬২ জন, সেখানে ১৯৩৬ সালে মরে ২,৮৪৭ জন। (কিন্তু ভিন্ন রিপোর্টে দেখা যায় কলকাতায় ১৯৩৫ সালে মরে ৩,১০৩ জন, ১৯৩৬ সালে ৩,১৪০ জন এবং ১৯৩৭এ ৩,৩৬৪ জন)। এলাহাবাদে ১৯৩১ সালে টি. বি.তে মরে ৪২৯ জন, এবং ১৯৩৫ সালের সংখ্যাও ওই-ই থাকে। বম্বেতে ১৯৩১ সালে মরে ১,৫৫২,—১৯৩৫ সালে মরে ১,৯১৩। নাগপুরে এই রোগে মৃত্যু ১৯৩১-এ ৩৪,—১৯৩৪-এ ১৬২। হায়দ্রাবাদ সহরে কোন এক বছরে কেবল চিকিৎসা-কেন্দ্রগুলিতেই ৪,৩৯৫ জন রোগীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। দেশীয় রাজ্যগুলি বাদ দিয়ে ভারতবর্ষে এই ব্যাধিতে জানা মৃত্যুর সংখ্যা ১৯২৮ সালে ছিল ৬,১৮,০১১; ১৯২৯ সালে ৬,২৬, ৭৩৯; ১৯৩০ সালে ৬,৪৮, ৩৪৪; ১৯৩১ সালে ৬,৬১, ৫০৯; ১৯৩২ সালে ৫,৮০, ৫৬৬; ১৯৩৩ সালে ৬,০৯, ৬৭৮। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে এই ব্যাধিতে একটি যদি হয় মৃত্যু, সেখানে ৭।৮ জন করে ভুগছে। আবার কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেন যতগুলির মৃত্যু হয় তাদের চাইতে ৯।১০ গুণ বেশি লোক এই ব্যাধিতে ভোগে। তাহলে মোটামুটি দেখা যায় যে শুধু ব্রিটিশ-ভারতবর্ষেই প্রতি বছর পঞ্চাশ লাখের উপর থেকে ষাট লাখের উপর লোক এই ব্যাধিতে ভুগছে! কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে এগুলিও প্রকৃত খবর নয়, এর ভিতরেও বহু গলতি আছে এবং এসবও নাকি প্রকৃত অবস্থাকে অনেক চেপেই বলা হয়েছে!!

আমাদের দেশে পুরুষদের চাইতে মেয়েদের ভিতরে এই রোগের প্রসার অনেক অধিক, ৫।৬ গুণই বোধ হয় হবে। দেখা গিয়েছে—১০ থেকে ১৫

বছর বয়সে একটি বালকের জায়গায় দুটি বালিকার, ১৫ থেকে ২০ বছর বয়সে একটি যুবকের জায়গায় তিনটি তরুণীর, এবং ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সে একটি পুরুষের জায়গায় দুটি স্ত্রীলোকের হয় এই ব্যাধিতে মৃত্যু। মেয়েদের ভিতরে এই রোগের ব্যাপ্তি প্রবলতর হবার কারণ এই-ই যে তাদের অধিকতর ভাবে স্বাস্থ্যনীতি লঙ্ঘন করে চলতে হয়। বাল্যবিবাহ, স্বাস্থ্যকে পীড়ন করে পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ, অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকা, স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর এমন ধরনের রান্নাঘরে চব্বিশ ঘণ্টা আটকে থাকা, সকলের শেষে নিকৃষ্ট খাবার খাওয়া বা রোগ-গ্রস্ত স্বামী, শ্বশুর ইত্যাদির পাতে খাওয়া, ব্যাধির প্রকৃতি সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান না নিয়ে বাড়ীর রুগ্ন ব্যক্তির সেবার ভার গ্রহণ করা, নিজেদের শরীরে রোগ লুকিয়ে রাখা, শরীরের প্রতি অন্য নানারকম অবহেলা—কখনো অজ্ঞতায়, কখনো স্বেচ্ছায়, কখনো অবস্থা-বিপর্যয়ে...মেয়েদের স্বাস্থ্যভঙ্গের মূলে এগুলি সবই রয়েছে। পুরুষদের চাইতে মেয়েরা এই ব্যাধি দ্বারা বেশি আক্রান্ত নানাভাবে হতে পারে এবং উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা যথাসময়ে অথবা কোন সময়েই না হওয়াতে তাদের ভিতরে মৃত্যুর হারও বেশি। বাড়াবাড়ি না হলে পরিবারে খুব কম মেয়েরই চিকিৎসার বন্দোবস্ত আগে থেকে ভালভাবে হয়—তা যে কোন ব্যাধিতেই তারা আক্রান্ত হোক না কেন। এই ব্যাধির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নাই।

যক্ষ্মারোগকে বিতাড়িত করবার জন্যে আমেরিকা, ইয়োরোপ প্রভৃতি দেশে যে কি রকম কাজ হচ্ছে তা জেনে সকলে হয়ত চমৎকৃত হবেন। আমেরিকায় য়ুনাইটেড্ স্টেট্স্-এর জাতীয় যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতি স্থাপিত হয় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে। দেশের সমস্ত স্বাস্থ্য-সমিতিগুলির সঙ্গে এবং চিকিৎসক-সমাজের সঙ্গে যোগ রেখে পরস্পরের মধ্যে সাহায্য আদান-প্রদান, দেশের বয়স্কদের ভিতরে টি. বি. সংক্রান্ত সব রকম শিক্ষা-প্রচার, শিশুদের স্বাস্থ্যের

খবর করা এবং বিশেষভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এ সম্বন্ধে শিক্ষিত করে তোলা, টিউবারকুলোসিস্ সংক্রান্ত কাজের জন্যে "ক্রস্‌মাস্ সিল" নামক টিকিট বিক্রয়ের দ্বারা এবং অন্যান্য নানা উপায়ে অর্থসংগ্রহ, টিউবারকুলোসিস্ সংক্রান্ত নানারকম ফিল্‌ম্, পত্রিকা, বই, বিজ্ঞাপন প্রকাশ, টি. বি.র চিকিৎসা এবং এই ব্যাধির সর্বপ্রকার সমস্যা সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার গবেষণা এবং অনুসন্ধান, সমিতির কাজের জন্যে কতকগুলি উপযুক্ত কর্মী তৈরি করা, সমস্ত রকম যক্ষ্মা-প্রতিষ্ঠানগুলির নানারকম যে সব জিনিসের প্রয়োজন হয়, সেগুলি প্রস্তুত এবং সরবরাহ করা ···· এগুলিই সমিতিটির মোটামুটি উদ্দেশ্য। স্থাপিত হবার পর থেকে এই সমিতির কাজ যে কি অদ্ভুতভাবে এগিয়ে চলেছে তা কল্পনা করা যায় না, এবং তার বিস্তারিত বর্ণনা এই ছোট বইখানিতে দেওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এইভাবে কাজ চলবার ফলে আমেরিকায় ১৯০০ সালে ১০০,০০০ লোকের ভিতর যেখানে যক্ষ্মা রোগে মরত ২০২ জন, ১৯৩৫ সালে সেখানে উক্ত সংখ্যক লোকের ভিতরে মরে ৫৫ জন; এবং এক লক্ষ লোকের ভিতর নিউ-ইয়র্ক সহরে ১৯১০ সালে যেখানে মরে ২১১ জন, ১৯৩৫-এ সেখানে মরে ৬০ জন। অতি আধুনিক সংবাদ আমি দিতে পারছিনা, কিন্তু ১৯২৮ সালের পুরান সংবাদটাই সকলে লক্ষ্য করুন: সমিতির শাখার সংখ্যা ১,৪৩৪; টি. বি. সম্বন্ধীয় বুলেটিন, পত্রিকা, ইত্যাদির সংখ্যা ৪০০; টি. বি. সংক্রান্ত কাজে বিশেষ শিক্ষা-লাভের জন্যে ছাত্র সংখ্যা ৭১৭; স্যানাটোরিয়ামের সংখ্যা ৬১৮; স্যানাটোরিয়াম-বেডের সংখ্যা ৭৩,৬৯৫ (ভিন্ন রিপোর্টে ৮০,০০০-এর উপর); দুর্বল দেহ বিশিষ্ট বালক-বালিকার জন্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠান "প্রিভেন্‌টোরিয়াম"-এর সংখ্যা ৮৩ (বেড্—৫,০০১); ডিস্‌পেন্‌সারির সংখ্যা ৩,৬৭১; বিশেষ নার্সের সংখ্যা ৭,১১৫; ২,০০০,০০০ শিশুর হয়েছে স্বাস্থ্য পরীক্ষা; "ক্রস্‌মাস্ সিল্" বিক্রি করে ওই বছরে তোলা হয়েছে ৫,৪০৬,২৪১ ডলার। ১৯২৯ সালে

সমিতির সভ্যের সংখ্যা ২,৫৭১; ডিরেক্টারের সংখ্যা ৯৮; স্টাফের সংখ্যা ৫১। এতদ্ভিন্ন সহস্রাধিক মুক্ত-বায়ুতে বিদ্যালয়, সন্দেহজনক স্বাস্থ্য-বিশিষ্ট শিশু ও বালক-বালিকার জন্যে "Summer Camp" এবং আরও বহুপ্রকার ব্যবস্থা, ইত্যাদি। ১১।১২ বছরের পুরান খবরের কাছে আজকের খবর যে আরও চমকপ্রদ, তখনকার চেয়ে তাদের কাজের উন্নতি বর্তমানে যে আরও বহুগুণে বিস্ময়কর তা বলাই বাহুল্য।

ইংল্যাণ্ডের জাতীয় যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতির কাজও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় এই সমিতি এবং এই সমিতির কাজও একই ধরনের প্রায়। ১৯৩৭ সালের রিপোর্টে দেখা যায় যক্ষ্মার চিকিৎসার জন্যে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮৩১, এবং বেড্ (bed)-এর সংখ্যা ৩৭,০২৩—ইংল্যাণ্ড, ওয়েল্‌স্ এবং স্কট্‌ল্যাণ্ডে। এ ছাড়া ডিস্‌পেন্সারির সংখ্যা ৫২৭, এবং ১৯৩৬-৩৭-এ যক্ষ্মা নিবারণী কাজে ব্যয় হয়েছিল ৪,৫৫৭,০৯৪ পাউণ্ড! এই রকম সুন্দরভাবে কাজ চলবার ফলে ১৮৯৮ সালে গ্রেট ব্রিটেনে যক্ষ্মাব্যাধিতে মৃত্যুসংখ্যা যেখানে ছিল ৭০,২৭৯,—১৯৩৭ সালে সেই সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছে—বুকের যক্ষ্মায় ২৬,৭৬১তে, এবং অন্যান্য সব রকমের যক্ষ্মায় ৫,৪৩১-এ। আরো বলা যায়—ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েল্‌সে ১৮৭১ সালে এক লক্ষ লোকের ভিতর যক্ষ্মারোগে যেখানে মরে ৩৫৪ জন, এবং ঐ সালে এক লক্ষ লোকের ভিতর স্কট্‌ল্যাণ্ডে যেখানে মরে ৩৭৩ জন, সেখানে ১৯৩৭ সালে ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েল্‌সে মরে ৭০ জন, এবং স্কটল্যাণ্ডে মরে ৭৪ জন। আয়ার্ল্যাণ্ডেও ঠিক একই ভাবে মৃত্যুর হার কমে গিয়েছে। ওদেশে যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসার জন্যে যত রকম প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলি যে কেবল সংখ্যায়ই প্রচুর তাই নয়, সেগুলির পরিচালনাও এত সুন্দরভাবে হয়ে থাকে যে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি বিভাগ বহু রকম ব্যবস্থা দ্বারা সুসজ্জিত

এবং রোগীর চিকিৎসাকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করবার জন্যে কোন রকম চেষ্টারই ত্রুটি নাই। "কোন আশা নাই" এই কথা বলে একটি রোগীকেও কখনো এদেশে পরিত্যাগ করা হয় না, সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসার বন্দোবস্তই হয়ে থাকে তার। সম্পূর্ণ বিনা ব্যয়ে রোগীদের চিকিৎসার এমন সব প্রতিষ্ঠান এখানে আছে, আমাদের দেশের অধিকাংশ প্রখ্যাতনামা ও অতি-আভিজাত্যপূর্ণ স্যানাটোরিয়ামগুলি যাদের পাশে মোটে দাঁড়াতেই পারে না!

ইটালিতেও যক্ষ্মানিবারণী আন্দোলন বিপুল কৃতকার্যতার সঙ্গে সম্পন্ন হচ্ছে। যে সব ব্যাধি দ্বারা জাতি এবং সমাজ বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের ভিতরে যক্ষ্মাকে ইটালিয় গভর্নমেণ্ট দিয়েছেন সব চেয়ে উপরে স্থান, এবং এই ব্যাধি সম্বন্ধে সর্বপ্রকার তথ্যানুসন্ধান, ব্যাধিগ্রস্তগণের সম্পূর্ণ হিসাব সংগ্রহ, ডাক্তার এবং নার্সদিগকে বিশেষ শিক্ষাদান, সমস্ত স্যানাটোরিয়াম এবং ডিস্‌পেন্‌সারিগুলির তত্ত্বাবধান, এই ব্যাধিসংক্রান্ত ফিল্‌ম্‌, বিজ্ঞাপন, চার্ট—ইত্যাদি প্রস্তুত, এই ব্যাধি সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণার সুব্যবস্থা, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের পুস্তকাদি এবং মতামত সংগ্রহ, সভা-সম্মিলনী, যক্ষ্মাবিষয়ক পত্রিকাদিতে (দেশের এবং বাইরের) প্রবন্ধ প্রচার, আইন দ্বারা প্রত্যেক প্রদেশে যক্ষ্মা-সমিতি স্থাপন, যক্ষ্মা-বীমা—ইত্যাদি দ্বারা এবং আরো বহু উপায়ে যক্ষ্মাকে বিতাড়িত করবার ব্যবস্থা এদেশে হচ্ছে। যে বীমার উল্লেখ করলাম, ইটালির অর্ধেক লোক এই বীমার নিয়মে এসেছে। এই বীমা দ্বারা যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিনা খরচায় চিকিৎসিত হবার সুযোগ পায় এবং তার পরিবারবর্গ তার অসুস্থতার সময়ে নিয়মিত সাহায্য পায়। লোকটির কাছ থেকে এবং তার মনিবের কাছ থেকে সমান অংশে সামান্য চাঁদা নিয়ে এই বীমার হয় সৃষ্টি। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩—এই পাঁচ বছরে ইটালি যক্ষ্মানিবারণী কাজে খরচ করেছিল ছত্রিশ কোটি টাকা। ডিস্‌পেন্‌সারি এবং স্যানাটোরিয়াম মিলিয়ে ইটালিতে কিছুকাল আগে যক্ষ্মা-

প্রতিষ্ঠান ছিল সাত আটশোর মতন, এবং রোগীদের থাকবার বেড্ ছিল ৪০,০০০-এর উপর। যক্ষ্মারোগকে উচ্ছেদ করবার দায়িত্বকে ইটালিয় গভর্নমেণ্ট বিশেষ গুরু দায়িত্ব বলে মনে করেন। ১৯০০ সালে ইটালিতে এক লক্ষ লোকের ভিতর এই রোগে যেখানে মরত ১৮৬ জন, এই সব চেষ্টার ফলে ১৯৩৫ সালে সেখানে মরেছে মাত্র ৮৯ জন!

ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও প্রচুর কাজ হয়েছে। এবং তারই ফলে যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর হার এইভাবে কমে গিয়েছে: জার্মানিতে এক লক্ষ লোকের ভিতর ১৯০০ সালে মরে ২২৫ জন, ১৯৩৫ সালে ৭৩ জন; ফ্রান্সে ১৯১৫ সালে ২৪২ জন, ১৯৩৪ সালে ১৫১ জন; ডেনমার্কে ১৮৮৫ সালে ২০৩,—১৯৩৫-এ ৫১; নরওয়েতে ১৯১৫ সালে ২১০,—১৯৩৫-এ ১০৬; সুইডেনে ১৯১৫তে ২০৩,—১৯৩৫-এ ৯৪; সুইট্জারল্যাণ্ডেও ১৯০০ সাল থেকে যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর হার নিয়মিতভাবে কমে এসেছে। কি বিপুল উদ্যমে যে এরা এই রোগের পিছনে উঠে পড়ে লেগেছে, তা বলবার নয়। যে পরিমাণ এদের অধ্যবসায়, আন্তরিকতা এবং চেষ্টা, এরা ঠিক সেই পরিমাণে কৃতকার্যও হচ্ছে। এবং শুধু পুরুষরাই নয়, মেয়েরাও এসে দলে দলে যোগ দিচ্ছে এ কাজে। তারা দলভুক্ত হয়ে অথবা বাইরে থেকে বহু রকমে দেশের যক্ষ্মা-নিবারণী আন্দোলনে অত্যন্ত মূল্যবান সহযোগিতা করে চলেছে।

এদের যক্ষ্মাসংক্রান্ত কাজের আরেকটি দিক হচ্ছে—অপেক্ষাকৃত সুস্থ যক্ষ্মা-রোগীদের জন্য এমন কিছু ব্যবস্থা করা যাতে নাকি তারা তাদের সুস্থতাটাকে বজায় রাখতে পারে—মুক্ত এবং বিশুদ্ধ বায়ুতে বাস করে, উপযুক্ত এবং সুনিয়ন্ত্রিত কাজ করে, এবং সর্বদা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থেকে। সুদীর্ঘকাল অসুস্থতা-ভোগের পরে স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরিয়ে কখনো সমাজের অবিচারে, কখনো আপন অবস্থা-বিপর্যয়ে, কখনো প্রলোভনে

পড়ে—হয়ত প্রত্যেক রোগীরই মন উন্মুখ হয়ে ওঠে বাইরের আনন্দময়, কর্মময় জগতে একেবারে উচ্ছৃঙ্খলভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে ; কিন্তু তার চিকিৎসক বাউল সুরে গাইছেন : "নিঠুর গরজি ! তুই কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে··· ?" প্রকৃতপক্ষে তাকে সুস্থ রাখবার ও কর্মক্ষম করে তুলবার ভিতরে সকলের পক্ষেই আছে একটা নৈতিক দায়িত্ব, এবং এদিক দিয়ে নানা রকম চেষ্টা এবং উদ্যোগেরও প্রয়োজন। রোগীর এই দিককার সমস্যা সমাধানের জন্যে ওরা আগ্রহশীল হয়ে উঠেছে—কোন্ কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তা ভাবছে। সমস্ত যক্ষ্মা-প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের ভিতরে আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের ঢোকানর চেষ্টা করে, অন্যান্য নানা বিভাগের জন্যে তাদের নানা রকম শিক্ষা দিয়ে, তাদের উপযুক্ত কাজ দেবার জন্যে সে সব বিভাগের কর্তৃপক্ষের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সুস্থ থেকে জীবিকা-অর্জন করবার বিষয়ে তাদের নানারকম সহায়তা করে—এসব দেশের যক্ষ্মা-নিবারণী-আন্দোলন চিন্তাশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছে।

ইংল্যাণ্ডে কেম্ব্রিজের কাছে প্যাপ্‌ওআর্থ নামক স্থানে যক্ষ্মারোগীদের জন্যে যে অপূর্ব প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে, তার কার্যকলাপে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। রোগী এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার পরে প্রথমে তাকে উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ করে, তারপরে তাকে ক্রমান্বয়ে উপযুক্ত কটেজ বা হস্‌টেলে যোগ্য চিকিৎসকের নিয়মিত তত্ত্বাবধানে রেখে প্রতিষ্ঠানটির আপিস, ফ্যাক্টরি, এবং অন্যান্য বহু রকম শিল্পবিভাগে তাকে নানারকম শিক্ষা দিয়ে, তাকে উপযুক্ত স্থানে নিয়োগ করে অর্থোপার্জন এবং ক্রমোন্নতি দ্বারা তার নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে প্রতিপালনের সুযোগ দিয়ে, অনেক ক্ষেত্রে তাকে স্থায়ীভাবে এই উপনিবেশে রাখবার ব্যবস্থা করে এবং তাকে স্বামী বা স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি নিয়ে আনন্দময় পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন-যাপনে সহায়তা করে প্যাপ্‌ওআর্থ যে আদর্শ স্থাপন করেছে তা তুলনা-বিহীন।

যাঁরা প্যাপ্‌ওআর্থের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং যাঁরা এর কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, তাঁদের মত হচ্ছে এই যে স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসা দ্বারা রোগীকে সুস্থ করে তারপরে যদি তার সেই সুস্থতাটাকে উত্তমরূপে রক্ষা করবার সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত না করা যায় এবং তার অর্থোপার্জন-ক্ষমতাকে ফিরিয়ে এনে যথা সত্বর তাকে একটা স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে না দেওয়া যায়, তবে স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসা এবং তার পিছনে সমস্ত অর্থ-ব্যয় শুধু প্রকাণ্ড একটা ব্যর্থতাতেই পর্যবসিত হবে।

ইংল্যাণ্ডে প্যাপ্‌ওআর্থের আদর্শে আরো দুটি "After-Care Colony" স্থাপিত হয়েছে—একটি Enham এ, এবং আরেকটি Maidstone-এর নিকট Preston Hall-এ। এ ছাড়া আরেকটি আছে—"বারো হিল স্যানাটোরিয়াম কলোনি" (Frimley, Surrey)—অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক তরুণ রোগীদের জন্যে।

যক্ষ্মারোগে কেবল "জীবাণু-তত্ত্ব" আলোচনা করেই যে চলবে না, এবং রোগীর মানসিক, পারিবারিক ও সামাজিক দিকগুলিকে উপেক্ষা করে যে যক্ষ্মা-নিবারণী আন্দোলন কোনমতেই কৃতকার্য হতে পারে না, এটা প্রতিদিন অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করা যাচ্ছে। অসুস্থতার অবস্থায় রোগীকে এবং তার পরিবারবর্গকে নানাভাবে সাহায্য প্রদানের জন্যে "Care-Committee" ইত্যাদি স্থাপিত হচ্ছে। কিন্তু এত করেও এরা তৃপ্ত নয়, যক্ষ্মা-নিবারণী কাজকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে নিজেদের দোষ, ত্রুটি, অসম্পূর্ণতাগুলিকে খুঁজে খুঁজে বের করে তার প্রতিকার করবার জন্যে এদের নানা উদ্যোগ-আয়োজনের সীমা নাই।

আমাদের দেশে যক্ষ্মা-নিবারণী আন্দোলন সবে সুরু হয়েছে বলা যেতে পারে। যখন জানতে পাই ফ্রান্সে চার কোটি কুড়ি লক্ষ লোকের ভিতরে যক্ষ্মাগ্রস্তদের জন্যে রয়েছে ৭১,৬৩২টি বেড (১৯৩৪-এর খবর), ইংল্যাণ্ড

এবং ওয়েল্‌সে তিন কোটি সত্তর লক্ষ লোকের ভিতরে যক্ষ্মাগ্রস্তদের জন্যে রয়েছে প্রায় চল্লিশ হাজার বেড্, সেই জায়গায় ভারতবর্ষে ছত্রিশ কোটি লোকের ভিতরে যক্ষ্মাগ্রস্তদের জন্যে রয়েছে টেনেটুনে মাত্র হাজার চার পাঁচ বেড—তার ভিতরেও অধিকাংশের ব্যবস্থা নিতান্ত বাজে ছাড়া আর কিছু নয়; যখন জানতে পাই ডেনমার্কে যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসার জন্যে যে রকম সুবন্দোবস্ত আছে, সেই সুবন্দোবস্ত যদি ভারতবর্ষে থাকত তাহলে খুব কম করেও তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বেডের প্রয়োজন হত; যখন জানতে পাই লণ্ডনে যখন ৪৫% হারে যক্ষ্মারোগে মৃত্যু কমে এসেছে তখন কলকাতায় বেড়ে গিয়েছে ৭০% হারে; যখন অন্যান্য সভ্যদেশের কয়েকটি সহরে এবং আমাদের দেশের কয়েকটি সহরে প্রতি ১ লক্ষ লোকের মধ্যে যক্ষ্মারোগে তুলনা-মূলক মৃত্যুর হার যে কোন এক বছরে—(ধরুন ১৯৩৫এ) এই রকম দেখতে পাই: নিউইয়র্ক—৬০, লণ্ডন—৭৭, বার্লিন—৯২, রোম—১২৭, কোপেনহেগেন—৬৭, এডিনবারা—৭৩, স্টক্‌হল্‌ম—১০৫, আর, বম্বে—১৬৬, কলকাতা—২৪৪, দিল্লী—২৪৬, মাদ্রাজ—১৭৫, করাচি—১৯৮ (১৯৩৪ সালে পুনা, আমেদাবাদ এবং কানপুরের মৃত্যুর হার যথাক্রমে প্রতি ১ লক্ষ লোকে ৩২৪, ৩৮৯ এবং ৪২২);—তখন মনটা যে সত্যিই দমে যায় তাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু অক্লান্ত চেষ্টা দ্বারা অন্যান্য দেশ যে সুফললাভে সমর্থ হয়েছে আমরাও যে তা হব না তার কোনই মানে নাই। ১৯১৮ সালে রাশিয়ায় পেট্রোগ্রাডে প্রতি এক লক্ষ লোকে যক্ষ্মারোগে মরত ৮০০ জন, এবং "একটি বেড"-ও ছিল না তাদের চিকিৎসার জন্যে। অবশেষে যখন বিপুল উদ্যমে রাশিয়া লাগল এই ব্যাধির পিছনে, কি হল জানেন? ১৯৩৬ সালে যক্ষ্মা-ডিস্‌পেন্সারির সংখ্যা হল ৫০০, যে স্যানাটোরিয়ামগুলি স্থাপিত হল তাতে রোগীদের চিকিৎসার জন্যে বিছানা হল ৫১,০০০। মৃত্যুর হারও দ্রুতবেগে আসতে

লাগলো নেমে। ১৫ বছরের ভিতর ৫০% হারে তারা এই রোগে মৃত্যুসংখ্যা কমিয়ে আনল। মস্কোতে ১৯১৩ সালে এক লক্ষ লোকের ভিতর যেখানে মরেছিল ২৭৬ জন, ১৯৩৬ সালে সেখানে মরল ১৩৮ জন। আমরাও যদি আজ সমস্যাটিকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করে এর নিরাকরণের জন্যে আন্তরিক ভাবে উদ্যোগী হয়ে উঠি, তবে যক্ষ্মারোগ আমাদের দেশে কতদিন টিকে থাকতে পারবে?

ভারতের বড়লাট-পত্নী লেডী লিন্‌লিথ্‌গোর অপূর্ব প্রচেষ্টায় যে ভারতীয় যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতি স্থাপিত হয়েছে তাতে প্রায় নব্বই লক্ষ টাকার মতন এ পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে। এই সমিতির উদ্দেশ্য খুব সংক্ষেপে এই: ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে শাখা-সমিতি স্থাপন, সমস্ত বিভাগের স্বাস্থ্য-কর্তৃপক্ষ, সমাজসেবী, নিয়োগ-কর্তা, প্রতিষ্ঠান-পরিচালক ইত্যাদিকে যক্ষ্মানিবারণী কাজে উদ্বুদ্ধ করে তোলা, বক্তৃতা, ছায়া-চিত্র, পুস্তিকা, প্রদর্শনী ইত্যাদির ভিতর দিয়ে এই রোগ সম্বন্ধে সর্বসাধারণের ভিতর জ্ঞানের বিস্তার, সমাজের প্রত্যেক স্তরে যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে সঠিক তথ্য-সংগ্রহ, সমস্ত যক্ষ্মা-হাসপাতাল বা স্যানাটোরিয়ামগুলিকে নানাভাবে সাহায্য করা, যক্ষ্মা-নিবারণী কাজের জন্যে বিশেষভাবে কতকগুলি চিকিৎসক, স্বাস্থ্য-পরিদর্শক, নার্স ইত্যাদি গড়ে তোলা, বিভিন্ন স্থানে যক্ষ্মা-ডিস্‌পেন্সারি, স্যানাটোরিয়াম, "After-Care Colony", "Care-Committee"—ইত্যাদি স্থাপন, এই ব্যাধি সম্বন্ধে নানা রকম গবেষণা, যক্ষ্মা-নিবারণী কাজে অর্থসংগ্রহ—ইত্যাদি। মোটের উপর অন্যান্য দেশে যে ভাবে এই আন্দোলন কৃতকার্য হয়েছে সেই আদর্শ গ্রহণ করেই আমাদের দেশে কাজ চলবে।

বৃহত্তর ভারতীয় যক্ষ্মা-সমিতির বঙ্গদেশীয় শাখা-সমিতি হচ্ছে "দি বেংগল টিউবারকুলোসিস্‌ অ্যাসোসিয়েশন"। এই সমিতিতে স্বেচ্ছাসেবী

চিকিৎসকগণ বিনাব্যয়ে চিকিৎসা করেন। অনেক ওষুধও রোগীদের বিনা-মূল্যে দেবার ব্যবস্থা আছে এবং মাত্র ফিল্মের দাম নিয়ে রঞ্জনরশ্মি দ্বারা রোগীর বুকের আলোক-চিত্র নেওয়া হয়। এই সমিতিতে শিক্ষা-প্রাপ্ত স্বাস্থ্যপরিদর্শকেরা রোগীদের বাড়ীতে গিয়ে রোগের বিস্তার নিবারণের জন্যে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এই সমিতি স্যানাটোরিয়া (আরোগ্য-নিকেতন), হিতসাধন-কেন্দ্র, দুগ্ধ-বিতরণ সমিতি ইত্যাদি সকলের সঙ্গে সহযোগে কাজ করেন, যাতে রোগীরা সবরকম সুবিধা পায়। শিক্ষিত ডাক্তারের জন্য বক্তৃতা ইত্যাদির বিশেষ বন্দোবস্ত এই সমিতিতে আছে। এই সমিতি স্কুলের বালক-বালিকা ও বয়স্ক জনসাধারণের মধ্যে নানা উপায়ে এই রোগ নিবারণ সংক্রান্ত প্রচারকার্য করে থাকেন। এই সমিতির অধীনে বর্তমানে যে কয়েকটি ডিসপেনসারি আছে তাদের নাম ও ঠিকানা এই :

(১) চেস্ট-ডিপার্টমেন্ট, চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল, ২৪ নং গোরাচাঁদ রোড, এন্‌টালি, কলিকাতা।

(২) চেস্ট-ডিপার্টমেন্ট, হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল, হাওড়া।

(৩) চেস্ট-ডিপার্টমেন্ট, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, কলিকাতা।

(৪) চেস্ট-ডিপার্টমেন্ট, ইসলামিয়া হাসপাতাল, ১নং বলাই দত্ত স্ট্রীট্, কলিকাতা।

(৫) চেস্ট-ডিপার্টমেন্ট, স্যার গুরুদাস ইন্‌স্টিটিউট্, নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা।

(৬) চেস্ট-ডিপার্টমেন্ট, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ, বেলগাছিয়া, কলিকাতা।

(৭) টি. বি. অ্যাসোসিয়েশান, কালিম্পং।

(৮) টি. বি. অ্যাসোসিয়েশান, বজ্‌বজ্‌, ২৪ পরগনা।

(৯) Servant of Humanity সোসাইটি, ৩নং সুরাবর্দী এভিনিউ, কলিকাতা।

(১০) টি. বি. অ্যাসোসিয়েশান, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই কেন্দ্রগুলিতে সমাগত রোগীদের বুক, থুতু, রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়, বুকের এক্স-রে ফটো তোলা হয় এবং চিকিৎসার ব্যবস্থাও অল্প-বিস্তর হয়ে থাকে। কিন্তু কতকগুলি অবস্থায় এসব "আউট্-ডোরে" এ ব্যাধির চিকিৎসা কুলায় না, টানা-হ্যাঁচড়ায় বেশি-অসুস্থ রোগীর ক্ষতিও হতে পারে। শরীর খারাপ হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে যখন সংশয় এসে উপস্থিত হয়, তখন এসব স্থানে গেলে রোগ-নির্ণয় সঠিক ভাবে হবে এবং ডাক্তারের কাছে ভাল করে জিজ্ঞাসা করে তখনকার কর্তব্য মোটামুটি জেনে আসা চলবে। খানিকটা সুস্থ-হয়ে-যাওয়া রোগীও ইঞ্জেকৃশান ইত্যাদির জন্যে এসব ডিসপেন্সারির সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

এখানে একটা বিষয়ের উল্লেখের প্রয়োজন। ভারতবর্ষের যক্ষ্মানিবাস-গুলিতে বিছানার সংখ্যা এখনো এতই কম, যে, দেশের যক্ষ্মা-পীড়িতদের অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশেরই চিকিৎসা তাতে হতে পারে। এই অবস্থায়, যারা স্যানাটোরিয়ামে যাবার সুবিধা করতে পারছেনা, বাড়ীতে রেখেই ঠিক স্যানাটোরিয়ামের নিয়মে তাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত অগত্যা করতে হবে। এই বিষয়টির উপর বর্তমানে ভারতীয় যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতিও বিশেষ জোর দিচ্ছেন। ঘরে থেকে চিকিৎসাদ্বারাও অনেক রোগীর ক্ষেত্রে বিশেষ ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে যদি নাকি সমস্ত বন্দোবস্তগুলি বেশ ভালরকম হয় এবং অভিজ্ঞ, দূরদর্শী ও সৎপ্রকৃতির চিকিৎসকের সাহায্য পাওয়া যায়।

এবারে বিশেষভাবে দেশের ছাত্রসমাজকে আমার কয়েকটি কথা বলবার আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন ভাইস্-চ্যান্সেলার এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমঙ্গল-সমিতির কয়েক বছরের রিপোর্ট একথা

রোগটা যখন 'টি. বি.'—

পুনঃ পুনঃ জানিয়ে এসেছেন এই ব্যাধির বিষ ছাত্রদের ভিতরে কি ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাদের স্বাস্থ্যকে কি ভাবে বিপন্ন করে তুলেছে। তা ছাড়া ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্যানাটোরিয়ামের প্রায় প্রত্যেক বছরের বার্ষিক রিপোর্টে'ই দেখা যায় যে রোগীদের ভিতর ছাত্রদের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশি। অন্যান্য সভ্যদেশের ছাত্রেরা এবং স্কুল-কলেজের কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের ভিতর এই সমস্যার প্রতিবিধানার্থে যে কি রকম উদ্যোগী হয়ে উঠেছেন তা এক কথায় বলবার নয়। আমেরিকায় বহু কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কেবল যে নানাভাবে জাতীয় যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতির সঙ্গে সহযোগিতা করছে তাই নয়, নিজেদের তত্ত্বাবধানে তারা ভিন্ন সমিতি স্থাপন করছে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে আপনাদের ভিতরে যক্ষ্মানিবারণ-সংক্রান্ত প্রচারকার্য চালাচ্ছে। তাদের এই প্রচেষ্টার ভিতর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের এবং অন্যান্য বিশিষ্ট যক্ষ্মা-কর্মিগণের রয়েছে পরিপূর্ণ সমর্থন এবং উৎসাহ। সুইট্জারল্যাণ্ডে Leysin-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্যে স্বতন্ত্র স্যানাটোরিয়াম স্থাপিত হয়েছে। সেখানে তারা রোগের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে যাতে পড়াশোনাও নিয়মিতভাবে চালাতে পারে তার ব্যবস্থা হয়েছে। Montpellier-এর কাছে ফ্রান্সেও এইরকম আরেকটি স্যানাটোরিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্যে স্থাপিত হয়েছে। নানা দেশের সহযোগিতা নিয়ে একটি "আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্যানাটোরিয়াম" স্থাপন করবার ব্যবস্থায় Leysin এই ব্যাপারে আরেক ধাপ এগিয়ে গেছে।

শুধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বলে নয়, ভারতবর্ষের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভিতরেই এই ব্যাধির সমস্যা একই রকম। স্বাস্থ্যচর্চায় সর্বতোমুখী উদ্যম, বিশেষ করে এই ব্যাধির সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করবার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা আমাদের দেশের সমগ্র ছাত্রসম্প্রদায়ের নিজেদের ভিতরে জাগিয়ে তুলবার জন্যে কালক্ষেপ করলে আর চলবেনা। "International

University Sanatorium"-এর কল্পনা আপাততঃ দূরে যাক—প্রত্যেক ছাত্রের মাঝে মাঝে অন্ততঃ টিউবারকিউলিন এবং এক্স-রে দ্বারা পরীক্ষা এবং সময় থাকতে তাকে সতর্ক করে দেবার ব্যবস্থাটুকুও যদি না হয় তবে সেটা বড়ই পরিতাপের বিষয় হবে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের বিশেষ মনোযোগী হয়ে উঠতে হবে। ছাত্রসমাজের এই দৃঢ়পণ আজকে করতে হবে : সত্যিকারের বাঁচাই আমরা বাঁচব, বেঁচে মরে থাকবনা। তাদের এই পণ করতে হবে—সমাজের সমস্ত জড়তা, সমস্ত সংকীর্ণতা, সমস্ত অজ্ঞতার বুকে হানব আমরা অগ্নিবাণ; তেজে, বীর্যে, শক্তিতে, সাহসে, স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্যে আমরা প্রদীপ্ত, জ্যোতির্ময় হয়ে বেরিয়ে আসব সহস্র হীনতা, দীনতার পুঞ্জীভূত অন্ধকার থেকে। আমরা সমস্বরে, পরিপূর্ণ তীব্রতার সঙ্গে এই দাবি জানাব :

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু—
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল-পরমায়ু
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট······

একমাত্র কলকাতাতেই যত ছাত্র আছেন, তাঁদের প্রত্যেকে সামান্য আট আনা পয়সা দিয়ে বছরে বঙ্গীয় যক্ষ্মানিবারণী সমিতিকে যদি সাহায্য করেন তবে এই সমিতির পক্ষে আরো অনেকগুলি ডিস্পেনসারি সহরের উপর খোলা সম্ভব হতে পারে। ছাত্র এবং শিক্ষকেরা অবকাশের সময়ে গ্রামে গিয়ে অজ্ঞ গ্রামবাসীকে এই ব্যাধির বিস্তার এবং প্রতিকার সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলে দেশের যক্ষ্মানিবারণী কাজে প্রচুর সহায়তা করতে পারেন।

যক্ষ্মাব্যাধি কি করে একজন থেকে আরেক জনের দেহে, ক্রমে সমস্ত পরিবারে, তারপরে দেশময় ছড়িয়ে পড়ে, এই ব্যাধির বিস্তারকে রোধ করবার জন্যে রোগীর ও পরিবারের লোকের কি কি সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন, এ সম্বন্ধে কি কি দায়িত্ব তাদের রয়েছে, এ বইখানা

মনোযোগ দিয়ে পড়লে সে সব বুঝতে পারা যাবে। বস্তুতঃ আমাদের দেশে যক্ষ্মা-নিবারণী আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে আমাদের শিক্ষা, মনোবৃত্তি,সামাজিক আবহাওয়া—ইত্যাদির ভিতর প্রকাণ্ড একটা পরিবর্তনের প্রয়োজন। আমাদের দেশে এই আন্দোলনের প্রধান অন্তরায় যে শুধু জনসাধারণের বিপুল অজ্ঞতা তাই নয়, তার সঙ্গে আছে সেই অজ্ঞতাকে অস্বীকার করবার একটা অন্যায় জেদ। কোন স্থানে একটি যক্ষ্মানিবাস স্থাপনের কথা হলেই এমন দেখা গিয়েছে—স্থানীয় লোকেরা উঠে পড়ে লাগেন তার বিরুদ্ধে। অনেক ছোটখাট মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যেরাও এ বিষয়ে দেখিয়ে থাকেন প্রচুর দায়িত্বহীনতা। একটি যক্ষ্মা-হাসপাতালের নামে সাধারণের মনে এত ভয়, অথচ সকলে জানেন না যে, যে দেশে টন্‌সিলাইটিস্, ফ্যারিঞ্জাইটিস্, ব্রঙ্কাইটিস্, হাঁপানি, কালা-জ্বর, ম্যালেরিয়া, সর্দি, মাথাধরা, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ডিস্‌পেপসিয়া—ইত্যাদি নামে সহস্র সহস্র লোক প্রকৃতপক্ষে যক্ষ্মাব্যাধিতে ভুগে যেখানে সেখানে গয়ের নিক্ষেপ করে, খাওয়া, শোয়া, ওঠা, বসা, চলাফেরা—এ সবের ভিতর দিয়ে অহরহ সুস্থ লোকদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশে তাদের সর্বনাশ ডেকে এনে (—নিজেরা ত মরছেই)—সমাজে অবাধভাবে বিচরণ করে, সে দেশে একটি থিয়েটার বা সিনেমা হল, স্কুল, কলেজ, আপিস, জনসভা, হোটেল, রেস্টুরেণ্ট, ট্রেনের কামরা প্রভৃতি যে কোন জায়গা থেকে এই সব হাসপাতাল অনেক সময় কত বেশি নিরাপদ। যাঁরা যক্ষ্মা-হাসপাতালের নাম শুনলে শিউরে ওঠেন তাঁরা জানেন না হাসপাতালের অসংখ্য সুস্থ কর্মচারী হাসপাতালে কি সহজ ভাবে বিচরণ করছে এবং অনেকে সপরিবারে হাসপাতালের সীমার ভিতরেই বাস করছে! পৃথিবীর বহু সভ্যদেশে শত শত যক্ষ্মানিবাস স্থাপিত হয়েছে; কিন্তু কোন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুপরিচালিত হাসপাতাল—যেখানে রোগীদের থুতু বা অন্যান্য নিঃস্রাব অতি সাবধানতার সঙ্গে নষ্ট করে ফেলে

দেওয়া হয়—জনসাধারণের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিন্দুমাত্র বিপজ্জনক হয়েছে, বহু বছরের ইতিহাসে যে একথা কদাপি জানা যায় নাই, একথা এঁদের বোঝাবে কে? সাধারণ লোকে বেঁকে বসবার দরুন অনেক স্থানে যক্ষ্মা-নিবাস স্থাপনের সঙ্কল্প একেবারে ত্যাগ করতে হয়েছে, অথবা স্থাপন করতে অযথা বহু মূল্যবান সময় নষ্ট হয়েছে। সাধারণ লোকের অশিক্ষা, কুশিক্ষা, সামান্য চিন্তাশীলতা দ্বারা সত্যকে জানবার চেষ্টায়ও এত অনিচ্ছা এবং উদাসীনতা যেখানে এত বেশি, সেখানে কতকগুলি সামান্য লোকের ভ্রান্ত স্বার্থকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করে বৃহত্তর জাতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে সরকার অথবা যক্ষ্মা-নিবারণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের তরফের জ্ঞানী এবং কর্মী ব্যক্তিগণের পক্ষে যে কোন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ।

এদেশের জনসাধারণ আরেকটি কথা শিখে রেখেছেন—এ ব্যাধি একেবারে দুরারোগ্য এবং এ ব্যাধির কোন চিকিৎসাও নাই। এই অদ্ভুত ধারণার জন্যে যক্ষ্মা-নিবারণী কাজে অর্থসংগ্রহও এদেশে কঠিন হয়ে পড়ে। এই সব মিথ্যা কথা দিবারাত্র কানে শুনে শুনে এদেশের রোগীরা নিজেদের উপর ও চিকিৎসকের উপর বিশ্বাস হারায়, হতাশায় মনকে পূর্ণ করে তুলে নিশ্চেষ্টভাবে থেকে সত্যি সত্যিই অবশেষে ধ্বংস হয়ে যায়; অথচ হয়ত তাদের সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে সমাজে মূল্যবান জীবন যাপন করবার ষোল আনা না হলেও পনের আনা সম্ভাবনা নিশ্চয়ই ছিল!

যাক। সাধারণ ভাবে আর দু-চারটা কথা বলে পুস্তক খানার উপসংহার করব।

এই ব্যাধির নিবারণকল্পে যে কতরকম উপায় অবলম্বন করবার দরকার তার অন্ত নাই। যে কোন পরিবারে একটি যক্ষ্মারোগী দেখা দিলে পরিবারের লোকদের কর্তব্য হবে প্রথমেই রোগীর সুব্যবস্থা করা এবং তারপরে প্রত্যেক শিশুর এবং নিজেদের দেহ উপযুক্ত চিকিৎসককে দিয়ে পরীক্ষা

করান। এই ব্যাধির নিবারণ ব্যাপারে কর্পোরেশান, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির কর্তৃপক্ষের কর্তব্যের সীমা নাই। সহরে, বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থানগুলিতে ঘর অথবা বস্তি-নির্মাণ বিষয়ে নতুন আইন প্রণয়ন, দূষিত এবং সংক্রামিত খাদ্যদ্রব্যাদির বিক্রয় কঠোরভাবে বন্ধ করা, অধিক পরিমাণে পার্ক, ব্যায়ামশালা, ক্রীড়াক্ষেত্র ইত্যাদি নির্মাণ, রাস্তার ধূলা এবং বিষাক্ত ধোঁয়ার উৎপাতের প্রতিবিধান, হোটেল, রেস্টুরেণ্ট, বোর্ডিং-হাউস ইত্যাদির উপর কড়া নজর রাখা এবং এগুলির সমস্ত ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ, সংবাদ পাওয়া মাত্র যক্ষ্মারোগীর ব্যবহৃত কক্ষকে উত্তমরূপে শোধন—ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের অধিকতর মনোযোগ দিতে হবে। যে কোন চিকিৎসক, যে কোন গৃহস্থ, অথবা যে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের তাঁদের জানা যক্ষ্মারোগীর সংবাদ স্থানীয় স্বাস্থ্য-তত্ত্বাবধায়কের কাছে দেওয়া, যাদের থুতুতে যক্ষ্মা-জীবাণু পাওয়া গিয়েছে—স্বাস্থ্য-বিভাগের পরীক্ষায় তাদের থুতু পর পর কয়েকবার যক্ষ্মা-জীবাণু-মুক্ত না দেখা অবধি তাদের সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা, বুকে যাদের ব্যাধি সক্রিয় অবস্থায় আছে তাদের সঙ্গে কেউ যাতে না শোয় তার ব্যবস্থা, সক্রিয় রোগগ্রস্ত শিক্ষক বা বালককে স্কুলে কাজ করতে বা পড়তে না দেওয়া, সক্রিয় রোগগ্রস্ত লোককে মুদী-দোকান, খাবারের দোকান ইত্যাদি চালাতে না দেওয়া, যে কোন প্রকাশ্য স্থানে (রাস্তা, আপিস, স্কুল, রেস্টুরেণ্ট, গাড়ি ইত্যাদিতে) যে কোন লোকের গয়ের নিক্ষেপ আইন করে বন্ধ করে দেওয়া, রোগীকে স্যানাটোরিয়াম বা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করবার ব্যবস্থা করা, বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য-বীমার সৃষ্টি, গ্রামে বাস করে আসছেন এমন সব লোক যখন সহরে আসবেন তখন বিশেষজ্ঞের মতানুযায়ী তাঁদের যক্ষ্মা-প্রতিষেধক টিকা দেবার ব্যবস্থা করা বা অন্যভাবে তাঁদের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা, যারা চিকিৎসার পরে এই রোগ থেকে বেশ ভাল হয়ে গিয়েছে তাদের স্বাস্থ্যের সর্বরকম তদারক এবং

উপযুক্ত কর্মে নিয়োগ করে তাদের সংসারী হতে সাহায্য করা—এ সবই যক্ষ্মা-নিবারণী আন্দোলনের অন্তর্গত। সমাজ এবং নিয়োগ-কর্তাদের পরিপূর্ণ সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে সুস্থ টি. বি. রোগীকে সর্বদা দেখতে হবে এবং তার প্রতি অবিচার না হয় তা লক্ষ্য রাখতে হবে। সিনেমা, স্কুল, কলেজ, হোটেল, আপিস, ফ্যাক্টরি, গির্জা, মন্দির, মসজিদ, আশ্রম, পাব্লিক হল ইত্যাদির মালিক এবং কর্তৃপক্ষকে দেখতে হবে যে এগুলি আলো-বাতাস-হীন, বদ্ধ স্থান না হয়। আলো-বাতাস-হীন রুদ্ধ গৃহ বা কক্ষাদি যক্ষ্মা-জীবাণু দ্বারা একেবারে পূর্ণ থাকতে পারে। এগুলিতে প্রচুর আলো-হাওয়া যাতে আসে তার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের প্রতি প্রত্যেকের দিতে হবে নজর। খোলা আলোবাতাসযুক্ত ঘরে থাকা, যেখানে-সেখানে থুতু না ফেলা (যক্ষ্মারোগীর পক্ষে বাইরে বেরুনর সময়ে পকেট-স্পিটুন রাখা কর্তব্য), খোলা জায়গায় ব্যায়াম, খেলাধুলো, সহরের দূষিত আবহাওয়া থেকে গ্রামে গিয়ে সপ্তাহান্তে বেড়িয়ে আসা, অন্য কোন ব্যাধি দ্বারা স্বাস্থ্যভঙ্গ না হয় তার প্রতি দৃষ্টি রাখা, নোংরা চা ও খাবারের দোকান ইত্যাদি এড়িয়ে চলা, বাসস্থানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, ঘর ভাড়া নেবার সময়ে খুব সতর্ক হয়ে নেওয়া—ভাল করে ওষুধ দ্বারা বিশোধিত করে অবশেষে ঘসে ধুয়ে এবং পুনরায় চুনকাম করে ভাড়া করা ঘর ব্যবহার করা, জীবাণুপূর্ণ কফ-যুক্ত অসতর্ক যক্ষ্মা-রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে না আসা, যক্ষ্মা-রোগীর পক্ষে নিজের ব্যাধিকে গোপন না করা, রোগের লক্ষণকে অগ্রাহ্য না করা, ইত্যাদি বিষয়ে সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে। উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নতুন আইন প্রণয়ন, শিক্ষার উন্নতি, সর্বপ্রকার স্বাস্থ্য-সমিতিকে সাহায্য এবং উৎসাহ দান, সকলের জন্যে উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যের উন্নতি বিষয়ে নতুন পরিকল্পনা, দরিদ্রদের জন্যে সামান্য অথবা বিনা খরচায় রোগ পরীক্ষা এবং চিকিৎসার সুব্যবস্থা

ইত্যাদি দ্বারা যক্ষ্মানিবারণী কাজের দ্রুত উন্নতিসাধনের দায়িত্ব সরকার এবং জনসাধারণ উভয়েরই। সকলের একযোগে কাজ এবং যক্ষ্মা-রোগকে সব দিকে একসঙ্গে আক্রমণ দ্বারাই এই আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হবে। আমাদের দেশের আশিক্ষিত জনসাধারণের ভিতর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রচার কার্য অনেক সময়ে বালুতে বীজ বপনের মতই নিষ্ফল; কিন্তু শিক্ষিত জনসাধারণের ভিতরেও বুঝবার চেষ্টার এমন অভাব অনেক সময় দেখা যায় যে এসব শুধু একটা পণ্ডশ্রমেই শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হয়।

জনৈক যক্ষ্মা-কর্মী বলছেন: (আমার অনুবাদ): "যক্ষ্মাগ্রস্তকে আমি বলব—স্বাস্থ্যকর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ নাও, ইতিমধ্যে যেখানে-সেখানে থুতু ফেলা বন্ধ কর। বাজে ওষুধের উপর নির্ভর না করে ভালভাবে থাকতে চেষ্টা কর, কারণ যক্ষ্মারোগ কয়েক বোতল ওষুধে সারেনা, সারে একটা সুনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাত্রা দ্বারা। সুস্থ তরুণদের আমি উপদেশ দেব—খোলা জায়গায় থাক, দুধ, ফলমূল, তরিতরকারিযুক্ত পুষ্টিকর আহার গ্রহণ কর, সমস্ত অনিয়ম অত্যাচার থেকে বিরত থাক। পিতামাতা এবং শিক্ষকদের আমি বলব—তরুণরা যাতে আমার উপদেশ মেনে চলে তা আপনারা দেখুন। সমাজ-সংস্কারককে আমি বলব—সমস্ত রকম অনিষ্টকর অভ্যাস এবং রীতি-নীতির বিরুদ্ধে আপনি সংগ্রাম সুরু করুন। সহরের কর্তাদের আমি বলব—সহরের ঘরবাড়িগুলির উন্নতি সাধন করুন এবং দরিদ্র শিশুদের পুষ্টির ব্যবস্থা করুন। শাসনকর্তা এবং স্বদেশহিতৈষীদের আমি বলব—জনসাধারণ এবং শ্রমজীবীদিগকে বর্ধিত বেতন, স্বাস্থ্যকর গৃহ, উত্তম পরিবেষ্টনের ভিতরে কাজ এবং বুক ও মনকে সুস্থ রাখবার জন্যে প্রচুর অবসর দিন। সামাজিক উপদেশ এই-ই আমি দিতে পারি। উপদেশগুলি সহজ নয়, কিন্তু যক্ষ্মাব্যাধি নিবারণে প্রত্যেকের অংশ কি, তা বুঝিয়ে বলতে হবে।"

আমি আমাদের দেশের যে ক'টি স্যানাটোরিয়ামের নামোল্লেখ করেছি এদের কতকগুলিতে বেডের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে এবং নতুন স্যানাটোরিয়ামও দু'একটি করে আরো নির্মিত হচ্ছে। বস্তুতঃ স্যানাটোরিয়ামের প্রয়োজনীয়তা যে কত,তা বলে শেষ করা যায় না। অসংখ্য রোগী স্যানাটোরিয়াম-চিকিৎসা সমাপ্ত করে ফিরে যাচ্ছে—সমাজ এবং পরিবারের পক্ষে ভীতি-স্বরূপ হয়ে নয়—সমাজ এবং পরিবারের শিক্ষক হয়ে, ও সুস্থ, কর্মক্ষম হয়ে। স্যানাটোরিয়াম শুধু চিকিৎসা-কেন্দ্র নয়, এটা অতি মূল্যবান শিক্ষাকেন্দ্র। যক্ষ্মারোগে মৃতুর হার কমাতে এবং ব্যাধির বিস্তার রোধ করতে স্যানাটোরিয়ামের দান অসামান্য। জনৈক যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞের অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছে ৬০ বছর আগে ভারতবর্ষের যে যে স্থান প্রায় সম্পূর্ণরূপে যক্ষ্মা-মুক্ত ছিল, ২০ বছর আগে সে সব জায়গায় বিশেষভাবে যক্ষ্মার বিস্তার ঘটেছে। বাধা দেবার কোন চেষ্টাই যেখানে হয় নাই, ২০ বছর পরে আজকার অবস্থা সেখানে সহজেই অনুমেয়। সারা ভারতবর্ষের কথা ছেড়ে দিই। যে পরিমাণে যক্ষ্মা আজ দেশকে ছেয়ে ফেলেছে তাতে বিশেষজ্ঞের মতে শুধু বাংলা দেশেই ৪০০ ডিস্‌পেন্সারির,৭০,০০০ স্যানাটোরিয়াম-বেডের, ২০,০০০ After-care colony-বেডের, ৫,০০০ প্রিভেণ্টোরিয়াম-বেডের এবং বুকের যক্ষ্মা ছাড়া গ্ল্যাণ্ড্, অস্থি ইত্যাদির যক্ষ্মার জন্যে ১০,০০০ বেডের আজ দরকার !!! আজকে হিমালয়ের অতি স্বাস্থ্যকর অঞ্চলগুলি পর্যন্ত যক্ষ্মা দ্বারা যথেষ্ট উৎপীড়িত হয়ে উঠেছে, কাজেই যক্ষ্মানিবাস স্থাপন পাহাড়ে হবে কি সমতল ভূমিতে হবে এরই তর্কে কালহরণ না করে ("Climate" সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমি পূর্বেই করেছি) যে কোন সুবিধাজনক স্থানই করতে হবে মনোনীত। আরো একটি কথা এই যে অধিক সংখ্যক দরিদ্রেরা যাতে বিনা ব্যয়ে অথবা সামান্য ব্যয়ে স্যানাটোরিয়ামে থেকে চিকিৎসালাভ করতে পারে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে—কারণ অবস্থাগতিকে দরিদ্ররাই

এই ব্যাধিবিস্তারের পথকে বিশেষরূপে প্রশস্ত করে, নিজেদের সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে অক্ষম হয়ে। দেশের অধিকাংশ লোকের আর্থিক অবস্থা এমন ভীষণ শোচনীয় যে, এই ব্যাধির উপযুক্ত চিকিৎসা চালান খুবই অল্প লোকের পক্ষে সম্ভব। অজ্ঞতা তো আছেই; কিন্তু সেই অজ্ঞতা দূর করলেই বা কি? দুধ খাও, ঘি খাও, ডিম খাও, মাখন খাও; যাও নাইনিতাল, মুসৌরি, উটাকামণ্ডে চেঞ্জে; কর মাসের পর মাস, বছরের পর বছর শুয়ে শুয়ে আরাম; এসব উপদেশ আমাদের দেশের শতকরা নিরনব্বই জন লোকের কাছে কি অতি জঘন্য বিদ্রূপের মতই শোনাবেনা? এমন সংখ্যাতীত রোগী রয়েছে—ডিস্‌পেন্সারিতে আসবার জন্যে রিক্সা-ভাড়াটি দেবার পর্যন্ত যাদের সামর্থ্য নাই!

যক্ষ্মাকে দমন করতে হলে আজ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল সংস্কার এবং উন্নতির তীব্র প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলে দেশের ধনিসমাজ যেন স্বপ্নেও একথা না ভাবেন যে তাঁদের কাছে যক্ষ্মার ঘেঁষা শক্ত। এই রোগ ধনী-দরিদ্রের বিচার করেনা, এবং এক অথবা অন্য কারণ আশ্রয় করে বিত্তশালীদের ভিতরেও আজ এই ব্যাধি আগুনের মতনই পড়েছে ছড়িয়ে। দরিদ্র হলেই টি. বি. হয়, বা চা খেলেই টি. বি. হয়—তা নয় দাদা! প্রত্যেকের দেহেই বহুরকম সূত্র থেকে সংক্রমণ ঘটতে পারে, এবং স্বাস্থ্য-হানিকর যে কোন রকম অভ্যাস দ্বারাই দেহের প্রতিরোধ-শক্তি ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

যক্ষ্মানিবারণী পরিকল্পনার ভিতরে অসম্পূর্ণরূপে সুস্থ, অর্থাৎ "ঘরেও নহে, পারেও নহে"-জাতীয় যক্ষ্মারোগীদের জন্যে "After-care-colony" স্থাপনও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। মাদ্রাজের আরোগ্যভরম্‌ স্যানা-টোরিয়ামের কর্তৃপক্ষ স্যানাটোরিয়ামের কাছেই "পানিপুরম্‌" নামক স্থানে জন দশ-বার রোগী নিয়ে ছোট আকারে এই রকম একটি উপনিবেশ স্থাপন

করেছেন। রোগীদের জন্যে সেখানে ছাপাখানার কাজ, তাঁতের কাজ, দরজীর কাজ, বাগিচার কাজ, মুরগীর চাষ, গো-পালন, ব্যাগ তৈয়ারি, কাগজের মণ্ড তৈয়ারি—ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়েছে। উপনিবেশের রোগীরা স্যানাটোরিয়ামে একটি দোকান খুলেছেন। প্যাপ্‌ওআর্থের মত সুবৃহৎ, বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের কাছে এটা কিছুই নয়, তবুও এটা একটা প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা এবং আরম্ভ। ভারতবর্ষীয় যক্ষ্মানিবারণী সমিতিও রোগীদের "ভবিষ্যৎ-যত্নের" ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভাবছেন।

আমাদের দেশে প্রত্যেক পরিবারে শিশুর অধিকতর যত্ন বিশেষরূপে প্রয়োজন। যদিও শৈশবে সামান্য সংক্রমণ বয়স্ক হবার অবস্থায় দেহকে কিছুটা যক্ষ্মা-প্রতিরোধ-শক্তি-সম্পন্ন করে, তথাপি শিশুকে যক্ষ্মাজীবাণুর সংস্পর্শে আসতে দেবার বিপদ অসীম। যক্ষ্মা-ব্যাধিতে শিশুদের ভিতরে মৃত্যুর হার কম নয় এবং ফুস্‌ফুসের যক্ষ্মা তাদের ভিতর অপেক্ষাকৃত কম হলেও, গ্ল্যাণ্ড্‌ ইত্যাদির যক্ষ্মায় তাদের স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়ে উঠছে। (দেহের যে কোন স্থানই আক্রান্ত হোক্‌ না কেন, বিশ্রাম, মুক্ত বায়ু, পুষ্টিকর আহার, উপযুক্ত চিকিৎসা ইত্যাদির প্রয়োজন সর্বত্রই এক রকম, এখানে একটু উল্লেখ করে রাখলাম)। তারপরে, শিশুর দেহে যে যক্ষ্মা-বীজ রোপিত হল, শৈশব অতিক্রম করে গেলেও বয়স্ক অবস্থায় তা যে সহসা কখন ধ্বংসের করাল মূর্তি পরিগ্রহ করবে, তা বলা যায় না। কাজেই শিশুর প্রতি রাখতে হবে নজর। সক্রিয় ব্যাধিগ্রস্ত পিতামাতা বা অপর কারু থেকে শিশুকে রাখতে হবে দূরে, তার ঠোঁটে চুমু খাওয়া বন্ধ করতে হবে, ব্যাধিগ্রস্ত মাতার স্তন্য পান সে করতে পারবে না, বছরে একবার করে বিশেষজ্ঞকে দিয়ে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে—বিশেষ করে সে যদি দুর্বল-দেহ হয়; তার নিয়মিত সময়ে খাওয়া, পরিচ্ছন্নতা, পোষাক, নিয়মিত ঘুম, পেটের অবস্থা, দাঁত, টন্‌সিল্‌ ইত্যাদির

প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে, হাম বা অন্য যে কোন অসুখ করলেই সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। সে একটু বড় হলে খোলা আলো-বাতাসে তাকে খেলা-ধুলো করতে উৎসাহ দেওয়া, তার মুখ দিয়ে নিশ্বাস নেবার কদভ্যাস থাকলে সেটাকে সংশোধন করে দেওয়া, ইত্যাদির প্রয়োজন। শিশুকে শেখাতে হবে : ঘরের মেজেয় থুতু ফেলা, থুতু দিয়ে সেট মোছা, মুখের ভিতর আঙুল দেওয়া, নাক খোঁটা, হাতে, জামার হাতায়, গায়ের চাদরে বা ধুতির খুঁটে নাক মোছা, মুখ থেকে আঙুল দিয়ে থুতু নিয়ে বই-এর পাতা ওল্টান, মুখে পেন্সিল দেওয়া, আহার এবং পানীয় ছাড়া টাকা-পয়সা বা পিন মুখে দেওয়া, কারুর খাওয়া ফল, চিবান পান, বিড়ি, সিগারেট, বা অন্য কোন খাওয়া-জিনিসের শেষ মুখে দেওয়া, বাঁশি, অপরের হুঁকো—বা অপরে মুখে দিয়েছে এমন যে কোন জিনিস মুখে দেওয়া, কোন ফল না ধুয়ে খাওয়া, কারুর মুখের উপর হাঁচা বা কাশা, মুখ, হাত, নখ অপরিষ্কার রাখা বা হাত মুখ ভাল করে না ধুয়ে ভাত খেতে বসা, অপরিষ্কার জামা-কাপড় পরে থাকা—এগুলি বড় খারাপ। কোন কারণে যদি তার শরীর খারাপ লাগে, শরীরের কোন জায়গা যদি কেটে যায় বা অপরে কোথাও কোন রকম আঘাত তাকে করে—সে যাতে তা জানাতে দ্বিধাবোধ না করে, ভোর বেলা উঠে এবং রাত্রে শুতে যাবার আগে সে যাতে ভাল করে দাঁত মেজে মুখ ধোয়—তা দেখতে হবে। শিশুদের সম্বন্ধে শিক্ষকদের দায়িত্বও প্রচুর। আবার শিক্ষকদের কথা বলতে গিয়েই এসে পড়ে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণের দায়িত্ব। আমাদের দেশে নির্দিষ্ট পাঠ্য-বিষয় এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতির ভিতর এমন ভীষণ কতকগুলি গলতি আছে যা তরুণদের স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ একটি প্রতিকূল ক্রিয়া করছে, একথা যোগ্য ব্যক্তিগণের দ্বারা বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে শিক্ষাবিভাগকে অবহিত হতে হবে।

স্তিকা গৃহ থেকে সুরু করে বিবাহ-বাসর পর্যন্ত সব কিছু আমাদের

দেশে আমূল সংস্কারের অপেক্ষা রাখে, আমাদের নানা ক্লেদ, গ্লানি, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার দ্বারা পূর্ণ সামাজিক আবহাওয়ার পদে পদে কুৎসিত আত্মপ্রকাশ দমনের ভার সাহসের সঙ্গে নেবার প্রয়োজন আজ আমাদের আছে। ব্যাপক অর্থনৈতিক অবনতির ফলে যেমন একটি জাতির পক্ষে রোগ-জীবাণুর সঙ্গে সংগ্রাম করবার ক্ষমতা কমে যায়, সামাজিক আবহাওয়া কলুষিত হবার দরুনও যক্ষ্মার মত ব্যাধি দেশে এমন বিস্তার লাভ করবার পায় পূর্ণ সুযোগ; কাজেই যক্ষ্মারোগ দমনে সকল স্তরের সমাজসেবীদেরই জাগ্রত হতে হবে—একটা সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে।

যদিও আমাদের দেশের চিকিৎসকসমাজ যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে অধুনা পূর্বের চেয়ে অধিকতর সচেতন হয়ে উঠেছেন, তবুও উপযুক্ত যক্ষ্মাবিশেষজ্ঞের সংখ্যা এখনো নিতান্ত অল্প তা আগেই বলেছি। দেশের জনসাধারণ, এবং রোগগ্রস্তগণ যাতে সর্বত্র সহজভাবে এবং স্বল্পব্যয়ে বিশেষজ্ঞের সাহায্য সর্বদা পেতে পারে তার ব্যবস্থা চাই—তার জন্যে যথেষ্টসংখ্যক যোগ্য ব্যক্তি চাই। যক্ষ্মানিবারণী সমিতির স্বাস্থ্য-পরিদর্শকের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং প্রীতি, বিশ্বাস, নির্ভরতা ও সরলতার সঙ্গে এঁদের কাজে যক্ষ্মারোগীদের সহযোগিতা করতে হবে। যক্ষ্মারোগীরা এঁদের কাছে নিজেদের সুখ, দুঃখ, অসুবিধা, অভিযোগ সব জানাবেন,এবং এঁরা চেষ্টা করবেন বন্ধুভাবে তার যথাসম্ভব প্রতিকার করতে। যাঁরা এই ব্যাধি থেকে সুস্থ হয়েছেন, তাঁরাও নেবেন অজ্ঞ রোগী এবং জনসাধারণের ভিতরে এই ব্যাধিসংক্রান্ত জ্ঞানের আলো বিতরণের ভার।

সকলে মনে রাখবেন, নানাভাবে আজ কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। কোন যক্ষ্মানিবাসে নিজের নামে একটি 'কটেজ' দান করে, নিজের নামে কোথাও একটি 'ওআর্ড' তৈরি করে, নিজের নামে একটি 'বেডে'র খরচা দিয়ে, অর্থসাহায্য করে, বস্ত্রাদি, পুস্তক, আসবাবপত্র, ইত্যাদি দান করে, যক্ষ্মানিবারণী সমিতির সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্যে নিজের বন্ধুবান্ধব,

নিজের পরিচিত সঙ্ঘ-সমিতির উপরে প্রভাব বিস্তার করে সকলে যক্ষ্মা-নিবারণী আন্দোলনকে সাহায্য করতে পারেন। যক্ষ্মা-নিবারণী কাজ উপযুক্ত ভাবে চালানর জন্যে আজ প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, সে কথা সকলের বুঝতে হবে, এবং যক্ষ্মানিবারণী সমিতির অর্থসংগ্রহের সকল রকম প্রচেষ্টাকে সকলের সার্থক করে তুলতে হবে।

কেউ যেন একথা কখনই মনে না করেন যে যক্ষ্মা এমন একটি ব্যাধি যার বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। চেষ্টা দ্বারা একে আমরা সমূলে বিনাশ করতে পারি ; তবে এই সতর্ক-বাণী উচ্চারণের প্রয়োজন আছে যে এদেশে যক্ষ্মাব্যাধির সঙ্গে যুদ্ধটা করতে উঠে পড়ে যদি না লাগা যায়, তবে আমাদের আলস্য, অযোগ্যতা এবং অক্ষমতার সুযোগে প্রকৃতির প্রতিশোধ রূপে লক্ষ লক্ষ লোক যে শুধু ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তাই নয়, এর পরে এ ব্যাধির বিস্তারকে রোধ করা হাজার গুণ শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। আমরা আরেকটি জিনিস দেখতে পাব যে আমাদের এই ব্যাধিকে দূর করবার চেষ্টায় আরো অনেক খারাপ ব্যাধি আপনা থেকেই দূর হয়ে যাচ্ছে এবং একটি জাতি হিসাবে আমরা নানা ভাবে উন্নত হয়ে উঠছি। অদৃষ্টের দোহাই, নিশ্চেষ্ট হাহুতাশ, এবং আত্মতুষ্টির বুজ্‌রুকি চলবেনা আজকে আর। সকলের বুঝতে হবে—স্বাস্থ্যহীন হবার ভিতরে আর আনন্দ নাই, স্বাস্থ্যহীনতা নিয়ে যারা কবিত্ব করে সেই বিকৃত-মনোভাবগ্রস্তেরা কোনমতেই আর প্রশ্রয় পাবার যোগ্য নয়। শুধু অবহেলা দ্বারা জাতি হিসাবে আমরা এই ব্যাধিতে ধ্বংস হব অথবা পঙ্গু হয়ে থাকব, এ লজ্জা আমাদের দূর করতেই হবে। পুরাতন, ভ্রান্ত সংস্কারকে বর্জন করে নতুন সত্য করব আমরা গ্রহণ, একটা বড় আদর্শে নিজেদের জীবনকে করব আমরা প্রতিষ্ঠিত। আজকে দেশের প্রত্যেক বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞকে জাতির স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্পর্কে হতে হবে অবহিত। যা নাকি একজন মানুষের জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট সময়—সহস্র

আকাঙ্ক্ষা, সহস্র আশা, সহস্র শক্তি ও সম্ভাবনা নিয়ে যখন একটি তরুণ কল্পনাজগতে, কর্মজগতে আপনাকে করবে প্রকাশ, করবে প্রতিষ্ঠিত, সেই দুর্লভ ক্ষণটিতে যক্ষ্মার মত ব্যাধির কবলে পড়ে ব্যর্থতার এক নিদারুণ বোঝা গভীর বেদনায় তাকে মাথায় যাতে তুলতে না হয় তার জন্যে প্রত্যেক সমাজ এবং দেশহিতৈষীকে হতে হবে অগ্রসর।

যাদের জীবনের হয়ত সত্যিকার মূল্য ছিল, চলবার পথে যাদের জীবন হয়ত সবদিক দিয়ে সার্থকতার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারত, সকলের শ্রদ্ধায়, সকলের ভালবাসায় নিজেদের জীবন হয়ত যারা গৌরবান্বিত করে তুলতে পারত, এমন লক্ষ লক্ষ সুন্দর প্রাণ যে এমন ভাবে অকালে শুকিয়ে ঝরে যায় একথা ভেবে বেদনা পাবে, মাতৃভূমির নীরব আর্তনাদ স্তব্ধচিত্তে শুনে এ সমস্যার সমাধানের জন্যে আপনাদিগকে যোগ্য করে তুলবে—স্বার্থ-হীন, নিরলস এমন একদল দরদী কর্মীকে আজ দেখতে চাই আমাদের মাঝখানে। গ্রীষ্ম যাবে, বর্ষা যাবে, শীত যাবে, প্রস্ফুটিত বর্ণসম্ভার, বিচিত্র কুজন-গুঞ্জন নিয়ে লীলায়িত বসন্ত যাবে, বৎসরের পর বৎসর একে একে ফিরে যাবে; দূর থেকে তাদের কানে ভেসে আসবে বাইরের বৃহত্তর পৃথিবীর আর্ত-কোলাহল, চোখে তাদের আসবে ভেসে নগরীর রাজপথের ক্লান্ত, বিক্ষুব্ধ জন-প্রবাহের ছায়া; সেই নিরভিমান কর্মিদলের প্রত্যেকে আপন উদারতা ও সম্পূর্ণ স্বাধীন চিন্তা দ্বারা সবার চেয়ে স্বতন্ত্র হয়ে চলতে থাকবে। তাদের পথে চারি-পার্শ্বের মূঢ় বিজ্ঞজনের নিঃসম্বল পরিহাসের প্রতি শুধু একটি অনুকম্পার নীরব দৃষ্টি রেখে, এবং শান্ত, অনাসক্ত, নির্ভীক অন্তরে এই কথা উচ্চারণ করবে:

"ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং ন পুনর্ভবম্ ;
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্ ॥"

—আমি রাজ্য চাহিনা, স্বর্গ চাহিনা, পুনর্জন্ম চাহিনা; আমি কে দুঃখতপ্ত জীবগণের আর্তি-নাশ চাহিতেছি।

সমাপ্ত